শেষ বিকালের কান্না

নসীম হিজাযী

শেষ বিকালের কান্না

নসীম হিজাযী

অনুবাদ
আবদুল হক
সম্পাদনা
আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

শেষ বিকালের কান্না ◆ মূল: নসীম হিজাযী ◆ অনুবাদ : আবদুল হক ◆ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ ◆ প্রকাশক: প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ◆ চতুর্থ মুদ্রণ: জানুয়ারী ২০০৯ ◆ তৃতীয় মুদ্রণ: মে ২০০২ ◆ দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ১৯৯৭ ◆ প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৬। ◆ প্রচ্ছদঃ কাইউম হাসান ◆ মুদ্রণ: প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস, ৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। যোগাযোগ: ৮৩২১৭৫৮, ০১৭১৭৪৩১৩৬০

মূল্যঃ ২০০.০০ টাকা।

SHAS BIKALER KANNA (A Historical Novel) By: Nasim Hajazi. Translated by: Abdul Haque. Edited by: Asad bin Hafiz. Publised by: preeti prokashon. 435/ka bara moghbazr. Dhaka-1217. Ph: 8321758. 01717431360. 4th Edition 2009, 3rd Edition 2002, 2nd Edition 1997, Published: January 1996.

Price: Tk. 150.00

ISBN-984-581-202-3

প্রকাশকের নিবেদন

নসীম হিজাযী এক কালজয়ী কথাশিল্পী। সারা দুনিয়ার অসংখ্য ভাষায় তার উপন্যাস অনূদিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তর জয় করেছে। ১৯৮৭ সালে আমরা প্রথম প্রকাশ করি তাঁর 'শাহীন' উপন্যাসটি, বাংলায় নাম দেই 'সীমান্ত ঈগল'। বইটি ছিল স্পেনের মুসলমানদের জীবন মরণ সংগ্রাম কাহিনী। জনপ্রিয় এ লেখক স্পেনের ওপর মোট চারটি উপন্যাস লিখেছেন। দ্বিতীয় বইটির নাম ছিল 'আন্ধেরী রাত কা মুসাফির', বাংলায় 'আঁধার রাতের মুসাফির' নামে ১৯৮৮ সালে এটি প্রকাশ করি আমরা। এর পরের কাহিনী সাজিয়েছেন তিনি 'কালিসা আওর আগ' গ্রন্থে। ১৯৯৬ সালে এটি আমরা প্রকাশ করি 'শেষ বিকালের কান্না' নামে। স্পেনের ওপর তাঁর আখেরী গ্রন্থের নাম 'ইউসুফ বিন তাশফিন'। বইটি আমরা 'ইউসুফ বিন তাশফিন' নামেই প্রকাশ করেছি ১৯৯৯ সালে।

নসীম হিজাযীকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। স্পেনের কাহিনী ছাড়াও আমরা মহানবীর জীবন কালের ওপর লেখা তাঁর অসাধারণ উপন্যাস 'কায়সার আওর কিসরা' 'কায়সার ও কিসরা' নামে আমরা প্রকাশ করেছি ১৯৮৯ সালে। ১৯৮৮ সালে প্রকাশ করেছি তাঁর আরেক অমর উপন্যাস 'কাফেলায়ে হেজায', বাংলায় নাম দিয়েছি 'হেজাযের কাফেলা'। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস 'সফেদ জাযিরা' প্রকাশ করেছি ১৯৯৮ সালে 'কিং সায়মনের রাজত্ব' নামে। লেখকের ভ্রমণ কাহিনী 'পাকিস্তান ছে দিয়ারে হরম তক্' প্রকাশ করি ১৯৮৮ সালে 'ইরান তুরান কাবার পথে' নামে।

এ ছাড়া কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি তাঁর 'মরণজয়ী', 'ভেঙ্গে গেল তলোয়ার', 'খুনরাঙা পথ' এসব বই আগেই প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় নসীম হিজাযী চর্চার ক্ষেত্র উন্মোচন করে, এজন্য জাতির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর যে সব বই এখনো বের হয়নি সেগুলো অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যাপারে আমরা লেখকের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা, দোয়া ও আল্লাহর রহমতই আমাদের ভরসা।

আমাদের এ প্রিয় লেখক আজ আর বেঁচে নেই। মৃত্যুর আগে তাঁর প্রায় একডজন বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু স্বাস্থগত কারণে তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। তাঁর ভক্তদের কাছে আমাদের নিবেদন, আসুন আল্লাহর এই নেক বান্দার জন্য আমরা প্রাণ খুলে দোয়া করি। আল্লাহ আমাদের সকলের ইহ ও পরকালীন মঙ্গল দান করুন। আমীন।

আসাদ বিন হাফিজ

আমাদের প্রকাশিত কিছু মূল্যবান কথা-সাহিত্য

জনপ্রিয় বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ

সীমান্ত ঈগল ॥ নসীম হিজাযী
হেজাযের কাফেলা ॥ নসীম হিজাযী
আঁধার রাতের মুসাফির ॥ নসীম হিজাযী
কায়সার ও কিসরা ॥ নসীম হিজাযী
শেষ বিকালের কান্না ॥ নসীম হিজাযী
কিং সায়মনের রাজত্ব ॥ নসীম হিজাযী
দি সোর্ড অব টিপু সুলতান ॥ ভগবান এস গিদওয়ানী

পাঠক নন্দিত উপন্যাস

মরু মুষিকের উপত্যকা ॥ আল মাহমুদ
যুদ্ধ ও ভালবাসা ॥ রাজিয়া মজিদ
তিতুর লেঠেল ॥ আতা সরকার
আপন লড়াই ॥ আতা সরকার
সোনাই সরদারের ঢাকা অভিযান ॥ আতা সরকার

লোকপ্রিয় গল্প

সুন্দর তুমি পবিত্রতম ॥ আতা সরকার
অন্য রকম মেয়ে ॥ হোমায়রা আহমেদ
পনরই আগস্টের গল্প ॥ আসাদ বিন হাফিজ
পলাতক জীবন ॥ ফারজানা মাহবুবা
অপারেশন স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার ॥ আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন
চিং পাহাড়ের হাতি ॥ আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন
মহেশখালির খুনী জ্বীন ॥ জাবেদ হুসেইন

রহস্য কাহিনী

আসাদ বিন হাফিজ রচিত ক্রুসেড সিরিজ

গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▮ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ▮ সুবাক দুর্গে আক্রমন ▮ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▮ ভয়াল রজনী ▮ আবারো সংঘাত ▮ দুর্গ পতন ▮ ফেরাউনের গুপ্তধন ▮ উপকূলে সংঘর্ষ ▮ সর্প কেল্লার খুনী ▮ চারদিকে চক্রান্ত ▮ গোপন বিদ্রোহী ▮ পাপের ফল

দশ মাইল দীর্ঘ এবং পাঁচ মাইল প্রশস্ত আলফাজরার পার্বত্য এলাকা। হিজরতের পর এটাই ছিল স্পেনের সম্রাট আবু আবদুল্লাহর সাম্রাজ্য।

পশ্চিমে ছোট ছোট পর্বত শ্রেণী। পর্বতের পাদদেশে একটা পুরনো কেল্লায় আবু আবদুল্লাহর আবাস। পাহাড় শ্রেণী ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে গেছে উত্তর দিকে। পেছনে শস্য-শ্যামল উপত্যকা। সেখানে প্রায় চল্লিশটা বসতবাড়ি। এখানেই আরেক কেল্লায় থাকেন সাবেক উজির আবুল কাসেম।

আবুল কাসেমের জায়গীর দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল মাসয়াবের ওপর। সম্পর্কে তার স্ত্রীর চাচাতো ভাই। সুলতানের আগমনের কয়েকদিন পর দেহরক্ষী, চাকর-বাকর এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আবুল কাসেম কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকতেন গ্রানাডায়, গত তিন বছরে বড় জোর কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছেন এখানে।

সুলতানের সাথে বা তার দু'চার দিন পর যারা এখানে এসেছিল, বলতে গেলে তারা এসেছিল একেবারে শূন্য হাতে। ফার্ডিনেণ্ডের কাজে অনেকের এই আস্থা এসেছিল যে, তিনি চুক্তির শর্ত ভাঙবেন না। জমিজমা বিক্রি করে ওরা চলে আসতো আলফাজরায়। সময় সুযোগ বুঝে পাড়ি দিত আফ্রিকা।

ফার্ডিনেণ্ডও চাচ্ছিলেন মুসলমানরা আফ্রিকা চলে যাক, তবে তাদের তিনি দেশ ছাড়া করছেন, এ অভিযোগ যেন কেউ না করতে পারে এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব সতর্ক। এ জন্য তিনি শুধু তাদের যাতায়াতের পথই নিরাপদ রাখেননি বরং চুক্তির শর্তগুলোও যথাসাধ্য পালন করে চলতেন। ফলে, গত তিন বছরে অনেক মুসলমান আফ্রিকা গিয়ে আবার বিনা বাঁধায় ফিরেও এসেছিল।

রোমান আর তুর্কীদের যুদ্ধ জাহাজগুলো রোম উপসাগরে টহল দিত। এ জন্য মুহাজির কাফেলায় আক্রমণ করে বিজিত এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইতেন না ফার্ডিনেণ্ড। ফলে, ওরা নির্বিঘ্নে সফর করতে পারতো।

মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে পাদ্রীদের চাইতেও ভয়ংকর পরিকল্পনা ছিল ফার্ডিনেণ্ডের। কিন্তু তিনি সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। মুসলমানদের শেষ রক্তটুকু শুষে নেয়ার সময় যে এখনো হয়নি একথা তিনি ভাল করেই বুঝতেন। তাই, কৌশলে শুধু দাবার বিভিন্ন ঘুঁটি চেলে যাচ্ছিলেন আর অপেক্ষা করছিলেন উপযুক্ত সময়ের।

গীর্জার আবেগকে তিনি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। পাদ্রীদের ক্ষেপিয়ে দিলেন ইহুদীদের বিরুদ্ধে। গ্রানাডার বিজয় সম্বর্ধনা শেষে তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'স্পেনে ইহুদীদের কোন স্থান নেই। হয় ওরা খৃস্টান হয়ে যাবে না হলে দেশ ত্যাগ করবে। এ হুকুম অমান্যকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

খৃস্টানদের দৃষ্টি ঘুরে গেল ইহুদীদের দিকে। সময়ের মোড় ঘুরে গেছে ভেবে গ্রানাডার মুসলমানরা ডুবে গেল আনন্দ কোলাহলে। ওরা ভাবল, এ তাদের যোগ্য উজিরের অসাধারণ সাফল্য। এখন ওদের বাড়িঘর নিরাপদ। মসজিদ মাদ্রাসাগুলো মুক্ত, স্বাধীন।

বাইরের মুসলিম দেশগুলোও ভাবল যে, গ্রানাডার মুসলমানরা এখন সুখেই আছে। অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে ওদের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ কি? তুর্কীদের যুদ্ধ জাহাজগুলোও স্পেন বাদ দিয়ে দৃষ্টি ফিরালো জেনেভা এবং ইটালীর দিকে।

দোতলার এক রুমে জানালার পাশ ঘেঁষে বসেছিলেন আবু আবদুল্লাহ। দৃষ্টি ছিল আবুল কাসেমের বাড়িমুখো পার্বত্য পথের দিকে। হঠাৎ কারো পায়ের শব্দে চমকে পিছন ফিরে চাইলেন। মাকে দেখে বললেনঃ 'আম্মাজান, আপনি?'

কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন সুলতানের মা। চেয়ারে বসতে বসতে বললেনঃ 'তোমার শরীর ভাল তো?'

ঃ 'জ্বী আম্মা, আমার শরীর ভাল। খোলা হাওয়া গায়ে লাগবে ভেবে এখানে বসে আছি।'

বিষণ্ন কণ্ঠে রাণীমা বললেনঃ 'আবু আবদুল্লাহ! ওদিকে তাকিয়ে কোন লাভ নেই। আবুল কাসেম এখন আর তোমার কাছে আসবে না।'

গভীর হতাশা নিয়ে সামনের চেয়ারে বসতে বসতে সুলতান বললেনঃ 'আম্মাজান! কখনো কখনো এ কেল্লাকে কয়েদখানার মত মনে হয়। তখন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।'

ঃ 'এ কয়েদখানাতো তুমি নিজেই কামাই করেছ, বাছা। মরক্কো কোন সংকীর্ণ ভূমি ছিল না, অথচ ইউসুফের দাওয়াত পাবার পর সেখানকার শাসকবর্গ যখন তোমায় আহবান করল, সে ডাকে সাড়া দেয়ার কোন প্রয়োজনই তুমি অনুভব করোনি।'

ঃ 'সে প্রসঙ্গ তুলে কী লাভ মা। ইউসুফকে তো বলেছি, কোন দিন স্পেন ছেড়ে যাব না।'

ঃ 'বেটা!' অশ্রুভেজা চোখে রাণীমা বললেন, 'তোমাকে স্পেন ছেড়ে যেতে বলছি না। আমি বলছি, ফার্ডিনেণ্ড আর আবুল কাসেমের কাছে তুমি ভাল কিছু আশা করে নিজেকেই ধোঁকা দিচ্ছ। গত ক'সপ্তাহ ধরে কতবার তার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছ, অথচ তার চাকররা পর্যন্ত তোমার লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করেনি।'

ঃ 'আম্মাজান! তার চাকর অথবা বাড়ির কাউকে দোষ দিই না। আবুল কাসেম গ্রানাডায় কি করছে ওদের তো তা জানার কথা নয়। গেল বার এসে সে বলেছিল, গ্রানাডায় যা করছি তা সবই আপনার কল্যাণের জন্য। আপনার জন্য আমি যে উপহার আনব, তা দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। একথা তো ঠিক যে, গ্রানাডার পতনের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ঝড় উঠেছিল, আবুল কাসেম তার গতি ইহুদীদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে যারা আফ্রিকা পালিয়ে গিয়েছিল, আবার ওরা নির্ভয়ে ফিরে এসেছে স্পেনে। আম্মা! তিন বছর আগে আপনার মত আমিও তার চেহারা দেখতে ঘৃণাবোধ করতাম। বলতে লজ্জা নেই, এখন আমি তার প্রতীক্ষায় অধীর প্রহর গুনছি। আমার মনে হয়, তাকে দেখলেই আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে, আবার আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

আপনি অভিযোগ করেছেন, সে এখানে এলে সর্দাররা তাকে অভ্যর্থনা করবে, অথচ ওদেরকে নিয়ে তার সভাগুলোর খবর পর্যন্ত আমি জানতে পাই না। এরপরও আমার মনে হয়, তার সব তৎপরতা আমার ভালোর জন্যই। আবুল কাসেমের বুদ্ধির কারণে গত তিন বছরে আলফাজরায় একবারও বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। সে না থাকলে কি যে হতো আমাদের? ফার্ডিনেণ্ডও তাকে খুব বিশ্বাস করেন। অপনি দেখবেন, গ্রানাডায় কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হবে তাকে।'

ঃ 'আবুল কাসেম এত ভাল আর ফার্ডিনেণ্ড এতটা মূর্খ হলে তুমি

আলহামরা থেকে বের হতে!' একরাশ বেদনা ঝরে পড়লো রাণীমাতার কণ্ঠে থেকে, 'হায়! বার বার বিষাক্ত সাপের গর্তে হাত ঢুকানো থেকে যদি তোমার মা তোমাকে ফিরিয়ে রাখতে পারতো! এ সাপ তোমাকে কয়েকবারই ছোবল মেরেছে। আবু আবদুল্লাহ! আমার ভয় হয় আবুল কাসেম যখন ফার্ডিনেণ্ডের শেষ পয়গাম তোমাকে পৌঁছাবে, তুমি তখন আমায় বলবে, মা আমি আবার অজগরের মুখে মাথা গলিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'আম্মাজান! আবুল কাসেম নির্বোধ নয়। এখানেই তাকে থাকতে হবে। কিন্তু আমাকে হিজরত করতে হলে সে যে এখানে থাকতে পারবে না তা কি সে বুঝে না?'

ঃ 'দুশমনের যে খেদমত আবুল কাসেম করেছে, তাতে একটা দুইটা নয়, কয়েকটা জায়গীরই সে পেতে পারে। এ জায়গীর তো আমরা যতদিন আছি ততোদিন পর্যন্ত। আমাদের তৎপরতার উপর নজর রাখাই এর উদ্দেশ্য। শোন, সমগ্র আলফাজরা এখন গোয়েন্দায় ভরে গেছে। আমাদের কোন কথাই আর গোপন থাকে না। আমাদের কৃষক আর চাকর বাকররাও যে ফার্ডিনেণ্ডের গোয়েন্দা নয়, এটাই বা বলি কি করে। আফসোস! ইউসুফের কথায় তুমি কান দাওনি।। সে নিরাশ হয়েই ফিরে গেছে। এখন গ্রানাডা থেকে কেউ এলেই মাসয়াবের ঘরে যায়। সে ঘরের সাদিয়ারই কেবল আমাদের জন্য একটু টান আছে। বলতে গেলে আমি ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম। তার মা'কে স্নেহ করতাম মেয়ের মত। সম্ভবতঃ মাসয়াব আমাদের ঘরে সাদিয়াকে আসতে নিষেধ করেছে। গত কয়েক মাসে সে একবারও আসেনি।'

ঃ 'এটা সত্যি হলে মাসয়াবকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' খানিকটা ঝাঁঝের সাথে বললেন আবু আবদুল্লাহ, 'কিন্তু আমি স্পেন ছেড়ে যাচ্ছি না। আফ্রিকা যাওয়ার চাইতে আত্মহত্যা করা আমার জন্য অনেক সহজ।'

পুত্রের দিকে কতক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে রইলেন রাণীমা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন। আবু আবদুল্লাহ উঠে আবার জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল।

হঠাৎ সিঁড়ি থেকে কারো দ্রুত পা ফেলার শব্দ ভেসে এল! একটু পর তার স্ত্রী মুখ কালো করে সামনে এসে দাঁড়াল।

ঃ 'আপনি আবার আম্মার সাথে ঝগড়া করেছেন!'

ঃ 'কেন, আম্মা কি কিছু বলেছেন?' আবু আবদুল্লাহর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

ঃ 'তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনি তাড়াতাড়ি নিচে চলুন।'

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন আবু আবদুল্লাহ। মায়ের কামরায় ঢুকে দেখলেন তিনি নিঃসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন।

সুলতানকে দেখে চাকরাণী একদিকে সরে দাঁড়াল। সুলতান এক হাতে তাঁর নাড়ি দেখে আরেক হাত কপালে রেখে তাপ পরীক্ষা করলেন।

ঃ 'আম্মাজান!' তিনি ধরা গলায় বললেন, 'আমায় ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে রাগাতে চাইনি আম্মাজান, আপনার সব হুকুম আমি পালন করব।' পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই আবু আবদুল্লাহ চিৎকার দিয়ে বললেন, 'কি দেখছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকো।'

ঃ 'ডাক্তার এখনি এসে পড়বেন। আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।' রাণী বললেন।

এক বৃদ্ধ ডাক্তার কামরায় প্রবেশ করলেন। সুলতানকে একদিকে সরিয়ে রাণী মায়ের নাড়িতে হাত রাখলেন তিনি। রাণীমার ঠোঁট নড়ছিল, কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না তিনি। ডাক্তার ব্যাগ থেকে ঔষধ বের করছেন, অকস্মাৎ কেঁপে উঠল রাণীমার দেহ। তাঁর চোখের সামনে নেমে এল মৃত্যুর কালো পর্দা।

ডাক্তার আবার তার নাড়ি দেখলেন। তারপর আবু আবদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন।

'মা মরে গেছেন' যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না আবু আবদুল্লাহ। তার চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রু। মায়ের পায়ে মাথা রেখে সুলতান শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর। কয়েকজন অশ্বারোহীকে আশপাশে খবর দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হল। সুলতান গ্রানাডার শাহী কবরস্থানে মায়ের দাফন করার দরখাস্ত করলেন গভর্ণরের কাছে। আবুল কাসেমকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে এর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলেন। তিনি আরো লিখলেন, 'আলফাজরা থেকে মাত্র কয়েকজন আমরা জানাজার সাথে যাব। দাফন শেষ হলেই আবার সবাই ফিরে আসব।'

সহসা এক পরিচারিকা কামরায় ঢুকে বললঃ 'আলীজাহ, আম্মাজান বলেছেন গ্রানাডায় কোন দূত পাঠানোর পূর্বে রাণীমার অসিয়ত পড়ে নিতে।'

তখনো মায়ের অসিয়ত সম্পর্কে আবু আবদুল্লাহ কিছুই জানতেন না।

তিনি দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলেন কক্ষ থেকে। গিয়ে দাঁড়ালেন রাণীর সামনে। এক চিলতে কাগজ এগিয়ে ধরে রাণী বললেনঃ 'কয়েক মাস পূর্বে মা এ চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তাগিদ দিয়ে বলেছিলেন এ চিঠি যেন তার মৃত্যুর পর খোলা হয়।'

কাঁপা হাতে চিঠি তুলে নিলেন সুলতান।

ঃ 'তুমি তো এ চিঠির কথা একবারও আমাকে বলোনি?' এক রাশ অভিমান ঝরে পড়ল সুলতানের কণ্ঠ থেকে।

ঃ 'এ ছিল তাঁর হুকুম।'

আবু আবদুল্লাহ চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল তার চোখ দুটো। তিনি লিখেছেনঃ

'এক হতভাগী মায়ের বদনসীব বেটা। দুনিয়ায় কত প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সমাজে ওদের কত প্রয়োজন ছিল। অনেকের কাজ এখনো শেষ হয়নি কিন্তু মৃত্যু তা দেখেনি।

বেটা আমার!

বেশি দিন জীবনের ভার বহন করার শক্তি আমার নেই। এ বিরাণ ভূমিতে মৃত্যুর কল্পনা করতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে তোমাকে কিছু বলা দরকার। কিন্তু চরম বিপদেও কোন মা তার সন্তানের অস্থিরতা দেখতে চায় না। এ জন্য আমার অন্তিম কথাগুলো তোমার বেগমের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি।

গ্রানাডা ছাড়ার আগে ভাবতাম, জীবনের শেষ শয্যা হবে তোমার পিতার পাশে। কিন্তু শেষ বার যখন কবরস্থানে গেলাম আর ভাবলাম জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে হবে দূর বিজনে, তখনকার অসহায়ত্বের বেদনা তোমাকে আর বলতে চাই না। আলফাজরা এসে মনে হল, গ্রানাডা নয়, এখানেই আমার কবরের জন্য একটা স্থান খুঁজে নেয়া উচিত।

বেটা আমার! তুমি তো এখানকার শত বছরের পুরনো কবরস্থান দেখেছ? গোর রক্ষী ওখানে তারিকের সময়কার কয়েকজন শহীদের কবর আমাকে দেখিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে মরক্কো যাওয়া না হলে সেই শহীদদের পদতলেই আমায় দাফন করো। ঈদের দিন হাজার হাজার মানুষ সে কবরগুলো জিয়ারত করে। গত ঈদে যখন ওখানে গিয়েছিলাম, আমার এ অন্তিম ইচ্ছেটা গোর রক্ষীকে বলেছিলাম।

আমার কবর পাকা করার প্রয়োজন নেই। ইতিহাসের পাতা থেকে

হয়তো আমার নাম মুছতে পারব না, কিন্তু আমার কবরের কোন চিহ্ন না রাখাই হবে আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ। নয়তো আমার আত্মা কষ্ট পাবে।

আবু আবদুল্লাহ! কোন জাতির সালতানাত ধ্বংস হয়ে গেলে সম্রাটদের শেষ চিহ্নও মুছে যায়। আমি সে সম্রাটের মা, যার হাতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে স্পেনের গৌরবময় মুসলিম সালতানাত। আলীশান কবরের পরিবর্তে স্মৃতিচিহ্নহীন ভাংগা কবরের ধূলো হয়তো আমায় মানুষের অভিশাপ থেকে বাঁচাবে, হয়তো কারো কারো দয়াসিক্ত দোয়াও আমার নসীবে জুটতে পারে। এর বেশী আর কি চাইতে পারি আমি!

ইতি তোমার মা।'

পড়া শেষ হলে চিঠিটা চোখে চেপে আবার কেঁদে উঠলেন আবু আবদুল্লাহ। অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। এক সময় বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। পরদিন। আলফাজরার হাজার হাজার লোক রাণীমার জানাজায় শরীক হল।

ফার্ডিনেণ্ডের নতুন ভাবনা

টলেডোর শাহী মহল। ফার্ডিনেণ্ড আর সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা বসে আছেন মসনদে। মসনদের সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে আবুল কাসেম। এই প্রথমবার সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী তাকে বসতেও বললেন না।

কতক্ষণ তাচ্ছিল্যের সাথে তার দিকে তাকিয়ে থেকে ফার্ডিনেণ্ড বললেনঃ 'আবু আবদুল্লাহর মায়ের মৃত্যু সংবাদ পাবার তিনদিন পর তোমার রওয়ানা হবার সংবাদ পেয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম আলফাজরার নতুন খবরাখবর নিয়ে তুমি আসবে।'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট!' আবুল কাসেম জবাব দিলেন, 'সংবাদ আদান প্রদানের এমন ব্যবস্থা করেছি, আলফাজরার মামুলী ঘটনাও আমার অজানা থাকবে না। যাওয়ার আগে গ্রানাডার গভর্ণরের সাথে দেখা করেছি। তিনিও বলেছেন, এ মুহূর্তে হুজুরের কদমবুসির জন্য হাজির হওয়া জরুরী।'

ঃ 'আবুল কাসেম!' বললেন সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা, 'গেল বার এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, আবু আবদুল্লাহর অস্তিত্ব থেকে একদিন স্পেনকে

পবিত্র করবে।'

ঃ 'মহামান্যা সম্রাজ্ঞী, আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সময় এসে গেছে। সুলতানের মায়ের মৃত্যুর পর এ গোলামের পথের সব বাঁধা দূর হয়েছে। তাঁর মায়ের উপস্থিতিতে যা বলতে পারতাম না, এবার নির্দ্বিধায় আবু আবদুল্লাহকে তাই বলতে পারব। আমার ভয় ছিল, সন্ধি-চুক্তির বাইরে কিছু করতে গেলে আবু আবদুল্লাহর মা সর্বশক্তি দিয়ে বাঁধা দেবেন। আবু আবদুল্লাহও তখন তার কথাই মেনে নেবে। এ পরিস্থিতিতে আলফাজরার জংগী কবিলাগুলোও উত্তেজিত হয়ে উঠত। এবার আর কোন ভয় নেই। কার্ডিজের সম্রাজ্ঞীর শেষ ইচ্ছের প্রতি সম্মান দেখাতে আমি তাকে বাধ্য করতে পারব।'

ফার্ডিনেণ্ড বললেনঃ 'আবুল কাসেম, এ কাজটুকু করতে পারলে স্পেনের ভবিষ্যত বংশধররা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে ভাববে। ঐতিহাসিকরাও তোমার এ খেদমতের কথা কখনো ভুলবে না।'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট, মুনীবকে খুশী করাই এক গোলামের সবচেয়ে বড় পাওয়া।'

ঃ 'বসো, গোলাম নয়, তোমাকে আমরা একান্ত বন্ধু বলেই মনে করি।'

একটু পিছিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন আবুল কাসেম। এতোক্ষণে মৃদু হাসি ফুটল সম্রাজ্ঞীর ঠোঁটে। তিনি বললেনঃ 'আবুল কাসেম! তোমার অতীত খেদমতের কথা আমরা ভুলিনি। এখন বলো তোমার শেষ জিম্মা কবে পূর্ণ করবে। কবে আবু আবদুল্লাহ থেকে পবিত্র হবে স্পেন?'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট! রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁর জায়গীরের দাম পরিশোধ করার অনুমতি পেলে ক'দিন পরে শুনবেন, এ গোলাম আপনাদের শেষ ইচ্ছেও পূরণ করেছে। গ্রানাডার গভর্ণর এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারলে আমি এখানে আসতাম না। আবু আবদুল্লাহর ব্যাপারে আপনাদের ফয়সালাও তার জানা নেই। মিণ্ডোজা বলেছেন, চুক্তির বাইরে কোন প্রস্তাব যেন হুজুরের দরবারে পেশ না করি।'

ঃ 'তোমার কি মনে হয় আবু আবদুল্লাহ জায়গীর বেঁচতে রাজি হবে?'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি রাজি হবেন।'

ঃ 'কিন্তু তুমি তো জানো, যুদ্ধের ফলে আমাদের কোষাগার প্রায় শূন্য। আবু আবদুল্লাহর দাবী কিভাবে পূরণ করব?'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট! এটাও খুব কঠিন হবে না। তাকে সামলানোর

দায়িত্ব আমার। তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসব যে, শুধু পথ খরচটাকেই সে অনেক বড় পুরস্কার মনে করবে। আপনার হুকুম পেলে গভর্ণর মিগুেজাই সে ব্যবস্থা করতে পারবে। এতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তেমন কোন চাপ পড়বে না। আবু আবদুল্লাহর জায়গীর বিক্রি করলেও তার চেয়ে বেশী পাবেন আপনি।'

ঃ 'তাহলে মিগুেজাকে কালই আমি হুকুম পাঠাচ্ছি। প্রয়োজন হলেই গ্রানাডার কোষাগার থেকে অর্থ নিতে পারবে। কত টাকায় আবু আবদুল্লাহর দাবী মেটানো যাবে বলে মনে কর তুমি?'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট! আমি এক লাখ ডুকটের (স্পেনের মুদ্রার নাম) মধ্যেই তার দাবী মেটাতে পারব বলে আশা রাখি। চেষ্টা করব এখান থেকেও যেন কিছু বেঁচে যায়।'

হতভম্বের মত সম্রাটের দিকে তাকিয়ে সম্রাজ্ঞী বললেনঃ 'মাত্র এক লাখ ডুকট? আবুল কাসেম, এ সমস্যা মিটাতে পারলে আবদুল্লাহর জায়গীর হবে তোমার। এক লাখ থেকে যা বাঁচাতে পারবে তাও তুমি নেবে।'

ঃ 'না রাণী, আবুল কাসেম স্পেনের নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা, সে গ্রানাডার দুয়ার খুলে দিয়েছিল আমাদের জন্য। তার পুরস্কার এত সামান্য হতে পারে না। ওই জায়গীরই শুধু তার পুরস্কার নয়। আবু আবদুল্লাহ চলে গেলে আবুল কাসেমকে বড় কোন পদ দিয়ে দেব। এখন আমাদের মেহমানের বিশ্রামের প্রয়োজন।' বললেন ফার্ডিনেণ্ড।

আবুল কাসেম উঠে কুর্ণিশ করে শাহী মেহমানখানার দিকে হাঁটা দিল। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ফার্ডিনেণ্ড। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইলেন তিনি।

ঃ 'আপনি কি ভাবছেন?'

ঃ 'না কিছু না।' চমকে জবাব দিলেন ফার্ডিনেণ্ড।

ঃ 'আবু আবদুল্লাহ কি যাবে? আপনার কি মনে হয়?'

ঃ 'রাণী, যেদিন সে গ্রানাডা থেকে বিদায় হয়েছিল সে দিনই আমরা তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম।'

ঃ 'তাহলে এত কি ভাবছেন? আবুল কাসেমের ওয়াদা কি বিশ্বাস করা যায় না?'

ঃ 'তার আসার সংবাদ পেয়েই আমি বুঝেছিলাম, আবু আবদুল্লাহর হাত থেকে মুক্তি পাবার সময় এসেছে। কিন্তু যে লোকটি হায়েনার চাইতে হিংস্র

আর শৃগালের চেয়ে ধূর্ত তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। যে কুকুর মুনীবকে দংশন করে তাকে কিভাবে বিশ্বাস করা যায়! আপন জাতির দুশমন কী করে অন্যের বন্ধু হতে পারে?'

ঃ 'তার বন্ধুত্ব বা শত্রুতায় এখন আমাদের কী আসে যায়! আবুল কাসেম যে সালতানাতের উজির ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। তার জাতির ওপর আমরা বিজয় লাভ করছি। যাকে যে কোন মুহূর্তে খাঁচায় আবদ্ধ করা যায়, তাকে নিয়ে ভাববার কি আছে?'

ঃ 'রাণী! সে তার ভবিষ্যত আমাদের সাথে জুড়ে দিয়েছে বলে আমরা সন্তুষ্ট। মনে করো, অন্য কারো সাথে যদি সে তার ভবিষ্যৎ জুড়ে দিতে চায়, আমাদের জন্য তা কত বিপজ্জনক হবে। তার সাথে যখন আবু আবদুল্লাহর ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলাম, আমার মনে হয়েছিল, এখানে না এসে আমাদের ধ্বংস করার জন্য সে যদি তুরস্কের সিপাহসালারের কাছে যেত, তা হলে কী পরিকল্পনা পেশ করত?'

চঞ্চল হয়ে রাণী বললেনঃ 'ঈশ্বরের দিকে চেয়ে আমায় পেরেশান করবেন না। স্পেনে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান আপনি দিতে পারেন না। আপনি গ্রানাডার টাকশালের সামান্য কটা কড়ি দিয়ে এমন কাজ করেছেন, সালতানাতের সব টাকা খরচ করলেও যা সম্ভব হত না।'

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল ফার্ডিনেণ্ডের ঠোঁটে। রাণীর মনে হল, তার মাথা থেকে সরে গেছে বিরাট এক পাহাড়ের বোঝা।

গাদ্দারীর বিষময় ফল

পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। রাণী মাতার কবরের পাশে দু'হাত তুলে দোয়া করছিল এক বালিকা। কবরস্থানের ভাঙ্গা দেয়ালের বাইরে এক কাফ্রি বালক। দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিল সে। বালিকার মুখমণ্ডল নেকাবে ঢাকা। কবরস্থানের নীরব প্রকৃতিতে ভেসে বেড়াচ্ছিল তার কান্নার শব্দ। কয়েক কদম দূরে কয়েকজন কবর রক্ষী দাঁড়িয়েছিল। দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে এসে এক বালক বললঃ 'মহামান্য সুলতান আসছেন।'

কবরস্থানে আসার সরু পাহাড়ী পথের দিকে এগিয়ে গেল কবর

রক্ষীরা। উঁচু টিলার ওপর দেখা গেল আটজন আশ্বারোহী। দেখতে না দেখতে কবরস্থানের কাছে এসে পৌঁছলেন তারা। ঘোড়া থেকে নেমে পা বাড়াতেই অন্যান্য রক্ষীরা এগিয়ে এসে সালাম করল সুলতানকে। সালামের জবাব দিয়ে সুলতান পকেটে হাত ঢুকালেন। এক বুড়ো রক্ষীর হাতে টাকা কয়টা দিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

কবরস্থানের ভেতরে পা গলিয়ে দিলেন সুলতান। মায়ের কবরের পাশে এক অচেনা বালিকাকে কান্নারত দেখে হতভম্ব হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সুলতানকে দাঁড়াতে দেখে বুড়ো রক্ষী ছুটে এসে বললঃ 'আলীজাহ, এ বালিকা প্রায়ই রাণী মাতার কবরে ফাতেহা পড়তে আসে।'

ঃ 'ওকে চেন?'

ঃ 'আলীজাহ, ওকে আবুল কাসেমের কেল্লার দিক থেকে আসতে দেখি। কখনো অন্য মেয়েদের সাথে পায়ে হেঁটে আসে। ঘোড়ায় চড়ে এলে ওই কাফ্রি ছেলেটা থাকে তার সাথে। শুনেছি ও নাকি আবুল কাসেমের আত্মীয়। হুজুরের হুকুম হলে ওকেই জিজ্ঞেস করি।'

ঃ 'না, ওকে নিশ্চিন্তে দোয়া করতে দাও। এমন মেয়ের একনিষ্ঠ দোয়াই আমার মায়ের প্রয়োজন।'

খানিক অপেক্ষা করে এগিয়ে গেলেন সুলতান। কবর থেকে পনেরো বিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে দোয়ার জন্য হাত তুললেন তিনি।

মুনাজাত শেষে পেছনে ফিরল মেয়েটি। সুলতানকে দেখে হকচকিয়ে গেল। মাথা নিচু করে ধীর পায়ে এক বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পর। মায়ের কবরের পাশে অশ্রু ভেজা চোখে দাঁড়িয়েছিলেন আবু আবদুল্লাহ। মেয়েটি সংকোচ ঝেড়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সুলতানের কাছে এগিয়ে গেল।

ঃ 'আলীজাহ!' বিষন্ন কণ্ঠে বলল ও, 'আপনার কাছে একটা আবেদন পেশ করার অনুমতি চাই।'

পিছন ফিরে আবু আবদুল্লাহ বললেনঃ 'হতভাগা জাতির এক নির্বাসিত সুলতান ফুলের মত পবিত্র এক বালিকার হৃদয়ের কোন ইচ্ছে বা আশা পূরণ করতে পারবে বলে যদি মনে করো তবে নিঃসঙ্কোচে তা বলতে পারো?'

ঃ 'এই নিন আলীজাহ।' বলেই মেয়েটি একটা মূল্যবান ঝলমলে মুক্তার হার সুলতানের সামনে তুলে ধরল। বলল, 'আপনার জাতির এক

মুজাহিদের বিধবা স্ত্রী এ হার নিয়ে গর্ব করতেন। যেদিন আলহামরায় তার স্বামীর শাহাদাতের খবর পেয়েছিলেন, তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রাণীমা নিজেই চলে এসেছিলেন। তিনি নিজের হাতে এ মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন সে বিধবার গলায়। মহামান্য সুলতান, সেদিনের সে বিধবা ছিলেন আমার আম্মা। মৃত্যুর পূর্বে এ মালা তিনি আমায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই উপহার আমি আপনার খেদমতে পেশ করতে চাই। এ হার বিক্রি করে রাণীমার কবর পাকা করে দেবেন।'

অসহনীয় ব্যথায় ভরে গেল আবু আবদুল্লাহর অন্তর। বেদনার্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'না, না, এক এতিম বালিকার কাছ থেকে মায়ের এ উপহার আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না।'

ঃ 'আপনাকে দুঃখ দেয়ার জন্য কথাটা বলিনি। আলফাজরায় আপনার কি অবস্থা না জানলে এ প্রস্তাব পেশ করার সাহস করতাম না।'

অশ্রুসজল হয়ে উঠল আবু আবদুল্লাহর চোখ। কোন মতে অশ্রু সংবরণ করে বললেনঃ 'বেটি! মায়ের কবর পাকা করতে পারব না এতটা রিক্ত এখনো হইনি। আমার কিছু না থাকলেও আলফাজরার লোকেরা আমায় সাহায্য করত। অনেকে প্রস্তাবও দিয়েছিল। কিন্তু আম্মাজান তার কবর পাকা করতে নিষেধ করে গেছেন। আজ আম্মা যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে বলতেন, মুক্তার হারের চেয়ে এ বালিকার দোয়াই আমার কাছে বেশী মূল্যবান। এ হার পেশ করে তুমি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছ সে জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এ হার তোমার কাছেই রাখো।'

মাথা নত করে মেয়েটি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আবু আবদুল্লাহ দু'পা এগিয়ে হারটি নিজের হাতে নিয়ে বালিকার গলায় নিজ হাতে আবার তা পরিয়ে দিলেন। বললেনঃ 'তুমি কি আবুল কাসেমের বাড়ি থেকে এসেছ?'

ঃ 'জ্বী।' অনিরুদ্ধ কান্নার আবেগ সংযত করে মেয়েটি বলল, 'আবুল কাসেম আমার দূর সম্পর্কের মামা আর মাসয়াব আমার খালুজান।'

ঃ 'তুমি যে এখানে আসো মাসয়াব কি জানে?'

ঃ 'আলীজাহ! আমি এক মুজাহিদ পিতার সন্তান। এখানে আসতে কারো অনুমতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। খালুজানের কাজে আপনি হয়তো মনঃক্ষুন্ন হতে পারেন। কিন্তু আমার মায়ের প্রতি রাণীমার অনুগ্রহ তাঁরা ভুলবেন কি করে? বাড়ি থেকে বের হলেই খালুজান বুঝেন আমি কবরের দিকেই আসব। তিনিও একবার আমার সাথে এসেছিলেন।

জীবনে সেই প্রথম তার চোখে পানি দেখেছি।'

ঃ 'তোমার নামই কি সাদিয়া?'

ঃ 'জ্বী।'

ঃ 'আম্মাজান তোমার খুব প্রশংসা করতেন।'

ওড়না দিয়ে উদগত অশ্রু মুছে সাদিয়া বলল, 'তাঁর স্নেহই ছিল আমার বড় আশ্রয়। মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে থাকতে পারিনি, তাঁর কোন সেবা করতে পারিনি, জীবনভর এ দুঃখ আমাকে তাড়না করবে।'

ঃ 'যতদিন পর্যন্ত তোমার মত মেয়েরা আমার মায়ের জন্য এমনিভাবে দোয়া করবে, ততদিন পর্যন্ত আমার এ দুঃখ থাকবে না যে, স্পেন থেকে আমার মায়ের নাম মুছে গেছে। তোমার কথা মনে থাকবে আমার। এবার আমাকে বিদায় দাও। আসি বেটি, খোদা হাফেজ।'

ঃ 'খোদা হাফেজ।' বলল সাদিয়া।

একটু পর কবরস্থান থেকে বেরিয়ে কাফ্রী বালকের হাত থেকে বলগা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল ও।

এক রাতে রক্ষী বাহিনী প্রধানের সাথে আবু আবদুল্লাহ দাবা খেলছিলেন। চাকর কক্ষে ঢুকে বললঃ 'আলীজাহ, আবুল কাসেম গ্রানাডা থেকে ফিরে এসেছেন।'

ঃ 'কোথায়?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করলেন আবু আবদুল্লাহ।

ঃ 'বাড়িতে। আমাদের লোকেরা বিকেলে পনেরো বিশজন লোককে তার বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে।'

ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত যে আবুল কাসেম তাদের সাথে ছিল?'

ঃ 'জ্বী। আমাদের লোকেরা গ্রানাডার পথের এক গ্রাম থেকে এর সত্যতা যাচাই করেছে।'

ঃ 'কিন্তু সে আমাকে সংবাদ দেয়নি কেন? সোজা কেন এখানে আসেনি?' অসহায়ের মত শোনাল তার কণ্ঠ।

ঃ 'জাঁহাপনা।' রক্ষী বাহিনী প্রধান বলল, 'তিনি হয়ত ভেবেছেন রাতে জাগালে আপনার কষ্ট হবে, আর তিনিও তো ক্লান্ত, এ জন্যই হয়ত আসেননি।'

এতেও স্বস্তি পেলেন না আবু আবদুল্লাহ। চাকরের দিকে ফিরে বললেনঃ 'গেটের দারোয়ানকে বলে দাও, সে এখানে এলেই যেন আমার কাছে

পৌঁছে দেয়।'

বেরিয়ে গেল ভৃত্য। কতকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আবু আবদুল্লাহ আবার খেলতে লাগলেন। পর পর দু'বার হেরে মন খিঁচড়ে গেল তার। খেলা শেষ করে সংগীকে বললেনঃ 'তুমি আরাম করোগে, সে হয়েতো ভোরের আগে আসবে না।'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে বৃদ্ধ রক্ষী প্রধান। সীমাহীন অস্বস্তি আর উৎকণ্ঠা নিয়ে অনেকক্ষণ পায়চারী করলেন সুলতান। শেষ রাতের দিকে পাশের কামরায় ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি। তারপরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার ঘুম এল না।

কারো আলতো স্পর্শে হঠাৎ বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসলেন তিনি। দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাণী।

ঃ 'আবুল কাসেম এসে গেছে?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'না।' মাথা নাড়লেন রাণী।

খালি পায়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন আবু আবদুল্লাহ।

ঃ 'অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

ঃ 'আজ আপনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।'

ঃ 'সে কি কোন সংবাদও দেয়নি?'

ঃ 'কে, আবুল কাসেম?'

ঃ 'ও যে বাড়ি এসেছে তুমি জানো?'

ঃ 'আজ ভোরে জানতে পেরেছি।'

ঃ 'আমার ঘোড়া প্রস্তুত করতে বলো। আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।' স্বামীর দিকে তাকালেন রাণী, 'আপনি কি ওখানে যাবেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।' আবদুল্লার কণ্ঠে বিরক্তি, 'কেন, তোমার কোন আপত্তি আছে?'

ঃ 'আপনার আম্মা যতদিন ছিলেন, এ নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার ছিল না। এখন আপনাকে কিছু বলতে চাইলে মনে হয় পাহাড়ই কেবল পাহাড়ের বোঝা বইতে পারে। আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিলে বলবো, সুলতান আবুল হাসান এবং রাণীমার সন্তান আর আমার মাথার মুকুট সে গাদ্দারের বাড়ি যেতে পারবে না। আপনার সাথে আফ্রিকার যে কোন স্থানে যেতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু তবুও এ অপমান সইতে পারবো না। আপনাকে কোন সংবাদ না দিয়ে সে বাড়িতে বসে আছে অথচ আপনি তার

কাছে যেতে চাইছেন।'

আবু আবদুল্লাহ মাথা নিচু করে ভাবনার অতলে হারিয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ পর এক চাকরাণী কামরায় ঢুকে বললোঃ 'রক্ষী প্রধান বলেছে, আবুল কাসেম এসেছেন।'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন সুলতানঃ 'রাণী, এবার কি হুকুম?'

ঃ 'আলীজাহ'! ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন রাণী, 'আমি তো শুধু আকাঙ্খা করতে পারি। আগে নাশতা করে নিন। কথাবার্তায় ও যেন বুঝতে না পারে যে, এক গাদ্দারের সাথে দেখা করার জন্য আপনি এতটা উদগ্রীব ছিলেন।'

দোতলা থেকে নেমে এলেন সুলতান আবু আবদুল্লাহ। সিঁড়ির সামনে ক'জন সশস্ত্র লোকের সাথে দাঁড়িয়েছিল রক্ষী প্রধান। আদবের সাথে সালাম করে বললোঃ 'জাহাঁপানা, উজিরে আজম অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তার সাথে কয়েকজন খৃষ্টানও আছে। সম্ভবতঃ তিনি আপনার জন্যে দামী কোন উপহার নিয়ে এসেছেন। আমরা খচ্চরের পিঠ থেকে আটটা সিন্ধুক তুলে এনে বৈঠকখানায় রেখেছি।'

নীরবে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন আবু আবদুল্লাহ। তাকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো আবুল কাসেম। ভক্তিতে গদগদ হয়ে মোসাফেহা করে বললঃ 'আলীজাহ! রাণীমার জানাজায় শরীক হতে পারিনি, মরণ পর্যন্ত আমার এ দুঃখ থাকবে। হঠাৎ আমাকে টলেডো যেতে হয়েছিলো। ভোরে তার কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলাম, তার মর্যাদা অনুযায়ী যদি তার শেষ শয্যা হতো!'

আবুল কাসেমের এ সহমর্মিতা আবু আবদুল্লাহর সব অনুযোগ দূর করে দিল। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে বললেনঃ 'আপনি বসুন। আপনি এসেছেন, আমি রাতেই এ সংবাদ পেয়েছি।'

ঃ 'জাঁহাপনা! এসেই আপনার কদমবুসি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাতে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানোর সাহস পাইনি। অন্য কারণও ছিল, ফার্ডিনেণ্ড আপনার জন্য কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। এবড়ো থেবড়ো পাহাড়ী পথে রাতের বেলা তা বয়ে আনা সম্ভব ছিল না, আর আমিও খুব ক্লান্ত ছিলাম। ফার্ডিনেণ্ড ও রাণী ইসাবেলা আপনার মায়ের মৃত্যু সংবাদে খুবই দুঃখ পেয়েছেন। এখানে থাকলে প্রতি মুহূর্তেই আপনার জান্নাতবাসিনী মায়ের স্মৃতি আপনাকে পীড়া দেবে ভেবে তারা বলেছেন, আলফাজরায় আপনার ভাল না লাগলে সম্মানের সাথে আপনাকে বিদায় জানানো হবে

আপনার যে পুঁজিপাট্টা শেষ হয়ে গেছে, তাও বুঝতে দেয়া হবে না।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুলতানের মুখ থেকে কোন কথা ফুটলো না। তার মনে হলো এক নিস্পাপ ছাগ শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে হিংস্র নেকড়ে। তিনি ধরা গলায় বললেনঃ 'আবুল কাসেম, ফার্ডিনেণ্ডের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ নিয়ে এলে পরিস্কার করে বলো।'

ঃ 'আলীজাহ! আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা ঠিক হবে না। কেবল আপনার জন্যেই আমি টলেডো গিয়েছিলাম। যে সিন্দুকগুলো আমি এনেছি তা খুললেই বুঝবেন আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসিনি। আপনার জন্য আশি হাজার ডোকট নজরানা হিসেবে নিয়ে এসেছি। আমি জানি আপনার হাত শূন্য। চাকর-বাকরদের বেতনও ঠিকমতো দিতে পারছেন না, এ জায়গীর আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। এ আশি হাজার ডোকটে মরক্কো অথবা মেসোপটেমিয়ায় এর চেয়ে বেশী জমিই আপনি কিনতে পারবেন।'

শরীরের সব রক্ত হিম হয়ে গেল আবু আবদুল্লাহর। কতক্ষণ অনিমেষ নয়নে আবুল কাসেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাগে গোস্বায় সহসা খঞ্জর বের করে চিৎকার দিয়ে উঠলেনঃ 'গাদ্দার, বেঈমান! তুমি বিষাক্ত সাপ। কয়েকবার আমায় দংশন করেছ। এবার বেঁচে যেতে পারবে না।'

তাড়াতাড়ি এক দিকে সরে গেল আবুল কাসেম। বলল, 'আলীজাহ, ভাল করে ভেবে দেখুন আমাকে হত্যা করার পর আপনার পরিণাম কি হবে। আলফাজরার প্রতিটি কবিলা আপনাকে ঘৃণা করে। স্পেন ছেড়ে আপনি কোথায় যাবেন তা তাদের জানার প্রয়োজন নেই। বরং আমি তাদের শেষ ভরসা। আমার মৃত্যুর পর তাদের ওপর যে বিপদ আসবে তার দায় দায়িত্ব হবে আপনার। এতে শুধু আলফাজরাই ধ্বংস হবে না, নিরপরাধ মুসলমানের খুনে ভিজে যাবে গ্রানাডার অলিগলি। আমি আপনার ভবিষ্যতের নিরাপত্তা চাইছি, এই কি আমার অপরাধ? এ জন্যই কি আমায় শাস্তি দিতে চাইছেন? আমি আপনার দুশমন নই সুলতান। যদি জানতাম আপনার ভবিষ্যত বিপদমুক্ত, তাহলে আপনাকে দেশ ছাড়ার পরামর্শ দিতাম না। আপনার গ্রানাডা ত্যাগের সময় আমার বিশ্বাস ছিল ফার্ডিনেণ্ড চুক্তি ভাঙবেন না। কিন্তু সংকীর্ণমনা পাদ্রিরা তাকে বুঝিয়েছে যে, এক দেশে দু'জন বাদশাহ থাকে না। ফার্ডিনেণ্ড এবং রাণীকে আমি বুঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু গীর্জার বিষাক্ত চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করতে পারিনি।'

তখনও আবু আবদুল্লাহর হাত কাঁপছিলো। খঞ্জর সরিয়ে নিতে নিতে

বললেনঃ 'কোনো গর্দভ এখনও আমায় সুলতান মনে করে নাকি'?'

ঃ 'আপনি অসহায়, নিজের কওমকে এ কথা হয়তো বোঝাতে পারবেন, কিন্তু যে সব পাদ্রিরা আলহামরার শান-শওকত দেখেছে, আপনি যে আলফাজরার এ সামান্য জমি নিয়ে তুষ্ট, এ কথা আপনি ওদের কি করে বোঝাবেন? কোন দিন তুর্কী আর বারবারী ফৌজের সাহায্যে হারানো সালতানাত উদ্ধারের চেষ্টা করবেন না, কী করে ওদের এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করবেন?

মহামান্য সুলতান! আপনার এ ভৃত্য আপনার অবস্থা সম্পর্কে বেখবর নয়। আপনার মন মানসিকতা সে বোঝে। আমার কথায় আপনি হয়তো কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু যখন আফ্রিকার মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবেন, তখন বুঝবেন তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই আপনার জন্য কল্যাণকর হয়েছে। আপনার ভবিষ্যত নিষ্কন্টক করার এর চেয়ে ভাল কোন পদ্ধতি জানা থাকলে আপনার কাছে আসতাম না। হয়তো বলবেন, আপনার আকংখা পূরণ করতে পারিনি। কিন্তু খোদা সাক্ষী, জেনেশুনে আপনার কোন ক্ষতি আমি করিনি। যুগের চোরাবলিতে আমাদের পা আটকে গেছে। আমার জন্য ভাবি না। আপনাকে এ চোরাবালি থেকে উদ্ধার করা আমার প্রথম কর্তব্য। আমি ফার্ডিনেণ্ডের কোন নির্দেশ নিয়ে আপনার কাছে আসিনি। আপনি এখানে থাকতে চাইলে নীরবে চলে যাবো। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকবো আপনার অনুগত হয়ে। ফার্ডিনেণ্ডের যে আশি হাজার ডোকট নজরানা নিতে অস্বীকার করেছেন, এতে হয়তো তিনি রাগ নাও করতে পারেন। হয়তো তিনি আপনার ভবিষ্যত নিয়ে ভাববার সুযোগ আপনাকেই দেবেন। কিন্তু কোনদিন যদি রাণী ইসাবেলা আর পাদ্রিদের সিদ্ধান্তই বিজয়ী হয় তবে ফার্ডিনেণ্ডের দূত পৌছবে আপনার কাছে। আমার চেয়ে কঠিন হবে তার মুখের ভাষা। আপনার তরবারীকে তখন তারা ভয় পাবে না।'

আবু আবদুল্লাহর মনে হলো হাত-পা বেঁধে যেন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কম্পিত পায়ে তিনি পিছিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

ঃ 'আবুল কাসেম! আমার হত্যাকারীকে চামড়া তুলে নেয়ার আনন্দ থেকে নিরাশ করতে চাই না। সফরের ব্যবস্থা করো। প্রস্তুতির জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় হলেই আমার চলবে।'

ঃ 'আলীজাহ! এ ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে তিক্ত কর্তব্য। সফরের

ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে না। ফার্ডিনেণ্ড কথা দিয়েছেন, আপনার জন্য সরকারী জাহাজের ব্যবস্থা করবেন। রাজকীয় সম্বর্ধনা দিয়েই আপনাকে বিদায় জানানো হবে।'

ঃ 'না, ফার্ডিনেণ্ডের জাহাজের প্রয়োজন নেই আমার। আমার ব্যবস্থা আমিই করতে পারবো। আগামী কাল আমার দূত মরক্কো রওনা হবে। আমার বিশ্বাস, আমার জন্য জাহাজ পাঠাতে মরক্কোর সুলতান অস্বীকার করবেন না। আমার শুধু নিকটতম বন্দর থেকে জাহাজে চড়ার অনুমতি প্রয়োজন।'

ঃ 'জাঁহাপনা, আপনার জন্য আসা জাহাজ যেন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে সে জিম্মা আমি নিচ্ছি। মরক্কোর সুলতান আপনাকে আশ্রয় দিলে ফার্ডিনেণ্ড এতে আপত্তি করবেন না। এমনকি তিনি তুর্কী জাহাজকেও উপকূলে আসার অনুমতি দেবেন।'

ঃ 'স্পেনের উপকূলে আমার জন্য আসা তুর্কী জাহাজ কারো অনুমতির তোয়াক্কা করে না। কিন্তু ওরা এসে আমাকে এ অপমানকর অবস্থায় দেখুক আমি তা চাই না। ফার্ডিনেণ্ডকে আশ্বস্ত করতে পারো, মরক্কো ছাড়া অন্য কোন দেশে আমি যাবোনা। মরক্কোর কোন নৌ অফিসারের সাথে পরিচয় থাকলে লিখে দাও, আমার দূতকে মরক্কোর উপকূলে নামিয়ে দিতে।'

ঃ 'আলীজাহ, ফার্ডিনেণ্ডের বিশেষ দূত আমার সাথে এসেছেন। কাল ভোরেই চিঠি নিয়ে মরক্কোর নৌবাহিনী প্রধানের কাছে রওনা হবেন তিনি।'

ঃ 'তুমি কত সতর্ক আবুল কাসেম! কত কর্তব্যপরায়ণ তুমি, তোমার কোন কাজ অসমাপ্ত নয়। সত্যি করে বল তো, আমাকে কতদিনের মধ্যে বের করার ওয়াদা করে এসেছ?'

ঃ 'সুলতান! এ সব তিক্ত কথায় এখন আর কি লাভ? আমি জানি আমি এক অনভিপ্রেত দায়িত্ব পালন করছি।'

ঃ ' তুমি কতদিন এখানে থাকবে?'

ঃ 'আপনার অনুমতি পেলে দু'তিন দিন বিশ্রাম করেই চলে যাবো।'

ঃ 'কেন, আমার বিদায়ের দৃশ্য দেখবে না?'

ঃ 'আলীজাহ! সময় পেলে কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। নয়তো আমাদের সাক্ষাৎ হবে সমুদ্র উপকূলে। কিছু মনে না করলে আরেকটা কথা বলতে চাই।'

ঃ 'বলো।'

ঃ 'জাঁহাপানা, আপনি যাচ্ছেন আলফাজরার লোকেরা যেন তা জানতে না পারে।'

ঃ'কেন, তুমি কি মনে কর, জানাজানি হলে আলফাজরায় বিদ্রোহ হবে?'

ঃ 'না, তবে লোকেরা আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে।'

ঃ 'তুমি ফার্ডিনেণ্ডকে সংবাদ পাঠাতে পারো যে, আমার চলে না যাওয়া পর্যন্ত দু'একজন বিশ্বস্ত লোক ছাড়া আজকের কথাবার্তাও কেউ জানবে না।'

উঠতে উঠতে আবুল কাসেম বললোঃ 'এবার আমায় অনুমতি দিন। যে কয়দিন এখানে আছি প্রতিদিন একবার করে হাজিরা দেয়ার চেষ্টা করবো।'

আবু আবদুল্লাহ মোসাফেহার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কি মনে করে বললেনঃ 'আবুল কাসেম, দাঁড়াও, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।'

পিছন ফিরে চাইলো আবুল কাসেম।

ঃ 'বলুন।'

মুখে তিক্ত হাসি টেনে আবু আবদুল্লাহ বললেনঃ 'আমি ভাবছি, আমি যখন চলে যাবো, যখন রাণী ইসাবেলা এবং পাদ্রিরা নিশ্চিন্ত হবে, তখন তো তারা আবার তোমায় বাড়তি বোঝা মনে করবে না? তারা তো ভাববে না যে, ক্ষুদ্র কাজের জন্য এত বড় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নেই। তার মানে, আমার মত আহাম্মক এখানে থেকে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ওরা যখন বুঝবে, তুমি প্রয়োজনের চাইতে বেশী হুঁশিয়ার, যে কোন মুহূর্তে তোমার বুদ্ধিমত্তা ওদের বিপদের কারণ হতে পারে, তখন তোমার সম্পর্কে ওদের ফয়সালায় কোন রদবদল হবে না তো?'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল আবুল কাসেমের চেহারা। সে কতকক্ষণ আবু আবদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে থেকে ধরা গলায় বললোঃ 'সাধ্য মতো আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি, এরপর আমার পরিণতি কি হবে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।'

সুলতান এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'বন্ধু! তোমায় অহেতুক পেরেশান করতে চাইনি। আমার মত লোকেরা অন্ধকারে লাগামহীন পথে চলতে গিয়ে পরিণতির কথা ভাবে না। কিন্তু তুমি দূরদর্শী। তবুও তোমায় একটা পরামর্শ দেবো। প্রতিটি সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে ভাববে যে, আগত প্রতিটি ভোর অথবা সন্ধ্যা তোমার জীবনের শেষ রাত বা প্রভাত যেন না হয়। এবার যাও। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।

সময় সুযোগ পেলে মন খুলে আলাপ করবো।'

আবুল কাসেম কেল্লা থেকে বেরিয়ে এলো। পাহাড়ী পথে ছুটে চললো তার ঘোড়া। সারা পথ কানের কাছে বাজতে থাকলো আবু আবদুল্লাহর শেষ কথাগুলো। কিছুতেই মন থেকে তা সে মুছে ফেলতে পারছিল না।

অশ্বারোহী

চার দিন পর। গ্রানাডায় ফিরে গেছে আবুল কাসেম। তার উপস্থিতিতে বাড়ি থেকে বেরুনোর সুযোগ পায়নি সাদিয়া। আবুল কাসেমের যাবার পরদিন ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। গ্রানাডার দিকে ছুটল তার ঘোড়া। মাইল দেড়েক গিয়ে বাঁক নিয়ে টিলার পাশ ঘেঁষে এ পথ চলে গেছে বাঁয়ে, আরো এগিয়ে তা হারিয়ে গেছে পাহাড়ের চড়াই উত্‌রাইয়ে। ডানে আরো একটি সংকীর্ণ পথ টিলার পিছনটা ঘুরে চলে গেছে কবরস্থানের দিকে। পেছেনে সাদিয়ার কাফ্রি ক্রীতদাস। মোড় পেরোলেই রাস্তা তুলনামূলক চওড়া। এখানে এসেই ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল সাদিয়া।

কবরস্থানের কাছে এসে সে ঘোড়া থেকে নেমে চাকরের অপেক্ষা করতে লাগল। বৃদ্ধ গোররক্ষী এগিয়ে ঘোড়ার লাগাম হাত তুলে নিতে নিতে বললঃ 'আজ গোলাম আসেনি আপনার সাথে?'

ঃ 'সে পেছনে আসছে।'

সাদিয়া এগিয়ে গেল রাণীমার কবরের দিকে। ফাতেহা পড়ে দু'হাত তুলে মুনাজাত করল। মুনাজাত শেষে সে দৃষ্টি ছুঁড়ল সামনের সংকীর্ণ উপত্যকায়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘন বৃক্ষের সারি। পাহাড় চূড়া সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল। আকাশে উড়ছিল একটা ঈগল। পাখিটি ধীরে ধীরে উপরে উঠছিল। সাদিয়া তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। হঠাৎ উপত্যকার ওপাশে সবচে কাছের টিলাটিতে দৃষ্টি আটকে গেল তার।

পাহাড় চূড়ায় দেখা গেল এক অশ্বারোহী। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে নিচে নামতে লাগল। ঘোড়া নিয়ে কেন, এ দুর্গম পথে খালি পায়েও নিচে নামতে পারবে না, প্রথম নজরেই বুঝল সাদিয়া। সে তাকে সাবধান করতে চাইল। বলতে চাইল, তুমি মৃত্যুর সাথে খেলছো। কিন্তু এত দূর থেকে

লোকটা তার কথা শুনতে পাবে না। চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে দু'হাত উপরে তুলে ইশারা করতে লাগল সাদিয়া। পনের বিশ গজ নিচে এসে অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে তার লাগাম ধরে টানতে লাগল।

ঃ 'না, না।' সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার দিল সাদিয়া। চিৎকার শুনে চাকর আর কবর রক্ষী ছুটে এল তার কাছে।

ঃ 'মালকিন, ও নিশ্চয়ই পাগল।' গোলাম বলল, 'কিন্তু আত্মহত্যার জন্য এত সুন্দর ঘোড়াটা মারার দরকার ছিল না। সামনের ঢাল বেয়ে ঘোড়া দূরে থাক, একটা ছাগলও নামতে পারবে না। আপনি বললে আমি লোকটাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করি।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে জলদি যাও।' সাদিয়ার কণ্ঠে আকুলতা।

এক দৌড়ে চাকরটি গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল। সাদিয়া ও তিনজন কবর রক্ষীও ছুটতে লাগল তার পিছনে পিছনে। চাকরটা সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার দিতে লাগলঃ 'দোহাই খোদার, ওখানেই থাম। তুমি নামতে পারবে না।'

ঃ 'মা, আপনি একটু সাবধানে হাঁটুন। সামনে গভীর খাদ। ঐ দেখুন লোকটা এমন জায়গায় ঘোড়াটা ছেড়েছে, এখান থেকে ফিরে যাওয়াও কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।' বলল বুড়ো গোর রক্ষী।

ঃ 'কিন্তু সে নিজে কোথায়?' উপত্যকায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলল সাদিয়া।

ঃ 'ওই ঝোপের দিকে দেখুন।' হাত দিয়ে ইশারা করল বৃদ্ধ, 'সে একেবারে পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। ওখানে দাঁড়াবারও কোন জায়গা নেই। লোকটা ওখানে থেমে গেলে হয়তো কিছুটা সাহায্য করা যেত। আপনার চাকরের আওয়াজ তো সে নিশ্চয়ই শুনেছে। না, না সে পাগল নয়। আমার মনে হয় সে বড় কোন বিপদে পড়েছে। নয়তো এমন কোন উদ্দেশ্য আছে যা তার জীবনের চাইতেও প্রিয়।'

কখনো লোকটার দিকে আবার কখনো তার ঘোড়ার দিকে তাকাচ্ছিল সাদিয়া। হঠাৎ পর্বত চূড়ায় দেখা দিল আরো দু'জন অশ্বারোহী। রোদে ওদের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ ঝলমল করছে। নিচের দিকে তাকিয়ে তীর আর পাথর ছুঁড়তে লাগল ওরা। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিল লোকটা। হঠাৎ পাথরে টক্কর খেয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটি। এরপর পাহাড়ি পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে সাদিয়ার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল। একটু পর খাদ থেকে ভেসে এল কানফাটা চিৎকার।

আগন্তুকের পায়ের ধাক্কায় একটা পাথর নিচে পড়ল। সাথে সাথে তার দু'হাতে ধরে রাখা ডালটাও ভেঙ্গে গেল মড়াৎ করে। পাথরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে একটু নিচের একটা ঝোপের সাথে আটকে গেল সে। ঝোপের দুর্বল গাছগুলো তার বোঝা ধরে রাখতে পারল না। ততোক্ষণে আগন্তুকের পা খুঁজে পেয়েছে আরেকটা পাথর।

ঃ 'আল্লাহ তোমায় সাহায্য করুন। তার অজস্র করুণা তোমার উপর বর্ষিত হোক।' প্রতি কদমে এ দোয়া করে এগোতে লাগল সাদিয়া।

কাফ্রী গোলাম দৌড়ে এসে বললঃ 'আপনি সামনে যাবেন না। গাছের আড়াল থেকে বের হওয়া আপনার জন্য ঠিক হবে না। আমার মনে হয় এ খৃষ্টানগুলো এসেছিল আমাদের মুনীবের সাথে। আর পোশাকে-আশাকে আগন্তুককে মুসলমান বলে মনে হয়। এখন আর তারা একে দেখবে না। আক্রমণকারীরা তাকে মৃত ভেবে ফিরে গেলেই কেবল সে বাঁচতে পারে। এমনওতো হতে পারে, আমরা যার জন্য উৎকণ্ঠিত সে আমাদের দুশমন। দেখলে বুঝতেন, তার ঘোড়াটা দেখতে ঠিক আমাদের উজিরে আজমের ঘোড়ার মত।'

ঃ 'আসলেও তুমি পাগল হয়ে গেছ। কোন সুন্দর ঘোড়া দেখলেই তা মুনীবের ভেবে বসে থাক।'

গোলাম আর কিছুই বলল না। সাদিয়ার দৃষ্টি আটকে রইল আগন্তুকের ওপর। বৃদ্ধ গোররক্ষী বললঃ 'মনে হয় ওরা ফিরে যাচ্ছে।'

চূড়ার দিকে তাকাল সাদিয়া। হামলাকারীরা ঘোড়ার লাগাম ধরে চলে যাচ্ছে। দেখতে না দেখতেই তারা দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

ঃ 'সত্যিই কি সে নেমে আসতে পারবে?' সাদিয়ার কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঃ 'দুর্বল না হয়ে পড়লে হয়তো বেঁচে যাবে। বিপজ্জনক স্থানটা ও পেরিয়ে এসেছে। খাদে নেমে গেলে আমরা নিয়ে আসতে পারব। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।'

ঃ 'না আমিও খাদ পর্যন্ত যাব।'

বৃদ্ধ হাঁটতে হাঁটতে বললঃ 'হামলাকারীরা খৃষ্টান হলে মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে ওরা ফিরে যাবে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওরা এদিকে আসতে পারে, যদিও অনেকটা পথ ঘুরে তাদেরকে এদিকে আসতে হবে। আমার মনে হয়, এখানে বেশী সময় থাকা যাবে না। আগন্তুককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে হবে। আপনি গিয়ে

কয়েকজন সশস্ত্র লোক পাঠিয়ে দিলেই বরং ভাল হয়।'

ঃ 'একজন অচেনা আগন্তুকের জন্য আমাদের কোন লোক খৃস্টানদের সাথে সংঘর্ষে যাবে না। আমার ঘোড়া এবং কিছু পানি নিয়ে আসুন। সে বেঁচে গেলে সকলকে দশটা করে স্বর্ণ মুদ্রা বকশিশ দেব।'

বুড়ো ফিরে গেল। একটু পর বাকি তিনজন নেমে গেল পাহাড়ি খাদে। সাদিয়া তাকিয়েছিল আগন্তুকের দিকে। দু'হাতে ঝোপটাকে জাপটে ধরে লোকটি পাহাড়ের সাথে মিশেছিল। হঠাৎ শোনা গেল সাদিয়ার চাকরের কণ্ঠঃ 'আমরা তোমার সাহায্যে এসেছি। তোমার দুশমন ফিরে গেছে। সরাসরি নামতে পারবে না। ডানের ফাটলের কাছে পৌঁছার চেষ্টা কর। ওখান থেকে সহজে নেমে আসতে পারবে।'

ঈষৎ মাথা তুলল আগন্তুক। ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগল ডানে। সাদিয়ার হৃদয় ধুকপুক করতে লাগল। সমগ্র শক্তি দিয়ে ও চিৎকার করে নিষেধ করতে চাইল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে তার। নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও ভয়ে ও চোখ মুদে ফেলল।

চার মিনিটে প্রায় এক গজের মত এগিয়ে এসেছে লোকটি। সামনে প্রায় পাঁচ ফুট চওড়া পানির নহর। হাল্কা স্রোতের উপর হাত ছড়িয়ে দিল আগন্তুক।

ঃ 'সাবাস।' একজন গোররক্ষী চিৎকার দিয়ে উঠল।

আগন্তুক ধীরে ধীরে নেমে আসছে। যুবকের বীরেচিত অবিশ্বাস্য কাজগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সাদিয়া, অকস্মাৎ গাছের আড়ালে সিজদায় পড়ে সে শিশুদের মত কেঁদে ফেলল।

খাদে নেমে উপুড় হয়ে কতক্ষণ নিশ্চল পড়ে রইল যুবক। ততোক্ষণে সাদিয়ার লোকেরা তার কাছে গিয়ে পৌঁছল। আলগোছে মাথা তুলল যুবক। ওদের দেখেই বসে পড়ল। তার জামা কাপড় ছিড়ে গেছে। হাত, কনুই, হাঁটু এবং কপাল ছিড়ে রক্ত ঝরছে।

ঃ 'আপনারা কি নিশ্চিত যে, ধাওয়াকারীরা চলে গেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।' এক গোররক্ষী জবাব দিল। 'আপাতত আপনার কোন ভয় নেই। তবে অনেক পথ ঘুরে ওরা এদিকটায় আসতে পারে। এ জন্যে এখানে অপেক্ষা করা আপনার উচিত হবে না। যদি হাঁটতে পারেন তবে বৃক্ষের ওপাশটা অনেক নিরাপদ। এর পর আমরা আপনার আশ্রয়ের একটা ব্যবস্থা করব। কষ্ট অবশ্য হবে, তবে এ চড়াই এতো কঠিন নয়, একটু

চেষ্টা করলেই উঠতে পারবেন।'

ঃ 'চলুন।' যুবক দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কুদরত আপনাদেরকে যদি আমার সাহায্যের জন্যেই পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের সাথে থাকতে আমার কোন কষ্ট হবে না।'

কম্পিত পায়ে সে তাদের সাথে এগিয়ে চলল।

কয়েক পা এগিয়ে কাফ্রি গোলাম বললঃ 'আপনার ঘোড়াটার জন্যে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। এমন সুন্দর পশু খুব বেশী দেখা যায় না। আপনার ঘোড়াটা দেখতে ঠিক আমাদের মুনীবের ঘোড়াটার মত।'

ঃ 'তোমাদের মুনীব?' চমকে কাফ্রির দিকে চাইল যুবক।

ঃ 'সে উজির আবুল কাসেমের চাকর।' বলল এক বুড়ো।

ঃ 'উজিরের বাড়ি এখান থেকে কত দূর?'

ঃ 'বেশী দূরে নয়।'

ঃ 'তিনি কি বাড়ি আছেন?'

ঃ 'না গ্রানাডা গেছেন।'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'কাল ভোরে। কিন্তু আপনার দুশমন কারা তা তো বললেন না।'

ঃ 'ওরা খৃস্টান। আমি এখনো জানি না ওরা কেন আমার পিছু ধাওয়া করেছে। উজিরের ঘোড়া এ ঘোড়াটার মতই ছিল এ ব্যাপারে কি তোমরা নিশ্চিত?'

ঃ 'হ্যাঁ।' চাকরটা জবাব দিল, 'দূর থেকে ঘোড়াটা দেখেই মনে হল এ আমার মুনীবের ঘোড়া। হয়তো এ আমার অমূলক সন্দেহ। উজিরের ঘোড়া এখানে আসবে কোত্থেকে।'

কিছু বলতে চাচ্ছিল যুবক, কিন্তু কি ভেবে নিরব হয়ে গেল।

বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দারুণ অস্বস্তিতে দু'তিন মিনিট তার দিকে তাকিয়ে থেকে সাদিয়া চাকরকে ডেকে বললঃ 'আবু ইয়াকুব, তাকে উপরে তুলে নিয়ে এস।'

আবু ইয়াকুব ও একজন গোররক্ষী যুবকের হাত ধরে উপরে নিয়ে এল। জিহবা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে সে বললঃ 'আমায় ছেড়ে দিন। একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এখন আমি সম্পুর্ণ সুস্থ।'

কয়েক পা এগিয়ে বৃক্ষের আড়ালে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসল যুবক। বুড়ো এক গ্লাস পানি তুলে দিল তার হাতে। এক নিঃশ্বাসে গ্লাস

শূন্য করে সে তৃষ্ণার্ত চোখে আবার চাইল বুড়োর দিকে। বুড়ো পর পর আরো দু'গ্লাস পানি এগিয়ে দিল।

নিজের পরণের ওড়না ছিঁড়ে ফেলল সাদিয়া। ছেঁড়া টুকরো পানিতে ভিজিয়ে তার কাছে বসে ক্ষত স্থান পরিস্কার করতে লাগল। জীবনে এই প্রথম সাদিয়া কোন যুবকের কাছাকাছি বসেছিল। যুবক যখন দুর্গম পর্বতের কোল ঘেঁষে জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, সাদিয়া তখন কল্পনার পাখায় ভর করে সে সব মুজাহিদদের দেখছিল, যারা বিভিন্ন রণক্ষেত্রে দেখিয়েছিল অসীম সাহস। সিজদায় পড়ে সে যখন তার জন্যে দোয়া করছিল তখন বার বার তার মনে হয়েছিল যুবক যদি নিরাপদে নেমে আসতে পারে, তাকে বলব, আমি অমুকের সন্তান। আপনি যদি অমুক যুদ্ধে অংশ নিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তাকে চেনেন। কিন্তু এখন একে দেখে মনে হচ্ছে সে এখনো পূর্ণ যুবক হয়নি। সৈনিক নয়, একে একজন ছাত্র বলে মনে হয়। তবুও তার চেহারায় যে বীরত্ব আর সাহসের ছাপ আছে তাতে তাকে মনে হচ্ছে এক দিগ্বিজয়ী রাজপুত্তুর।

ক্ষত স্থান সাফ করে ওড়নার ছেঁড়া টুকরা দিয়ে তাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগল সাদিয়া। নিজের অজান্তে সাদিয়ার দিকে দৃষ্টি পড়লে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল যুবকের চেহারা।

ঃ 'আপনি কে?' সাদিয়া প্রশ্ন করল।

ঃ 'আমি এক বিপন্ন মুসাফির। নাম আবুল হাসান।'

ঃ 'আপনার বিপদ আমি বুঝতে পারছি। কারণ একটু পূর্বে দেখেছি আপনি মৃত্যুর সাথে খেলছেন। কিন্তু এখানে আমাদের বেশী সময় থাকা ঠিক হবে না। আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন?'

ঃ 'কোন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে হেঁটে যাওয়াই ভাল হবে। কিন্তু আমার জন্য আপনি কোন বিপদে পড়ে যান, তা আমি চাই না।'

ঃ 'আমার পিতা একজন মুসলমান ছিলেন, যে মায়ের দুধ পান করেছি তিনিও মুসলমান।'

ঃ 'মাফ করুন, আমি ও কথা বলিনি। আপনি হয়তো জানেন না, আমার ধাওয়াকারীরা ছিল খৃস্টান সৈন্য। আমার বিশ্বাস, আমাকে হত্যা না করে ওরা ফিরে যাবে না। এ জন্য আমাকে সাহায্য করার পূর্বে ভেবে দেখবেন আমার জন্যে আপনি আবার বিপদে না পড়েন।'

অশ্রু সংবরণ করে সাদিয়া বললঃ 'এসব কথা বলার জায়গা এটা নয়।

আপনার কাহিনী শোনার পূর্বে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছা দরকার।'

চাকরকে ইশারা করল সাদিয়া। গাছের সাথে বাঁধা দুটো ঘোড়া খুলে নিয়ে এল সে। উঠে দাঁড়াল আবুল হাসান। ঘোড়ার লাগাম তার হাতে তুলে দিতে দিতে সাদিয়া বললঃ 'আপনি এতে সওয়ার হোন। কোন বিপদ দেখলে এর গতির ওপর নির্ভর করতে পারবেন।'

ঘোড়ায় চড়ে বসল আবুল হাসান।

ঃ 'আবু ইয়াকুব, তাড়াতাড়ি সামনের পর্বত চুড়ায় উঠে গ্রানাডার পথের দিকে নজর রাখো। কোন দুশমন দেখলে আমাদের সতর্ক করবে। আমরা তোমার পেছনে আসছি।' গোলামকে বলল সাদিয়া।

চাকর ছুটে বৃক্ষের আড়াল হয়ে গেল। সাদিয়া ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গোর রক্ষীদের বললঃ 'এর ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, আলফাজরার মুক্তিকামীরা গর্ত থেকে একটা লোককে তুলে পূর্ব দিকে নিয়ে গেছে। এও বলতে পার যে, বেশ কিছু পাহাড়ি কবিলা জমায়েত হচ্ছে কয়েক মাইল দূরে। আমার বিশ্বাস, সে পশুগুলো বড় ধরনের কোন ঝুঁকি নিতে চাইবে না।'

কাফ্রি চাকরকে টিলার পাশে সড়কের এক সংকীর্ণ মোড়ে দেখা গেল। নিশ্চিন্তে নিচে নেমে আসছে সে। সাদিয়া ঘোড়া থামিয়ে তার দিকে চাইল। চাকর নিকটে এসে বললঃ 'সামনে কোন বিপদ নেই। আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছার চেষ্টা করুন।'

সাদিয়া ঘাড় ফিরিয়ে আবুল হাসানের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। টিলার অর্ধেকটা পথ পার হতেই হাসান দেখতে পেল সামনে সবুজ শ্যামল ভূমি। তার মাঝে কেল্লার মত একটা বাড়ি। সাদিয়ার কাছে এসে আবুল হাসান বললঃ 'আপনার বাড়ি কোন দিকে?'

ঘোড়া থামাল সাদিয়া। কেল্লার দিকে ইশারা করে বললঃ 'ওটিই আমাদের বাড়ি, আপনার কষ্ট হলে এখানে একটু বিশ্রাম করি।'

ঃ 'এ কেল্লায় কে থাকেন?'

ঃ 'উজিরে আজম আবুল কাসেম।'

ঃ 'আর আপনি?'

ঃ 'আমিও ওখানে থাকি। আবুল কাসেম আমার আত্মীয়।'

ঃ 'কিন্ত...' আবুল হাসান বলল, 'আমি ওখানে যাব না।'

চঞ্চল হয়ে সাদিয়া বললঃ 'খৃস্টানদের ভয় থাকলেও আমাদের বাড়ির চেয়ে নিরাপদ কোন বাড়ি এখানে পাবেন না। দুশমন এ বাড়িতে তল্লাশী করার সাহস করবে না। আপনার একজন ভাল ডাক্তার প্রয়োজন, আমাদের ডাক্তার যথেষ্ট অভিজ্ঞ।'

ঃ 'দেখুন, আসল কথাটা এখনো বলতে পারিনি। আপনার চাকর খাদে আমার ঘোড়া দেখে বলেছে, ওটা দেখতে ঠিক উজিরের ঘোড়ার মত।'

ঃ 'দূর থেকে দেখে আমিও প্রথম তাই অনুমান করেছিলাম। পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। এক রকম ঘোড়া তো কতই থাকতে পারে।'

ঃ 'ঘোড়াটা কিন্তু আমার নয়। জীবন বাঁচানোর জন্য পথে এতে সওয়ার হয়েছিলাম। অনেক দীর্ঘ সে কাহিনী। আপনার চাকরের অনুমান যদি সত্যি হয়, আমার আশংকা হচ্ছে, এ ঘোড়ার আরোহী নিহত হয়েছেন।'

স্তম্ভিত সাদিয়া কতক্ষণ আবুল হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বললঃ 'আপনি কি তাকে নিহত হতে দেখেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, তার অন্তিম চিৎকার এখনো আমার কানে বাজছে। আমার ধাওয়াকারীরাই তার হত্যাকারী। নিজেদের অপরাধ লুকানোর জন্য ওরা আমার পিছু নিয়েছিল। এবার ভেবে দেখুন, আমার জন্য অথবা আমি থাকলে আপনার জন্য এ বাড়ি কতটা নিরাপদ।'

সাদিয়ার মনে এক ঝাঁক প্রশ্ন এসে ভীড় করল এক সাথে। কিন্তু চাকর কাছে এসে যাওয়ায় সে বললঃ 'আমার চাকরের সামনে এসব কথা আলাপের দরকার নেই। নিরবে আমার অনুসরণ করুন। ইনশাআল্লাহ আপনাকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে পারব আমি।'

ঃ 'আপনি আমার কল্যাণকামী। আপনাকে কোন বিপদে ফেলতে চাই না। আমাকে আমার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলেই কী ভাল হয় না। সূর্যাস্তের আগেই অনেক দূরে চলে যেতে পারব আমি। পথে নিশ্চয়ই কোন গ্রাম থেকে সাহায্য পাব। কাল আপনার ঘোড়া পাঠিয়ে দেব।'

ঃ 'শত্রুকেও এ অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতাম না। স্বীকার করি আপনি সাহসী এবং বাহাদুর। কিন্তু আপনার ক্ষত স্থানে ঠিকমত ব্যাণ্ডেজ না হলে তা বিগড়ে যেতে পারে।'

ঃ 'চলুন, আমি আপনার দুশমন নই।'

ঃ 'আপনারা থামলেন কেন?' এগিয়ে এসে বলল গোলাম।

কিছুটা ভেবে নিয়ে সাদিয়া বললঃ 'আবু ইয়াকুব, আমি না আসা পর্যন্ত

তুমি বাড়ি যাবে না। এর কথাও কাউকে বলবে না।'

ঃ 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সাদিয়া। বলল, 'ফিরে এসে বলব।'

আবুল হাসানও ঘোড়া ছুটালো তার পিছু পিছু।

পার্বত্য পথে ওরা আরেকটা উপত্যকায় পৌছল। উপত্যকার ঢাল থেকে একটা প্রশস্ত সড়ক অন্য এক কেল্লার দিকে চলে গেছে। এ ভাবে কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ আবুল হাসান বললঃ 'দাঁড়ান, আমার ভুল না হলে এটা নিশ্চয়ই সুলতান আবু আবদুল্লাহর মহল। গ্রানাডায় আমাকে বলা হয়েছিল, আবুল কাসেমের জায়গীরের সীমানা যেখানে শেষ, সুলতানের জায়গীর সেখান থেকেই শুরু।'

ঃ 'আপনার ধারণা ঠিক।' ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিল সাদিয়া।

ঃ 'আপনি কি ওখানে যেতে চাচ্ছেন?'

ঃ 'ওখানে যাবার সাহস করতাম না। কিন্তু এও এক অপারগতা। আপনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুলতানের মেহমান হিসেবে থাকতে হবে। এখানকার ডাক্তারও অভিজ্ঞ।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সাদিয়া। কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল আবুল হাসান। শেষে বাধ্য হয়ে আবু আবদুল্লাহর মহলের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সেও।

কেল্লার ফটকে এসে ঘোড়া থেকে নামল সাদিয়া। একটু এগিয়ে পাহারাদারকে বললঃ 'ইনি আহত, তাড়াতাড়ি একে মেহমানখানায় নিয়ে ডাক্তারকে ডেকে দাও।'

পাহারাদার বললঃ 'আপনি জানেন সুলতানের অনুমতি ছাড়া কোন আগন্তুককে আমরা এখানে আশ্রয় দিতে পারি না।'

ঃ 'সুলতানকে গিয়ে বল, উজির আবুল কাসেমের মহলের যে মেয়েটাকে আপনি রাণীমার কবরের পাশে দেখেছিলেন সে একজন আহত ব্যক্তির জন্য আপনার আশ্রয় চাইছে।'

ভেতর থেকে একজন অফিসার এগিয়ে এসে বললঃ 'আমি একে চিনি। তোমরা আহত যুবককে ভেতরে নিয়ে যাও।'

এরপর সাদিয়ার দিকে ফিরে বললঃ 'কাল থেকে সুলতানের শরীর ভাল নেই। বেশী প্রয়োজন হলে হয়তো সাক্ষাত করতে অস্বীকার করবেন না।

আপনি আমার সাথে আসুন।'

সাদিয়া ঘোড়ার লাগাম এক পাহারাদারের হাতে দিতে দিতে বললঃ 'সুলতানকে কষ্ট দেয়ার আগে আমি যুবকের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

ঃ 'কি দেখছ তোমরা!' অফিসার পাহারাদারকে বললেন, 'ওকে মেহমানখানায় নিয়ে যাও, আর একজন যাও ডাক্তারকে সংবাদ দিতে।'

এক পাহারাদার আবুল হাসানের ঘোড়ার লাগাম ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। বুড়ো অফিসারের সাথে সুলতানের মহলের দিকে এগিয়ে গেল সাদিয়া।

একটু পরে এক চাকরাণীর সাথে রাণীর ঘরে ঢুকল সাদিয়া। সামান্য নুয়ে রাণীর হাতে চুমু খেয়ে বললঃ 'আমার নাম সাদিয়া।'

রাণী উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'বেটি, অনেক দিন পর এলে। স্মরণ শক্তি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি যে তোমায় চিনতেও পারব না।'

ঃ 'সাধ্য থাকলে প্রতিদিন আসতাম। রাণীমার মৃত্যুর দিন শুধু আসার অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু ভীড়ের কারণে আপনার কাছে আসতে পারিনি। আজ বাড়িতে না বলেই চলে এসেছি।'

ঃ 'তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। অবস্থা ভাল তো?'

ঃ 'সুলতানের সাথে জরুরী কথা ছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁর শরীর ভাল নেই।'

ঃ 'এমন সময় তিনি সাধারণতঃ কারো সাথে দেখা করেন না। অবশ্য তোমার কথা আলাদা। বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।'

রাণী পাশের কক্ষে চলে গেলেন। ফিরে এলেন একটা মূল্যবান চাদর নিয়ে। বললেনঃ 'বেটি! এটা পরে আমার সাথে এসো।'

ছেঁড়া ওড়না খুলে সে চাকরাণীর হাতে তুলে দিল। নতুন চাদর গায়ে জড়িয়ে হাঁটা দিল রাণীর সাথে। একটু পর। সাদিয়া সুলতানের সামনে বসে তাকে শোনাচ্ছিল কিছুক্ষণ আগের ঘটনা।

সুলতান আবু আবদুল্লাহর কাছে অপরিচিত এক যুবকের আহত হবার ঘটনা ততো আকর্ষণীয় ছিলনা। কিন্তু যে কিশোরীকে মায়ের কবরের পাশে অশ্রু ঝরাতে দেখেছেন, তার উৎকন্ঠা দূর করা তিনি জরুরী মনে করলেন।

ঃ 'বেটি! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কথা দিচ্ছি, ওর জীবন বাঁচানোর চেষ্টা আমি করব। তার অবস্থা তো আশংকাজনক নয়?' সুলতান বললেন।

ঃ 'না আলীজাহ! ততোটা আশংকাজনক নয়। আমার বিশ্বাস, খুব

শীঘ্রই সেরে যাবে। কিন্তু আমার উদ্বেগের কারণ, তার ধাওয়াকারীরা ছিল খৃস্টান।'

ঃ 'খৃস্টানরা?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করলেন সুলতান, 'ওর অপরাধ কি, সে ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে?'

ঃ 'সে কোন অপরাধ করেনি। আমি এখনো সব কথা শুনিনি। তবুও সে যা বলেছে তাতে বুঝেছি যে, শত্রুরা সম্ভবতঃ নিজেদের অপরাধ ঢাকা দেয়ার জন্যই তাকে হত্যা করতে চাইছে। তার বেঁচে থাকাটা তো অলৌকিক ব্যাপার।'

ঃ 'তার নাম জিজ্ঞেস করেছ?'

ঃ 'ওর নাম আবুল হাসান।'

ঃ 'খৃস্টানরা ধাওয়া করে থাকলে আমার বাড়ির চেয়ে তোমাদের মহলই তার জন্য বেশী নিরাপদ ছিল।'

ঃ 'আলীজাহ! আমি ওদিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথে তার কথা শুনে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে। ওর ঘোড়াটা ছিল দেখতে উজিরে আজমের ঘোড়ার মত। সে নাকি ঘোড়াটা পেয়েছে পথে। সে বলছে, ঘোড়ার আরোহী নিহত হয়েছেন।'

এবার সুলতান সাদিয়ার দিকে গভীরভাবে তাকালেন। সাদিয়াকে পর পর কয়েকটা প্রশ্ন করেও কোন সন্তোষজনক জবাব পেলেন না। রাণীর দিকে ফিরে বললেনঃ 'এ ঘটনা আমার কাছে গল্পের মত মনে হচ্ছে।'

সাদিয়া বললঃ 'আপনি কথা বলতে চাইলে সে-ই হয়তো আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারবে।'

ঃ 'ঠিক আছে, আমি তার সাথে কথা বলছি।'

ঃ 'আমার মনে হয় একথা এখন গোপন থাকাই ভাল।' রাণী বললেন, 'ডাক্তার চলে গেলে তারপর তাকে ডেকে পাঠালে বরং ভাল হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমিও তাকে কয়টা প্রশ্ন করব।'

উন্মোচন

আবুল হাসান নতুন পোশাক পরে দরবার কক্ষে এল। আবু আবদুল্লাহ, রাণী এবং সাদিয়ার কাছে বলতে লাগল পেছনের কাহিনী।

ঃ 'আলীজাহ! আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনদিন হয়তো এখানে আসতাম না। আমি ওবায়দুল্লাহর সন্তান। আমার এক ভাই হামিদ বিন জোহরার সাথে শহীদ হয়েছেন। নিছক দুর্ঘটনাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ....।'

মাঝখানে কথা কেটে সুলতান বললেনঃ 'তুমি ওবায়দুল্লাহর ছেলে হলে এ বাড়ির সবাই তোমার আপন।'

রাণী বললেনঃ 'তোমার ভাই যদি হামিদ বিন জোহরার সাথে শহীদ হয়ে থাকেন তবে এ হতভাগ্য জাতি তোমার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবে না। তুমি আমাদের মেহমান। এবার নির্ভয়ে তোমার কাহিনী বল।'

আবুল হাসান সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকিয়ে বললঃ 'মৃত্যুর সময় আমার পিতার নির্দেশ ছিল, আমি যেন আফ্রিকা চলে যাই। আমি এক কাফেলার সঙ্গী হবার প্রস্তুতি নিলাম। হঠাৎ আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে থেকে যেতে হল।

ইতিপূর্বে আমার বোন এবং তার স্বামী মরক্কো হিজরত করেছে। প্রায় আট মাস অসুস্থ থেকে আম্মাজান ইন্তেকাল করলেন। তারও অন্তিম নির্দেশ ছিল, আমি যেন তাড়াতাড়ি গ্রানাডা থেকে চলে যাই। আম্মার মৃত্যুর দু'দিন আগে এক কাফেলা আলফাজরার দিকে যাত্রা করেছিল। তার দাফন শেষে আমিও সে কাফেলার সঙ্গী হওয়ার জন্য রওনা হলাম। ঘোড়াটা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু পথে তার বিশ্রামের সুযোগ হয়নি। অগ্রগামী কাফেলাকে ধরার জন্য আমি এত দ্রুত ছুটছিলাম যে, তার ধকল সইতে না পেরে গতকাল এক উঁচু পর্বত অতিক্রম করতে গিয়ে ঘোড়াটা মারাই গেল।

রাতটা কোন গ্রামে কাটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তখন অগত্যা হাঁটা শুরু করলাম। নির্জন এলাকা। আশপাশে কোন গ্রাম চোখে পড়ল না। রাত কাটানোর জন্য অবশেষে নিরাপদ স্থান খুঁজতে এক পাহাড়ে উঠলাম।'

পেরেশান হয়ে আবু আবদুল্লাহ বললেনঃ 'নওজোয়ান, তোমার ভূমিকা একটু সংক্ষেপ করো।'

ঃ 'আলীজাহ! আমাকে আমার অতীত কাহিনী বলার হুকুম দিয়েছেন আপনি, বিস্তারিত না বললে প্রকৃত অবস্থা বুঝে উঠা আপনার পক্ষে কঠিন হবে। তবু কথা সংক্ষেপ করার চেষ্টা করব। আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো উচিত নয় আমার। যখন পর্বত চূড়ায় উঠলাম, রাস্তার মোড়ে দেখলাম কয়েকজন অশ্বারোহী। ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু শলাপরামর্শ করে পাহাড়ি

পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। পোশাকে-আশাকে ওদের চার পাঁচজনকে মুসলমান বলে মনে হচ্ছিল। বাকী দশ-বারোজন ছিল খৃস্টান সিপাই। একজনের ঘোড়া ছিল ধূসর। আমি ঝোপের আড়ালে লুকালাম। চূড়া থেকে একটু দূরে দু'টি টিলার মাঝে ছোট্ট ময়দানে ওরা থেমে গেল। ধূসর ঘোড়ার আরোহী ছাড়া নেমে পড়ল বাকি সবাই। চারজন খৃস্টান অকস্মাৎ তার দিকে এগিয়ে গেল। একজন তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ঘোড়ার লাগাম। আরেকজন পা ধরে তাকে টেনে নিচে ফেলে দিল।

হঠাৎ ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। তার পায়ের আঘাতে একজন পড়ে গেল নিচে। যাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়া হয়েছিল, সে সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার করছিলঃ 'কী করছ তোমরা? তোমাদের কি হয়েছে? আমি সম্রাটের বন্ধু। তিনি তোমাদের চামড়া তুলে ফেলবেন।' এরপরই শুনলাম কানফাটা চিৎকার।

ওরা তার ঘোড়াটা ধরার চেষ্টা করল। আমি ঈষৎ মাথা তুলে দেখলাম ঘোড়াটা সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি পালাতে চাইলাম। হত্যাকারীদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড় পড়ে রইলাম। ঘোড়া যখন আমার কাছে এল, ছুটে লাগাম ধরে এক লাফে তার পিঠে চড়ে বসলাম। ঘোড়াটা আমাকে নিয়ে আহত পশুর মত দিকবিদিক ছুটতে লাগল। পাহাড়ের এক ঢালে পৌঁছে কিছুটা শান্ত হল। ঢালুটা তত বিপজ্জনক ছিল না। সহজেই নেমে এলাম। পথে আক্রান্ত হবার ভয়ে ঘোড়ার লাগাম উত্তর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম।'

ঃ 'নিহত ব্যক্তিকে তুমি ভাল করে দেখেছ?' রাণী প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'না, তার সাদা পাগড়ী আর জুব্বা দেখে বুঝেছিলাম সে এক মুসলমান। আমি ছিলাম একটু দূরে, এক ঝলক মাত্র দেখেছিলাম তার চেহারা। সম্ভবত দাঁড়িও ছিল, তবে সাদা। এখন তার চেহারা-সুরতের পুরো বর্ণনা দিতে পারছি না।'

ঃ 'তুমি তাকে নিহত হতে দেখেছ?'

ঃ 'আমি শুধু তলোয়ারের ঝলক দেখেছিলাম। তারপরই ভেসে এসেছিল হৃদয় ফাটা চিৎকার।'

ঃ 'তার কাকুতি মিনতি শুনে সঙ্গীদের কেউ সাহায্য করেনি?'

ঃ 'না, মুসলমানরাও নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। ওরা এ দৃশ্য দেখছিল নীরব দর্শকের মত।'

ঃ 'রাণী!' সুলতান বললেন, 'এখন এসব প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। যারা কোন উজিরকে কিনতে পারে, তার চাকরদের কিনে নেয়া তাদের জন্য অসম্ভব নয়।'

ঃ 'আপনি কি মনে করেন সে ব্যক্তি আবুল কাসেম ছিল?' রাণী প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'হ্যাঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর ঐ চার ব্যক্তি ছিল তার বিশ্বস্ত চারজন চাকর। আমি গ্রানাডা ছেড়ে আসার আগের দিন এ ধূসর ঘোড়া তাকে আমিই উপহার দিয়েছিলাম।'

আবুল হাসানের দিকে ফিরে সুলতান বললেনঃ 'এবার বাকী কাহিনী শেষ করো।'

ঃ 'আলীজাহ!' আবুল হাসান বলতে লাগল, 'আমি তীব্র গতিতে গ্রানাডার দিকে ছুটে চললাম। বাঁয়ে পাহাড়, ডানে শুকনো নহর। নহরের ওপাশে আরেকটা পাহাড়। মাইল খানেক দূরে পর্বতের কোল ঘেঁষে দেখলাম একটা পথ। নহর পেরিয়ে আমি পাহাড় বেয়ে ছুটতে লাগলাম। ততোক্ষণে খৃস্টানরা ডাক-চিৎকার দিতে দিতে সড়কের মোড়ে এসে পৌঁছেছে। কঠিন প্যাথুরে পথে ঘোড়ার পা পিছলে যাচ্ছিল বার বার। নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটা শুরু করলাম। ওরা আমাকে ধাওয়া করে ছুটে আসছিল আমার পিছনে পিছনে। চূড়ায় উঠে ধনুতে তীর জুড়ে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লাম। আমার মত ওরাও হেঁটে পর্বতের চড়াই অতিক্রম করছিল। তাদের প্রথম ব্যক্তি আমার আওতায় আসতেই তীর ছুঁড়লাম। লোকটা পড়ে গেল। লাফিয়ে উঠল তার ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোড়া। আরেকজনকে সাথে নিয়ে পড়ল গভীর খাদে। এবার আমি দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলাম। আরো দু'জন আহত হল। বাকীরা সরে গেল আমার তীরের আওতা থেকে। আমি ক'টা ভারী পাথর ঠেলে দিলাম নিচের দিকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, ভাবলাম আর ওরা পিছু নেবে না। ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম দক্ষিণ দিকে।

নিঃশব্দ রাতের আঁধার ফুঁড়ে চাঁদ বেরিয়ে এল। ক্লান্তি আর পিপাসায় অবসন্ন হয়ে পড়ল আমার দেহ। লাগাম জিনের সাথে বেঁধে খুলে নিলাম পানির মশক। কয়েক ঢোক পান করে আবার রেখে দিলাম। এবার পর্বতের কিনার ঘেঁষে না চলে উপরে উঠতে লাগলাম। কখনো মনে হতো

ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মনের সন্দেহ ভেবে নিশ্চিন্তে চলতে লাগলাম। আরেকটা পর্বত চূড়ায় পৌঁছতেই ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এল আমার সারা শরীর। সামনে থেকে শুরু হয়েছে উপত্যকার ঢাল। তবু না থেমে মাঝ রাত পর্যন্ত চললাম। মশকে পানি নেই। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে ঘন বৃক্ষের ফাঁকে একটা ঝরণা দেখলাম। ঘোড়াকে পানি খাইয়ে আমিও তৃষ্ণা মেটালাম। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চেপে বসলাম ঘোড়ার পিঠে।

পাশের কোন গ্রাম থেকে ভেসে এল কুকুরের ঘেউ ঘেউ। রাতের মধ্যেই আমি যত দূর সম্ভব এগিয়ে যেতে চাইলাম। রাতের তারা আমাকে দিক ঠিক করে দিচ্ছিল। আমি যাচ্ছিলাম সোজা দক্ষিণ দিকে।

আরো এক প্রহর সফর করে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের কোলে চলে এলাম। শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল আমার। নেমে ঘোড়াটা এক গাছের সাথে বেঁধে তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। তখনো সূর্য উঠেনি, গাছের পেছন দিক থেকে ভেসে এল ঘোড়ার পায়ের খটাখট শব্দ। তাড়াতাড়ি তীর ধনু বের করে ঘন গাছের আড়ালে লুকালাম। দেখা গেল তিনজন খৃস্টান অশ্বারোহী। আমার তীরের আঘাতে একজন পড়ে গেল। পালানোর সময় তীরের ঘা খেল আরেকজন।

একটু পর আমি ঘোড়ায় চেপে পর্বতে উঠছিলাম। পালিয়ে যাওয়া খৃস্টানদের ডাক চিৎকারে উপত্যকার বিভিন্ন দিক থেকে ওদের সঙ্গীরা সাড়া দিল। তিন চারশো কদম যেতেই দশ বারোজন লোক আমায় ধাওয়া করল। শুরু হল আমার সফরের কঠিন অধ্যায়। কয়েকটা বিপজ্জনক চড়াই উত্‌রাই খুব কষ্ট করে পার হতে হল। শত্রুদেরকে দূরে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে তীর ছুঁড়তাম। আমার তুনীর যখন শূন্য, তখন পৌঁছলাম এমন এক পর্বতে, যার সামনে গভীর খাদ থেকে মৃত্যু আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

আমার নিজের বলে ওখান থেকে বেঁচে আসিনি। আল্লাহ আমার সাহায্যে ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন। আমি চাই না আমার কারণে আপনি কোন ঝামেলায় পড়েন। আজই এখান থেকে রওনা হয়ে গেলে ভাল হয়, হয়তো ওরা খুঁজতে খুঁজতে এখানেও এসে পড়তে পারে।'

ঃ 'না, তা হয় না।' আবু আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, 'তোমার বিশ্রামের

প্রয়োজন। তাছাড়া কোন মেহমানকে আমরা এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। তোমার কারণে আমাকে কোন ঝামেলাই পোহাতে হবে না। তুমি আমার আশ্রয়ে জানলেও আবুল কাসেমের হত্যাকারীরা এদিকে আসবে না। তাদের অপরাধ তুমি স্বচক্ষে দেখে ফেলেছ এটাই ছিল ওদের পিছু নেয়ার একমাত্র কারণ। তাদের হাতে পড়নি এ তোমার সৌভাগ্য। হয়তো ওরা আবুল কাসেমের হত্যার অপরাধটাই তোমার মাথায় তুলে দিত। তা যাক, এসব শোনার আগেই তোমার ক্ষুধার দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত ছিল। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো। তবে মনে রেখো, আর কারো সামনে এসব কথা বলো না।'

আবু আবদুল্লাহ হাততালি দিলেন। চাকরাণী এল। তিনি বললেনঃ 'একে মেহমানখানায় নিয়ে যাও। খানসামাকে এক্ষুণি এর জন্য খাবার দিতে বল।'

চাকরাণীর পিছু পিছু মহল থেকে বেরিয়ে এল আবুল হাসান। বেগমের দিকে চেয়ে সুলতান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ 'এ নওজোয়ানের দিকে তাকিয়ে আমার বারবার মনে হচ্ছে, এই দুর্ভাগা জাতি গ্রানাডার অস্ত্রাগারের কত অস্ত্র কাজে লাগাতে পারেনি। এ সাহসী যুবক আমায় কী ভাবছে! ভবিষ্যৎ বংশধররা যখন নিদারুণ হতাশা আর অপমানে জর্জরিত হয়ে আলহামরার দিকে তাকাবে, আমায় কী মনে করবে ওরা?'

আলোচনার মোড় ঘুরাতে চাইলেন রাণী।

ঃ 'ভাবতেও অবাক লাগে যে, আবুল কাসেমের ব্যাপারে আপনার সন্দেহ এত শীঘ্র ফলে গেল।'

ঃ 'আলীজাহ!' সাদিয়া দাঁড়িয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ হয় ঘর থেকে বেরিয়েছি। এবার আমায় এজাযত দিন।'

ঃ 'বাড়ি গিয়ে কি বলবে?'

ঃ 'জানি না। তবুও খালুজানের রাগ থেকে বাঁচার জন্য একটা উপায় তো বের করতেই হবে।'

ঃ 'মাসয়াবকে আমি ভাল করে চিনি। আবুল কাসেমের মৃত্যুর কথা সে বিশ্বাসই করবে না। হয়ত তোমার এখানে আসায় ও রাগ করতে পারে।'

ঃ 'আমি তার বন্দিনী নই। রাণীকে সালাম জানাব এতে তিনি আপত্তি করতে পারেন না।'

আবু আবদুল্লাহ কী ভেবে বললেনঃ 'একটু বসো সাদিয়া। মাসায়াবকে একটা চিঠি দিচ্ছি। আশা করি আমার চিঠি পেলেই এখানে চলে আসবে।

তার সামনে আবুল কাসেমের প্রসঙ্গ তোলার দরকার নেই। আমি নিজেই তাকে বলবো। শত্রুকে বুঝাতে হবে যে, আমরা আবুল কাসেমের ব্যাপারে কিছুই জানি না। এখানে না আসতে চাইলে বলবে, গ্রানাডা থেকে কি সংবাদ নিয়ে একজন লোক এসেছে। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না।'

আবু আবদুল্লাহ বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন একটি চিঠি নিয়ে।

ঃ 'এ চিঠিটা নিয়ে যাও। কেল্লার দু'জন রক্ষী তোমার সাথে যাবে।'

ঃ 'তার প্রয়োজন নেই। আমার একটা অতিরিক্ত ঘোড়া নেয়ার জন্য একজন মানুষ দরকার।'

তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে রাণী বললেনঃ 'বেটি! আমরা যতদিন আছি, এ ঘরের দুয়ার তোমার জন্য খোলা থাকবে।'

সাদিয়া নিচে নেমে এল। আঙ্গিনায় তার অপেক্ষায় ছিল চাকররা। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে এক চাকরকে বললোঃ 'আমি আহত ব্যক্তিকে দেখব।'

ঃ 'আসুন।' চাকর তাকে মেহমানখানায় নিয়ে চলল।

শুয়েছিল আবুল হাসান। সাদিয়াকে দেখেই ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল।

ঃ 'না না, আপনি শুয়ে থাকুন।' সাদিয়া বলল, 'আমি বাড়ি যাচ্ছি, কথা দিন আমার সাথে দেখা না করে চলে যাবেন না।'

ঃ 'আপনার সাথে দেখা না করে চলে যাব, এ ধারণা আপনার হল কেমন করে?'

ঃ 'রাতে কোন কোন তারা আকাশ থেকে ছুটে এসে সহসাই আবার তা হারিয়ে যায়।'

ঃ 'ছুটে যাওয়া তারারা তাদের ভাগ্যের সাথে লড়তে পারে না। কিন্তু কথা দিচ্ছি, আপনার অনুমতি ছাড়া যাব না।'

ওরা নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। ধীরে ধীরে নুয়ে এল সাদিয়ার চোখ জোড়া। আবুল হাসান বললঃ 'ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন। হয়তো আর কোনদিন আপনাকে দেখতে পাব না। আমি কী স্বার্থপর, এখনো আপনার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম না।'

ঃ 'আমার নাম সাদিয়া।'

ঃ 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আফসোস, আমি কোন সুসংবাদ নিয়ে

আসিনি।'

ঃ 'আমরা দুঃসংবাদ শুনতে অভ্যস্থ।' সাদিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল, 'খোদা হাফেজ।'

ঃ 'খোদা হাফেজ।' ধরা গলায় বলল আবুল হাসান।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ সুন্দরী তরুণীর নিস্পাপ ছবি তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

আবু আবদুল্লাহর পয়গাম মাসয়াবের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হল। চিঠি পড়া শেষ করে তিনি সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আবুল কাসেমের দূত আমার কাছে না এসে ওখানে গেল কেন? ওখানে তুমি কী জন্য গিয়েছিলে?'

ঃ 'দূত আহত ছিল। তাকে ধাওয়া করেছিল কয়েক ব্যক্তি। সে ভেবেছিল আমাদের বাড়ি তার জন্য নিরাপদ নয়। এ জন্য আমি তাকে সুলতানের মহলের পথ দেখিয়েছি। আপনি এক্ষুণি রওয়ানা করলে ভাল হয়। সাধারণ ব্যাপার হলে আপনার সাথে দেখা করার জন্য তিনি এত ব্যস্ত হতেন না।'

উৎকণ্ঠা নিয়ে মাসয়াব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একটু পর ঘোড়ায় চড়ে সুলতানের মহলের পথ ধরলেন তিনি। ঘন্টাখানেক পর দরবার কক্ষে সুলতানের সাথে তার দেখা হল।

আবুল হাসানের মুখে শোনা ঘটনা আবু আবদুল্লাহ সংক্ষেপে তাকে বললেন। কতকক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মাসয়াব। এরপর বেদনামাখা কণ্ঠে বললেনঃ 'অসম্ভব! ফার্ডিনেণ্ডের লোকেরা তাকে হত্যা করতে পারে না। আমি সংবাদদাতাকে দেখতে চাই।'

ঃ 'ও ঘুমিয়ে আছে, এ মুহূর্তে জাগানো ঠিক হবে না। আমিতো বলেছি সে আহত। তোমার সে চাকরটা সাদিয়ার সাথে ছিল। খাদে ঘোড়ার লাশও সে দেখেছে।'

ঃ 'আপনি কি মনে করেন ওটা আবুল কাসেমের ঘোড়া।' বললেন মাসয়াব।

ঃ 'যুবকের মুখে শোনা কথা মেলালে এ পরিণতিই তো বের হয়ে আসে।'

ঃ 'কিন্তু আবুল কাসেমের সাথে চারজন বিশ্বস্ত রক্ষী ছিল। তার হাতের ইশারায় ওরা জীবন দিতে পারতো। ওরা গ্রানাডার শ্রেষ্ঠ বীরদের অন্যতম।

তলোয়ার ছাড়া ওদের সাথে পিস্তলও ছিল। আবুল কাসেম খৃস্টানদের হাতে নিহত হচ্ছে আর ওরা দাঁড়িয়ে দেখছে, এ কী করে হতে পারে!'

ঃ 'প্রথমটায় আমারও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যখন ভেবেছি যুগের বিবর্তনে একান্ত বন্ধুও ধোকা দিতে পারে, তখন বিশ্বাস করেছি। তুমি ঘোড়ার লাশ দেখে নিও। এত উপর থেকে পড়ে গিয়ে হয়তো বিকৃত হয়ে গেছে, তবুও কোন না কোন চিহ্ন খুঁজে পাবে।'

একটু থেমে সুলতান আবার বললেনঃ 'তোমাকে ডেকেছি একটা পরামর্শ দেয়ার জন্য। এ পরিস্থিতিতে তোমাকে একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। খৃস্টানরা যদি আবুল কাসেমের বিশ্বস্ত সঙ্গীদের কিনে নিতে পারে, তবে তোমার চাকর-বাকরদের মধ্যে ওদের কোন গুপ্তচর থাকা অসম্ভব নয়। আবুল কাসেমের ব্যাপারে যে সংবাদ তুমি পেয়েছ, আপাততঃ কারো সামনে তা প্রকাশ করো না। ওরা নিজের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে। এ হত্যার প্রতিশোধের নামে আলফাজরার কতক নিরাপরাধ মানুষের জীবনও চলে যেতে পারে। তুমি তার হত্যার সংবাদ পেয়েছ, তোমার কোন কাজে যদি এ ব্যাপারে ওদের সামান্যতম সন্দেহ হয় তবে তোমার ঘরও নিরাপদ থাকবে না। আবুল কাসেম হয়ত তোমায় বলেছে যে, আমাকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি খুব শীঘ্র চলে যাচ্ছি। আবুল কাসেম হয়ত ভেবে দেখেনি, সে ফার্ডিনেণ্ডের শেষ খেদমত সম্পন্ন করেছে। ফলে এখন আর তার কোন প্রয়োজন নেই ফার্ডিনেণ্ডের।'

ঃ 'কিন্তু ফার্ডিনেণ্ড তার এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে হত্যা করালো, এ কী করে সম্ভব?'

ঃ 'ফার্ডিনেণ্ড হয়ত অনুভব করেছে, তার এ বন্ধু প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হুঁশিয়ার। কোনদিন সে তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তুমিও হুঁশিয়ার ব্যক্তি। ফার্ডিনেণ্ড তোমায়ও বিপজ্জনক মনে করুক তা আমি চাই না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আলফাজরার দৃশ্যমান এ শান্ত ভূমির নিচে উথাল পাথাল করছে এক বিশাল অগ্নিগিরি। একদিন অকস্মাৎ হয়তো মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে জঙ্গী কবিলাগুলো। নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে এগিয়ে যাবে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য। প্রস্তুতির জন্য ওদের সময়ের প্রয়োজন। আমি চাই না তোমার কোন তৎপরতার ছুতায় খৃস্টানরা হঠাৎ এদিকে এগিয়ে আসে।'

আবু আবদুল্লাহ গভীরভাবে মাসয়াবের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেনঃ 'আবুল কাসেমের হত্যা যদি তোমার বুকে আগুন জ্বেলে

থাকে তবে প্রতিশোধের একমাত্র পথ নীরবে সময়ের অপেক্ষা করা। ক'দিন পর আমাকে আর এখানে পাবে না। কিন্তু যারা দেশ ছেড়ে যেতে রাজি না, তুমি তো তাদের মধ্যে। শুধু বেঁচে থাকার জন্যও তোমাকে সতর্ক পা ফেলে এগুতে হবে।'

আবু আবদুল্লাহর কথায় মাসয়াব হতবাক হয়ে গেলেন। যে অস্থির চিত্ত ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো গভীরভাবে ভাবেননি সে কি না এমন বংশের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ করছে, যারা তার দুশমন! যাদের ষড়যন্ত্রে গ্রানাডায় নেমে এসেছিল ধ্বংসের তাণ্ডবতা। যে উজির এই ক'দিন আগেও ফার্ডিনেণ্ডের পক্ষ থেকে বিদায়ী শমন এনে তাঁকে বলেছিল, 'আলফাজরায় তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে।'

নিজের বিবেকের দংশনে কখনো মাসয়াব অস্থির হয়ে উঠছিল, কখনো তার মনে হতো সুলতান তার অসহায়ত্বে বিদ্রুপ করছেন।

সুলতান নীরবে মাসয়াবের চেহারার পরিবর্তন দেখছিলেন। এক সময় বললেনঃ 'মাসয়াব, এক নিষ্পাপ বালিকাকে একদিন আমার মায়ের কবরে অশ্রু ঝরাতে দেখেছিলাম। শুনেছি ও প্রায়ই ওখানে আসে। আম্মার কবরে সৌধ নির্মাণের জন্য ও নিজের হার খুলে দিয়েছিল। এরপর থেকে আমি প্রায়ই ভাবতাম, আবুল কাসেম যখন থাকবে না, আমাদের পাপের বোঝা এ নিষ্পাপ মেয়েদের জন্য কত অসহনীয় হবে! আমার ভয় ছিল, আজ তার এখানে আসাকেও তুমি ভাল চোখে দেখবে না। এ জন্য তোমার ক্রোধ কমাতেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ওর ওপর রাগ করোনি তো?'

ঃ 'না, আলীজাহ! আলফাজরায় এসে ও প্রায়ই রাণীমার স্মরণ করতো। তার কদমবুসির জন্য ওকে সুযোগ দেইনি এ জন্য আমি লজ্জিত। আমার ধারণা ছিল, আমাদের ঘরের কাউকে আপনি দেখতে চাইবেন না।'

ঃ 'আমি তোমাদের দুশমন নই মাসয়াব!'

ঃ 'আলীজাহ, অতীত ভুলের জন্য আমি অনুতপ্ত।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে মাসয়াব যখন ফিরে আসছিলেন, তার মনে হলো, তার এতদিনের পরিচিত পৃথিবীটা ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

খুব তাড়াতাড়িই আবুল হাসানের ক্ষত শুকাচ্ছিল। চার দিনেই হাঁটা-চলার উপযুক্ত হয়ে উঠল সে। সুলতানের সাথে প্রতিদিন তার দেখা হত। দু'জন একত্রে খেতেন। আলফাজরায় প্রথম দেখা হওয়ার পূর্বে এ রাজ্যহারা

বাদশাহর ব্যাপারে হাসানের ধারণা ছিল, আর সব সচেতন সাহসী যুবকের মতই। আবু আবদুল্লাহর নামের সাথে গাদ্দার, বেঈমান ইত্যাদি বিশেষণের সংযোজন সে বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছে। পরিস্থিতি বাধ্য না করলে এ ঘরে পা রাখতেও সে ঘৃণা করত। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে তার ধারণা পাল্টে যাচ্ছিল।

একদিন সে মেজবানের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার কথা চিন্তা করছিল, কিন্তু সুলতানের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছিল না। গল্প করতে করতে এক সময় কথাচ্ছলে হঠাৎ আবু আবদুল্লাহ বলে উঠলেনঃ 'হাসান, শীঘ্রই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি!'

আবুল হাসান কোন জবাব না দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সুলতান তার অবাক করা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'তুমি কি আমাদের সাথে যাবে? আমরা এখান থেকে মরক্কো হিজরত করছি।'

ঃ 'আলীজাহ, হিজরতের উদ্দেশ্যেই আমি ঘর ছেড়েছিলাম। এখনো ভাবছিলাম আপনার অনুমতি চাইব। আপনার সাথে সাগর পাড়ি দিতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। কিন্তু আমার ভয় হয়, এরপর আমাদের পথ হয়ত ভিন্ন হয়ে যাবে। আমাকে আমার আব্বার বন্ধুদের খুঁজতে হবে। হয়তো মেসোপটেমিয়া ও তিউনেসিয়ার সমুদ্র উপকূলে কাটাতে হবে অনেক দিন।'

ঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সাথে সফর করলেই বরং তোমার ভাল হবে। কিছু দিনের মধ্যেই মরক্কোর জাহাজ আসবে। জাহাজ এলে আমরা এখান থেকে রওনা করব। কিন্তু এখন কাউকে এ কথা বলা যাবে না। কারণ ফার্ডিনেণ্ডের দূতকে নিরবে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।'

ঃ 'ফার্ডিনেণ্ডের দূত?'

ঃ 'হ্যাঁ, সে আমার দেশ ছাড়ার পরোয়ানা নিয়ে এসেছিল। তুমিও তাকে দেখেছ।'

ঃ 'আমি জানি না কে সে?'

ঃ 'সে কোন সাধারণ মানুষ নয় হাসান, সে ছিল আমারই উজির।'

ঃ 'আবুল কাসেম?'

ঃ 'আমি প্রায়ই ভাবতাম, ফার্ডিনেণ্ড যখন মনে করবেন, এবার তিনি নিজেই শক্ত হাতে মুসলমানদের শাহরগ ধরতে পেরেছেন, তখন আবুল কাসেমের খেদমতের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তখন তিনি আবুল কাসেমের

দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে সময় নেবেন না। তবে এত তাড়াতাড়ি তা ঘটবে, ভাবিনি।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার শাহাদাতের কথা যাদের মনে আছে, আবুল কাসেমের পরিণামে তারা আশ্চর্য হবে না।'

নীরবে দু'জনই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আবু আবদুল্লাহ হামিদ বিন জোহরার শাহাদাতের ঘটনা জানতে চাইলেন হাসানের কাছে। হাসান সালমান ও মাসুদের কাছে শোনা ঘটনা তাকে শোনাল।

সে কাহিনী শুনে দুঃসহ বেদনার বোঝা বুকে চেপে আবু আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন পাশের কক্ষে। ভেতরে ঢুকেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। বিবেকের চাবুকের কশাঘাতে এতক্ষণের অনিরুদ্ধ কান্নারা ক্রমেই শব্দ করে বেরিয়ে আসতে চাইল। বাঁধা দিলেন না তিনি। অস্ফুট শব্দরা বিলাপে রূপান্তরিত হলো একটু পরে।

প্রেমের ভুবনে মজিল দু'জনে

কয়েক দিন পর কেল্লা থেকে বেরিয়ে এল হাসান। উপত্যকার মাঝে দেয়ালের মত উঁচু পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল সে। প্রভাত রবির ফিকে আলোয় ভরে উঠেছিল পর্বতের গা। চূড়ায় দাঁড়িয়ে সে আবুল কাসেমের কেল্লার দিকে তাকিয়েছিল। অদ্ভুত চঞ্চলতায় বার বার পায়চারী করছিল এদিক ওদিক। এরপর রাস্তা থেকে সরে এসে একটা পাথরের উপর বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

নিরাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেল তার মনের আকাশ। ভেসে এল ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। সে নিঃশব্দে কতকক্ষণ বসে রইল। তারপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাল। আনন্দের ঢেউ ছুঁয়ে গেল তার হৃদয়। সাদিয়া কাছে এসেই ঘোড়া থামাল। অবাক চোখে তাকাল হাসানের দিকে। আবুল হাসান সংকোচ ঝেড়ে এগিয়ে ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল।

ঃ 'আপনি এখানে?' সাদিয়া আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

ঃ 'জ্বী, আমি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি এদিকে

এসেছেন, আপনার পথ আটকানোর জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস আপনি অকারণে এদিকে আসেন নি।'

দৃষ্টি নত করে হাসান বললঃ 'পরশু আপনাকে সুলতানের মহল থেকে বের হতে দেখেছিলাম।'

ঃ 'খালাম্মার সাথে রাণীর কাছে গিয়েছিলাম। চাকররা বলল, আপনি শুয়ে আছেন। খালাম্মা আপনাকে দেখতে চাইছিলেন।'

ঃ 'নামাজ পড়ে একটু শুয়েছিলাম। আগের দিনও অপেক্ষা করেছি। আপনি রাগ না করলে বলতে পারি এখনও আমি আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কেন যেন মনে হল, বিদায় বেলা হয়তো আপনাকে বলে যেতে পারব না।'

উদাসীনতায় ছেয়ে গেল সাদিয়ার চেহারা। বিষণ্ন কণ্ঠে সে বললঃ 'আপনি কবে যাচ্ছেন?'

ঃ 'কালই সুলতানের কাছে অনুমতি নিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সম্ভবতঃ আরো ক'দিন থাকতে হচ্ছে। তিনি যে চলে যাচ্ছেন, আপনি তা জানেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, গ্রানাডা রওনা হবার সময় খালুজান এ কথা বলেছিলেন। খালাম্মা কিন্তু বিশ্বাস করেননি। এ জন্য তাকে বিদায় করেই রাণীর কাছে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় মন ভাল ছিল না, তাই আপনার সাথে দেখা করতে পারিনি।'

ঃ 'মাসয়াব গ্রানাডা চলে গেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। আপনার সাথে দেখা হওয়ার পরও তার বিশ্বাস হয়নি। সেদিন পাহাড়ের খাদ দেখতে গিয়েছিলেন। শিয়াল আর শকুন ঘোড়ার লাশের প্রায় সবটাই নষ্ট করে ফেলেছিল। তবুও সহিস এবং চাকররা ঘোড়ার জিন ও লাগাম দেখে চিনতে পেরেছে। আপনার সাথে দেখা করে বাড়ি গিয়ে তিনি বারবার বলেছেনঃ 'এ যুবক ভুল বলতে পারে না। ও গ্রানাডার এক শরীফ বংশের ছেলে।' এরপরও তিনি আবুল কাসেমের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বলেছেনঃ 'গ্রানাডা না গেলে আমি স্বস্তি পাব না।' এখন তিনি যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসেন এ জন্য দোয়া করুন। আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসে থাকলে এখানে থেমে গেলেন কেন? আপনার জন্য আমাদের বাড়ির ফটক তো বন্ধ ছিল না!'

ঃ 'সাদিয়া!' খানিকটা ভেবে আবুল হাসান বলল, 'কথা দিয়েছিলাম আপনাকে না বলে যাব না, শুধু এ জন্যেই এদ্দুর এসেছি। তা না হলে এ

সাহসও হতো না।'

ঃ 'আমি আজ এদিকে না এলে?'

ঃ 'কাল আবার আসতাম। আরো দু'পা এগিয়ে যেতাম হয়তো! হয়তো যাওয়ার আগ মুহূর্তে হলেও আপনাদের বাড়িতে যেতাম। আজ যে অনুভূতি আমার হৃদয়ের ভেতর তোলপাড় করছে তখন আপনার প্রিয়জনদের সামনেই হয়তো তা ভাষায় রূপ পেত। তবুও আপনাকে না বলে যেতে পারতাম না।'

নিরব হল আবুল হাসান। সাদিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের হৃদয়ের ধুকপুকানি শুনল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল ধীরে ধীরে। আবেগ মথিত কণ্ঠে বললঃ 'সেদিন আপনাকে পাহাড় থেকে নামতে দেখাটা ছিল আকস্মিক ঘটনা। আজও আকস্মিকভাবেই আমি এদিকে এসেছিলাম। কিন্তু এমন তো বারবার হয় না। বিদায়ের সময় একে অপরকে হয়তো কিছু বলার সুযোগ পাব না। হাসান, যখন আমাদের দু'জনার মাঝে থাকবে বিশাল সাগরের গভীরতা, তখনো আপনার জন্য দোয়া করব। আপনার পথ পানে তাকিয়ে থাকব জীবনভর। আবারো হয়ত দেখব পাথুরে পর্বতের গা বেয়ে নেমে আসছেন আপনি। বলুন, আমায় কি ভুলে যাবেন? সমুদ্রের ওপারে গিয়ে কি মনে করবেন যে, স্পেনে আপনার কেউ নেই?'

ওড়নার প্রান্ত দিয়ে অশ্রু মুছলো সাদিয়া। আবুল হাসানের হৃদয়ে বইছিল অচেনা এক ঝড়।

ঃ 'সাদিয়া আমি নিশ্চয়ই আসব। মন বলছে, খুব শীঘ্রই এ প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হবে। এমনও হতে পারে যে, জাহাজ থেকে লাফিয়ে এখানে ছুটে আসবো।'

কম্পিত হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে নিতে নিতে সাদিয়া বললঃ 'আমাদের ঘরের দুয়ার আপনার জন্য চিরদিন উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু আমার জন্য পরিকল্পনা পাল্টানো ঠিক হবে না আপনার। আমি সেদিনের অপেক্ষায় থাকব, যেদিন স্বাধীনতার মুখরিত শ্লোগানের মাঝে মুহাজিদদের কাফেলা ফিরে আসবে, আর সে কাফেলার নেতৃত্বে থাকবে আমার স্বপ্নের পুরুষ। আজ আমি আসি তাহলে?'

ঘোড়ায় চড়ে বসল সাদিয়া। আবুল হাসান বললঃ 'রাণীর কাছে যাবে না।'

ঃ 'অন্যদিন যাব। আপনি যে আমায় না বলে যাবেন না, এখন এ

ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত।'

ঃ 'আমিও এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে আপনার বাড়ির দরজা মাড়াতে পারব।' হেসে বলল হাসান।

ঘোড়া ছুটাল সাদিয়া। চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত হাসান তার দিকে তাকিয়ে রইল। সুলতানের মহলে ফেরার সময় তার মনে হচ্ছিল, বুকের ভেতর চেপে থাকা দুঃসহ বোঝার ভার নেমে গেছে।

কেল্লায় প্রবেশ করতেই রক্ষী প্রধানের মুখোমুখী হল হাসান। তিনি বললেনঃ 'খালি হাতে আপনার বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। সুলতান আপনার ব্যাপারে খুব চিন্তিত। এতো সময় কোথায় ছিলেন?'

ঃ 'একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

রক্ষী প্রধান হাতের ইশারায় এক সিপাইকে ডাকলেন।

ঃ 'হাসান সাহেব', তিনি বললেন, 'এর সাথে আপনাকে আস্তাবলের দারোগার কাছে যেতে হবে। আপনাকে একটা ঘোড়া দিতে সুলতান নির্দেশ পাঠিয়েছেন।'

ঃ 'এ জন্য আমি তার শোকরিয়া আদায় করছি। কিন্তু এখানে আমার ঘোড়ার দরকার কি?'

ঃ 'ঘোড়া একজন সৈনিকের প্রথম প্রয়োজন। সুলতানের মেহমান তার উপহার প্রত্যাখান করতে পারে না।'

আস্তাবলের দারোগা তাকে উন্নত জাতের ঘোড়াগুলোই দেখালেন। ধূসর রঙের একটা চমৎকার ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে হাসান দারোগার দিকে তাকাল। দারোগা বললঃ 'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল হাসান।

ঃ 'এখনি আরোহণ করতে চাইলে জিন লাগিয়ে দিই।'

ঃ 'না, এখন নয়।' ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে বলল হাসান।

ঃ 'আপনার পছন্দের প্রশংসা করছি। এ ঘোড়াটা সত্যিই অসাধারণ।'

এ কথায় মৃদু হেসে নিজের কক্ষের দিকে পা বাড়াল হাসান।

তৃতীয় দিন দুপুরে বিছানায় শুয়ে আছে আবুল হাসান। ভেজানো দরজা ঠেলে মাসয়াব ভেতরে প্রবেশ করলেন। ধড়ফড়িয়ে উঠে তার সাথে করমর্দন করে একটা চেয়ার টেনে দিল সে, আরেকটা চেয়ারে নিজে বসল। মাসয়াব বললেনঃ 'আমি গ্রানাডা গিয়েছিলাম। নতুন কিছু জানতে পারিনি।

বাসায় যায়নি আবুল কাসেম। আপনি ভুল বলছেন সন্দেহ ছিল না। তবুও মনকে ধোঁকা দিতে চাইছিলাম যে, আপনি হয়ত অন্য লোককে নিহত হতে দেখেছেন। যদিও তার ঘোড়াই তার নিহত হওয়ার বড় প্রমাণ ছিল, তবুও আমি ধারণা করেছিলাম, কোথাও বিশ্রাম করার সময় তার ঘোড়াটা হয়তো চুরি হয়ে গিয়েছিল। আবুল কাসেমের সঙ্গীরা চোরকেই হত্যা করেছে। আমার সে মিথ্যে ধারণাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল।'

ঃ 'তার সহযাত্রী কারো সাথে গ্রানাডায় আপনার দেখা হয়নি?'

ঃ 'না, তার খাস চাকরও বাসায় পৌঁছেনি। ইচ্ছে করেই গভর্ণর বা কোন সরকারী কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করিনি। আবুল কাসেমের ব্যাপারে কোন দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ পেলে আমাকেই হয়ত আটকে রাখত। এক আত্মীয়ের বাসায় লুকিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম। কয়েকজন খাস ব্যক্তি ছাড়া আমার যাবার সংবাদ কেউ জানত না। গত রাতে বাড়ি পৌঁছে আপনার কথা জিজ্ঞেস করতেই সাদিয়া বলল, আপনি এখনো যাননি। সুলতানকে সালাম করে তাই আপনার কাছে এলাম। আপনাকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।'

ঃ 'ইনশাআল্লাহ আমি কখনো অসতর্ক হব না।'

মাসয়াব বললেনঃ 'সাদিয়া বলল, আপনি নাকি সুলতানের সাথে যাচ্ছেন? সুলতান চলে গেলে আমাদের কী অবস্থা হবে জানি না, নয়তো আপনাকে থেকে যেতে বলতাম। তবে এদ্দুর বলতে পারি, কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর পর অবস্থার উন্নতি হলে আপনি যদি ফিরে আসেন তবে এখানে আমাদেরকে আপন হিসেবে পাবেন।'

ঃ 'আপনার শোকরিয়া আদায় করছি। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় একদিন না একদিন ফিরে আসব।'

ঃ 'এখনো এখানে থাকতে চাইলে আপনি বেকার থাকবেন না এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আবুল কাসেমের জমিদারী দেখাশোনার জন্য একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী প্রয়োজন। আরো ক'দিন তো এখানে আছেন, ভেবে দেখবেন আমার প্রস্তাব। এমনও তো হতে পারে, পরিস্থিতি আমাদেরকে সুলতানের সাথে হিজরত করতেই বাধ্য করবে। অতীতে আমরা যা করেছি এতে সুলতানের সহানুভূতি আশা করতে পারি না। কিন্তু আবুল কাসেমের মৃত্যু তার মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। আজো আমাকে বলেছেন, তার মৃত্যুর পর তোমরা এখানে শান্তিতে থাকতে পারবে না।

আমার সাথে চলো, মরক্কোয় তোমার সব সুবিধা-অসুবিধা আমি দেখব। রাণীও বললেন, সাদিয়ার মত মেয়ে এখানে বেশী দিন থাকতে পারবে না। কিন্তু আমার অবস্থা হচ্ছে এমন যে, স্পেন ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতেও রাজি নই আমি।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে সাদিয়া ও অন্যান্য মহিলাদেরকে কি রাণীর সাথে পাঠিয়ে দেয়া যায় না?' খানিকটা ভেবে বলল হাসান।

ঃ 'আমার স্ত্রী কোন অবস্থাতেই আমায় ছেড়ে হিজরত করবে না। সাদিয়াও বিপদের সময় প্রিয়জনদের ছেড়ে যাবার মত মেয়ে নয়।'

নিরবে পরস্পরের দিকে ওরা তাকিয়ে রইল। মাসয়াব দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেনঃ 'আমার বাড়ি বেশী দূরে নয়। আপনার যখন ইচ্ছে হয় আসবেন।'

মাসয়াব চলে গেলে হাসান নিজেকে প্রশ্ন করলঃ 'আমি কি সাদিয়াকে ছেড়ে যেতে পারব?'

অনাগত নিঃসঙ্গতার কল্পনায় কেঁপে উঠল তার অবুঝ হৃদয়।

বিশ দিন পর। উপকূলের দিকে এগিয়ে গেল সুলতানের প্রথম কাফেলা। এরা ছিল চাকর-বাকর এবং সৈনিক। স্থানীয় লোকজন জিনিসপত্র বহনের জন্য তাদের খচ্চরগুলো দিয়েছিল। পাহারার জন্য গিয়েছিল পঞ্চাশজন সশস্ত্র স্বেচ্ছাকর্মী। রাজবংশের অন্যদের সাথে সুলতান এবং রাণীর যাবার কথা দু'দিন পর। এর মধ্যেই জমিদারী দেখাশোনার জন্য গ্রানাডার গভর্ণর একজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন। তার নাম হারেস। হারেস ও তার সঙ্গী সিপাইরা সুলতানের মহলের একটু দূরে তাবু গাড়ল।

সে এসেই সুলতানের কাছে গ্রানাডার গভর্ণরের চিঠি হস্তান্তর করেছিল। তাতে লিখা ছিলঃ 'আপনার যেসব চাকর-বাকর হিজরত করবে না তারা হবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। স্থানীয় কৃষকদের হেফাজতের জিম্মা সরকারের।'

এ সংবাদ পেয়ে সুলতানের বেশ ক'জন নিজস্ব কর্মচারী খুব খুশী হল। ওরা সিদ্ধান্ত নিল, সুলতানকে জাহাজে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে ওরা।

বিদায়ের আগের দিন মাসয়াবের বাড়ি এল আবুল হাসান। কিন্তু মাসয়াব ও তার স্ত্রীর উপস্থিতির কারণে সাদিয়ার সাথে সে কোন কথা বলতে পারল না। তার প্রয়োজনও ছিল না। দু'জনেই পরস্পরের হৃদয়ের

ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল। বিদায়ের সময় সাদিয়ার খালা তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বললেনঃ 'বাবা, আল্লাহ্ তোমায় সাহায্য করুন। সাদিয়ার খালু তোমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেননি, এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন কল্যাণ রয়েছে। তবুও এ ঘর চিরদিন তোমার আপনই থাকবে।'

এতক্ষণ সাদিয়া ছিল অনেকটা সংযত। কিন্তু যখনি হাসানকে 'খোদা হাফেজ' বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল তখন তার কমনীয় চেহারা ছেয়ে গেল বিষাদের মলিনতায়। কাজল কালো ডাগর দু'টো চোখে উছলে এল অশ্রুর বান।

ফিরে এসে আবুল হাসান দারুণ অস্বস্তিতে কাটাল সারাটা প্রহর। মাগরিবের নামাজ শেষে সে কামরায় বসেছিল, এক শীর্ণকায় চাকর দরজায় মাথা গলিয়ে বললঃ 'আপনার খাবার নিয়ে আসব?'

ঃ 'হ্যাঁ, নিয়ে এসো।'

চাকরটির নাম আবু আমের। ফিরে গিয়ে খাবার নিয়ে এল সে। আবুল হাসানের সামনের টেবিলে খাবার রেখে এক পাশে সরে গিয়ে বললঃ 'আপনি চলে যাচ্ছেন এ জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।'

কথা বলার জন্য সব সময় নানান ছুঁতা খুঁজে বেড়াত আবু আমের। কিন্তু আবুল হাসান তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত।

কিছুক্ষণ নিরব থেকে আবু আমের বললঃ 'আমি কখনো মরক্কো যাইনি, শুনেছি ওখানে খুব গরম পড়ে।'

ঃ 'ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।' তার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল হাসান।

ঃ 'আমি যাব না। আপনাদেরকে বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসব। সুলতান কিছু কর্মচারীকে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। কেল্লার নতুন মুহাফেজের সাথে আমি দেখা করেছি। তিনিও বলেছেন, যারা থাকতে চায় তারা এ কেল্লাতেই থাকতে পারবে। আমার বেতন বাড়িয়ে দেবেন বলে তিনি আমায় কথাও দিয়েছেন। হারেস খুব ভাল। কিন্তু আপনার কথা আমার সব সময়ই মনে পড়বে। আপনি যদি আরো ক'দিন থাকতেন!'

খেতে খেতেই হাসান বললঃ 'তোমাকে ধন্যবাদ আবু আমের, কিন্তু আমি এখানে থাকতে আসিনি। সুলতান চলে গেলে এখানে মেহমানখানার দুয়ারও আমার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।'

ঃ 'আপনি আহত হয়ে যেদিন এখানে এসেছিলেন আমার মনে হয়েছিল কোন দুশমন আপনাকে ধাওয়া করেছে।'

ঃ 'আমার কোন দুশমন নেই। পথে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলাম।'

আরো কি বলতে চাইছিল আবু আমের। পাহারাদার ভেতরে ঢুকে আবুল হাসানকে বললঃ 'জনাব, মাসয়াব সাহেবের একজন চাকর আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে। কী এক জরুরী পয়গাম নিয়ে নাকি এসেছে সে। আপনি বললে এখানে পাঠিয়ে দিই।'

আবুল হাসানের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল।

ঃ 'তাকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।' তাড়াতাড়ি বলল সে।

পাহারাদার ফিরে গেল। আবু আমের বললঃ 'জনাব, মনে হয় মাসয়াব সাহেবের সাথে আজ আপনার দু'বার দেখা হয়েছে। ভোরে সুলতানের সাথে দেখা করে তিনি সোজা আপনার কাছে এসেছিলেন। আর দুপুরে যখন ঘোড়ায় চড়ে বাইরে গিয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম ওখানেই যাচ্ছেন।'

আবুল হাসান গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?'

আবুল হাসানের তীব্র চাহনীতে আবু আমের ভড়কে গেল। হাসিটা মুছে গেল ঠোঁট থেকে।

ঃ 'না জনাব, আমি.... আমি বলতে.....'

ঃ 'দেখো আবু আমের,' কথার মাঝখানে হাসান বলল, 'তোমাকে ভাল মানুষ মনে হয়। কিন্তু এ মুহূর্তে তোমার অবান্তর কথাবার্তা বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। নদীর ঘাট পর্যন্ত তো যাবে, তখন মন ভরে কথা বলতে পারবে। এখন বাসন-কোসন নিয়ে বিদায় হও এখান থেকে।'

ঃ 'কিন্তু আপনি তো কিছুই খাননি!'

ঃ 'আমার ক্ষুধা নেই। আমি যে মাসয়াব সাহেবের বাড়িতে খেয়ে এসেছি তা তোমায় বলিনি?'

বেরিয়ে গেল আবু আমের। মাসয়াবের কাফ্রী চাকর পাহারাদারের সাথে আসছিল। তাড়াতাড়ি পথের এক পাশে সরে আবু আমের দাঁড়িয়ে গেল। পাহারাদার চাকরকে হাসানের ঘরে রেখে যখন ফিরে আসছিল, একটু শ্লেষের হাসি হেসে বাবুর্চিখানার দিকে পা বাড়াল আবু আমের।

প্রথম দিন সাদিয়ার সাথে দেখা চাকরটা ভেতরে ঢুকল। হাসানকে সালাম করে পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে দিতে দিতে বললঃ 'সাদিয়ার খালাম্মা এটি দিয়েছেন। তিনি আমায় বলে দিয়েছেন, আপনি এবং আমি ছাড়া অন্য কেউ যেন এ চিঠির কথা জানতে না পারে।'

তাড়াতাড়ি চিঠির ভাঁজ খুলে ফেলল হাসান। আগাগোড়া দৃষ্টি বুলিয়ে পড়তে লাগলঃ 'বেটা হাসান, বিদায় বেলা যে নিষ্পাপ মেয়েটি তোমায় কিছু বলতে পারেনি, এ চিঠি তার মনের প্রতিনিধিত্ব করছে। হয়ত আমি নিজে পেটে ধরিনি, কিন্তু সাদিয়া এখনো আমার কাছে। তার কক্ষ থেকে ভেসে আসছে কান্নার মৃদু শব্দ। আমার হৃদয় মথিত করে দিচ্ছে ওই কান্নার ধ্বনি। তুমি আসার পূর্বে ও জীবন সম্পর্কে ছিল বিতৃষ্ণ। অতীত দুর্ঘটনা ওকে করে দিয়েছিল উদাসীন। অধিকাংশ সময় ও একাকী থাকত। গ্রানাডায় তার একমাত্র আকর্ষণ ছিল পিতৃপুরুষের কবরস্থানের সাথে। এখানে আসার পর ভেবেছিলাম পরিবেশের সাথে সাথে ওর ভেতর পরিবর্তন আসবে। একদিন ও চড়ে বেড়াতে চাইল। এতে আমি খুব খুশী হলাম। ফিরে এলে বুঝলাম কবরস্থান থেকে এসেছে। কে নাকি ওকে বলেছে, তারিকের সময়কার কয়েকজন শহীদের কবর রয়েছে ওখানে। রাণীমাকেও ওখানেই দাফন করা হয়েছে। সাদিয়ার পিতামাতাকে তিনি বড় স্নেহ করতেন। সেই বাহানায় ও বারবার কবরস্থানে যেত।

একদিন ও অনেক দেরী করে বাসায় ফিরল। এক আহত ব্যক্তিকে নিয়ে ও সুলতানের কাছে গিয়েছে শুনে আশ্চর্য হলাম। রাতে যখন তোমায় মৃত্যুর হাত থেকে বাচাঁনো, তোমার ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইত্যাদি ঘটনা খুলে বলছিল, তখন হৃদয়ে এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। কোন এক আগন্তুক হয়ত তার জিন্দেগীর জন্য নিয়ে এসেছে এক নতুন পয়গাম।

তোমার বীরত্ব গাঁথা বর্ণনা করে ও যেন পুলক অনুভব করছিল। তোমাকে দেখার পর মনে হয়েছিল, তোমাকে আমি আগে থেকেই চিনি। তখন বুঝেছি, সাদিয়া অযথা প্রভাবিত হয়নি। হারানো অতীতের বাস্তব উপমা হয়ে তুমি তার চোখে ধরা দিয়েছ। তুমি বদলে দিয়েছ তার ভুবন। ও তোমায় কতটা ভালবাসে আমার বলার দরকার নেই। তার হৃদয়ের অনুভূতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি বে-খবর নও।

তুমি চলে যাচ্ছ, জানি না তোমার অনুপস্থিতিতে ওকে কদ্দুর সান্ত্বনা দিতে পারব। কিন্তু তোমাকে এ আশ্বাস দিতে পারি, যখন তুমি ফিরে

আসবে, তোমাদের দু'জনার মাঝে কোন বাঁধার প্রাচীর থাকবে না। তোমার হাত ধরে আমার স্বামীকে বলতে পারব, সাদিয়ার ভবিষ্যত ছেড়ে দিচ্ছি এক বাহাদুর এবং শরীফ নওজোয়ানের হাতে। আশা করি তিনিও তাতে অমত করবেন না।

আমার চিঠির এখনই কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি চিঠি পেয়েছ, এতটুকুই আমার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট।'

চিঠি পড়া শেষ করে আবুল হাসান অনেকক্ষণ চাকরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বললঃ 'সাদিয়ার খালাম্মাকে বলবে, আমি তার চিঠি পড়েছি এবং তার শোকর গোজারী করেছি।'

রাতে শোবার আগে চিঠিটা আর একবার পড়ল হাসান। ভোরে বিছানা ছেড়েই সফরের প্রস্তুতি নিতে লাগল। তার মনে হল, সাদিয়া তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করছেঃ 'তুমি যাচ্ছ? সত্যিই কি তুমি চলে যাচ্ছ?'

সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। কেল্লার বাইরে হাজার হাজার মানুষ গ্রানাডার শেষ সুলতানকে পেশ করছিল অশ্রুর নজরানা। সুলতানের বিদায়ের সংবাদ উপকূল পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। পথে দলে দলে লোক তার অপেক্ষা করছিল। প্রতিটি মঞ্জিলেই কবিলার সর্দাররা খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। শেষ বারের মত সুলতানকে বিদায় জানাতে গ্রামের লোকেরা কাফেলার সাথে শরীক হচ্ছিল।

অশ্বারোহী বাহিনীর শেষ দলের সাথে ছিল আবুল হাসান। মানুষের ভীড়, এবড়ো থেবড়ো পথ, শ্যামল উপত্যকা সব কিছুই তার কাছে আকর্ষণহীন মনে হচ্ছিল। তার কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল সাদিয়ার মিষ্টি মধুর হাসি। প্রতিটি কদমেই ও যেন বলছিলঃ 'হাসান, আমি তোমার, তুমি আমায় ফেলে যাচ্ছ কেন?'

নিজের এ ভাবনায় কখনো সে নিজেই লজ্জা পেত। কথা জুড়ে দিত সহযাত্রীদের সাথে। কিন্তু খানিক পর আবার ডুবে যেত ভাবনার গহীনে। মন ছুটে যেত সে পৃথিবীতে, যেখানে অতীত-বর্তমানের সবগুলো পথ মিশে গেছে সাদিয়ার দরজায়।

তিন দিন পর মরক্কো থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে এক ছোট বন্দরে পৌছল কাফেলা। বন্দরের পাশে বিশাল ময়দান। পড়ন্ত বিকেলে সমবেত হাজার হাজার নারী-পুরুষ আবু আবদুল্লাহকে সংবর্ধনা জানাচ্ছিল। সাগর

পাড়ে মরক্কোর জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয় মুসলমান ছাড়াও ভীড়ের একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল একদল সশস্ত্র খৃস্টান ফৌজ। স্থানীয় কবিলার সর্দাররা কাফেলার বিশ্রামের জন্য তাবু তৈরী করেছিলেন। সুলতান ও রাণীর তাবু ছিল অনেক বড়। সবগুলো তাবুর মাঝে এটি দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল।

কাপ্তান ও অন্যান্য অফিসাররা ভীড় থেকে একটু দূরে কবিলার সর্দারদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুলতান খৃস্টান ফৌজের গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলেন। একে একে সর্দাররা এসে সুলতানের সাথে করমর্দন করল। শাহী খাদেমরা রাণীর ঘোড়ার রাশ টেনে তাবুর দিকে নিয়ে চলল।

স্থানীয় সর্দাররা সুলতানের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন। সুলতানকে দাওয়াতও দিয়েছিলেন রাতে থাকার জন্য। কিন্তু সুলতান অপারগতা প্রকাশ করে বললেনঃ 'তোমাদের এ উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

একজন প্রবীণ সর্দার বললেনঃ 'আলীজাহ, আপনাকে বাধ্য করব না। কিন্তু মালপত্র জাহাজে তুলতে অনেক সময় লাগবে। আশা করি আমাদের এখানে আজ সন্ধ্যায় খাবারের দাওয়াতে অমত করবেন না।'

ঃ 'ঠিক আছে।' একটু ভেবে বললেন আবু আবদুল্লাহ, 'তবে সন্ধ্যায় খেয়েই আমি চলে যাব।'

নারী আর শিশুরা তাবুতে চলে গেছে। সামনের খোলা মাঠে হাজার হাজার মানুষের সাথে আছরের নামায পড়লেন সুলতান আবু আবদুল্লাহ। নামায শেষে একটা প্রশস্ত তাবুতে ঢুকলেন তিনি। অশ্রুতে তার দু'টি চোখের পাতা ভিজে এল। ধরা গলায় স্ত্রীকে বললেনঃ 'বেগম, আমার জানাযায় হয়তো এত লোক জমায়েত হত না। ওরা যদি আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিত, ওরা যদি মাটি ছুঁড়ে মারত আমার মুখে, তাহলে এতটা কষ্ট হত না আমার।'

রাণীর চোখে উছলে এল অশ্রুর বন্যা। তিনি বললেনঃ 'সুলতান, আমরা মরে গেছি। মরে গেছি সেদিন, যেদিন আলহামরায় উড়েছিল দুশমনের পতাকা। কেউ কি মৃতের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়?'

ঃ 'না; না।' দু'হাতে মাথা চেপে ধরে চেয়ারে বসে পড়লেন সুলতান। 'আমার মৃত্যু হয়েছে সেদিন, যেদিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম। আমার কবর ছিল গ্রানাডার সিংহাসন। প্রজারা আমায় ক্ষমা করতে পারে,

কিন্তু বিবেক আমায় ক্ষমা করবে না। আমি সম্রাটের মুকুট পরিনি বেগম, আমার জাতির কাফন ছিঁড়ে মাথায় জড়িয়েছিলাম।'

বাইরে থেকে আবুল হাসানের কণ্ঠ ভেসে এলঃ 'আলীজাহ।'

ঃ 'কে, আবুল হাসান!' নিজকে খানিকটা সংযত করে বললেন সুলতান।

ঃ 'আলীজাহ, আমার কিছু কথা ছিল।'

ঃ 'ভেতরে এসো।'

পর্দা ঠেলে তাবুতে প্রবেশ করল আবুল হাসান। সুলতান ও রাণীর দিকে কতক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

ঃ 'কী ব্যাপার আবুল হাসান! তোমাকে উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে! নির্দ্বিধায় বলতে পার। যদি আমাদের প্রবোধ দিতে এসে থাক তাহলে এ সময় তার দরকার নেই। জাহাজে সফর করার সময় নিশ্চিন্তে তোমার সাথে আলাপ করব।'

ঃ 'জাহাঁপনা!' থেমে থেমে বলল হাসান, 'আমি হয়তো আপনার সাথে যেতে পারব না।'

ঃ 'গ্রানাডা ফিরে যেতে চাও?'

ঃ 'না, আলীজাহ।'

পকেট থেকে চিঠি বের করে সুলতানের হতে তুলে দিতে দিতে বললঃ 'এ অপরাধের জন্য আমি লজ্জিত। আপনার প্রতি অনুরোধ, আমাকে কিছু মনে করার পূর্বে চিঠিটা পড়ে নিন।'

ঃ 'এখানে এমন কী রয়েছে যা তুমি মুখে বলতে পারছ না।'

ঃ 'রওনা করার আগের রাতে সাদিয়ার খালাম্মার এ চিঠি আমি পেয়েছি।'

সুলতান চিঠিটা আগাগোড়া পড়ে রাণীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেনঃ 'সময় মতো চিঠিটা দেখালে তোমায় এ কষ্টটুকু করতে হতো না। সাদিয়াকে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতে তোমাকে কী করে বলি! মাসয়াবকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কমপক্ষে তার স্ত্রী ও সাদিয়াকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এখন তোমার কারণে হয়তো ভবিষ্যতের বিপদ থেকে সে বাঁচতে পারবে। মনে রেখ, আমরা মরক্কোতে তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

ঃ 'আলীজাহ, তারা আমার কথা শুনলে যত শীঘ্র সম্ভব ওখান থেকে

বেরিয়ে আসার চেষ্টা করব। ওখানে থাকলে যে কী মুসিবত আসতে পারে তা আমি বুঝি।'

ঃ 'রাতে একা সফর না করে স্বেচ্ছাকর্মীদের সাথে যেও। মেজবানদের বলবে, আমার জন্য তারা যে তাবু তৈরি করেছে, ওখানে তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে।'

চিঠি পড়ে রাণী তা আবুল হাসানকে ফিরিয়ে দিলেন। আঙ্গুল থেকে হীরার আংটি খুলে বললেনঃ 'হাসান, সাদিয়ার জন্য আমার এ উপহার।'

ঃ 'আপনার শোকর গোজারী করছি।'

আংটি হাতে নিল হাসান। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। হঠাৎ 'খোদা হাফেজ' বলে উল্টা পায়ে তাবু থেকে বেরিয়ে এল।

তাবু থেকে বেরিয়ে আবুল হাসান সৈকতে এসে দাঁড়াল। কল্পনায় ভর করে হারিয়ে গেল দূর অতীতে। মুজাহিদদের নৌকাগুলোকে স্পেনের উপকূলে নোঙ্গর ফেলতে দেখছিল সে।

আটশো বছরের ইতিহাস তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। সে নিজের কাছে প্রশ্ন করছিলঃ 'যে স্পেন বিজয় করেছিলেন মহাবীর তারিক, এ কি সেই স্পেন? এই কি সে মুজাহিদের দেশ- যারা ফ্রান্স পর্যন্ত ইসলামের বিজয় পতকা উড়িয়েছিলেন? এই কি সেই ভূমি- যেখানে কখনো উমাইয়া, কখনো মারাবিতিন আবার কখনো মুয়াহহিদীনদের সালতানাত প্রতিষ্ঠিত ছিল?'

অশ্রুতে ভরে গেল তার দু'টি চোখ। হঠাৎ কারো হাতের স্পর্শে চমকে উঠল আবুল হাসান। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আবু আমের মৃদু মৃদু হাসছে। আবুল হাসানকে ঘাড় ফিরাতে দেখেই সে লজ্জায় দৃষ্টি অবনত করে বললঃ 'ক্ষমা করুন। জানতাম না আপনি এতটা আত্মমগ্ন?'

বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল হাসান। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে অশ্রু মুছে শান্ত স্বরে বললঃ 'আবু আমের, আমার মন ভাল নেই। তুমি বার বার কেন আমায় বিরক্ত কর?'

ঃ 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। ভেবেছিলাম এ ভীড়ের মধ্যে আপনাকে বিদায় জানাতে পারব না। ভোরেই আমি সঙ্গীদের সাথে ফিরে যাচ্ছি।'

ঃ 'আমি জানি।'

ঃ 'আপনার মন ভুলানো আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু কিছু মনে না করলে বলব, এতটা নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। সারাটা পথ আপনাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখেছি। আপনার মুখ দেখে কিছু বলার সাহস হয়নি, কিন্তু আপনার ভেতর কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। আমি আপনার গোলাম হলেও বিদায় বেলায় নিঃসংকোচে বলতে পারি, আপনার জন্য আমার হৃদয়ে রয়েছে শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর সীমাহীন মমতা।'

তার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসান ঈষৎ নরম সুরে বললঃ 'হয়ত এই আমাদের শেষ সাক্ষাত নয়!'

ঃ 'আমার বিশ্বাস ছিল আপনি কোন দিন ফিরে আসবেন। মরক্কোয় আপনার মন বসবে না।'

আবুল হাসান বলতে চাইছিল, আমি স্পেন ছাড়ার ইচ্ছে ত্যাগ করেছি। কিন্তু আবু আমেরকে এ গোপন কথাটা বলতে মন সায় দিল না। আবু আমের তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। এরপর একটু সতর্কতার সাথে বললঃ 'মনে কিছু নেবেন না। কখনো এক টুকরো খড়ও কাজে আসে। মেয়েটা যেদিন আপনাকে নিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করেছিল সেদিনই আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝেছিলাম। তার ওপর মেহমানখানায় আপনার সাথে তার সাক্ষাত কোন মামুলী ব্যাপার ছিল না।'

আবুল হাসান ক্ষোভের সাথে বললঃ 'তার ব্যাপারে কিছু বললে আমি তোমার হাড় গুড়ো করে দেব।'

ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল আবু আমের। অসহায় দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আবুল হাসানের দিকে। অবশেষে ভয়ে ভয়ে বললঃ 'জনাব, এক নিষ্পাপ বালিকা সম্পর্কে কটূক্তি করার দুঃসাহস হতো না আমার। আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু বলতে চাইছি, আপনি ফিরে আসার নিয়তে যাচ্ছেন, আমি এ পয়গাম ওদের কাছে পৌছাব কিনা। তাকে এদ্দুর বলাই যথেষ্ট হবে যে, আপনি অশ্রুভেজা চোখে বেলাভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন।'

অনেকটা আবেগাপ্লুত হয়ে আবুল হাসান বললঃ 'আবু আমের, আমার এ অশ্রু স্পেনের জন্য। ওই বালিকাকে কোন পয়গাম পাঠানোর জন্য তোমার প্রয়োজন হবে না। আমরা একজন আরেক জনের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি। তুমি আর কিছু বলবে?'

আবুল হাসানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আবু আমের। দু'হাতে

করমর্দন করতে করতে বললঃ 'খোদা হাফেজ, আমি সব সময় আপনার জন্য দোয়া করব।'

এরপর আবু আমের দ্রুত ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

সূর্য ডুবেছে ঘন্টা খানেক পূর্বে। সাগরের পানিতে ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে মরক্কোর জাহাজ। এ জাহাজে রয়েছেন স্পেনের শেষ সুলতান। সৈকতে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁকে বিদায়দানকারী সেই সব দুর্ভাগারা, যারা দেখছিল ওদের দৃষ্টি থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া চলমান সেই জাহাজকে, যে জাহাজে করে ওদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছিলেন ওদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের প্রতীক, স্বজাতির শেষ সুলতান ।

জাহাজে ওঠার আগে সুলতান স্থানীয় সর্দারের কাছে হাসানকে নিজের পুত্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সুলতানের বিদায়ের পর আটজন সর্দার হাসানের সাথে তার তাবুতে এসে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। তাকে কিছু দিন বেড়াবার দাওয়াত করলেন প্রত্যেকেই। কিন্তু সে বললঃ 'বিশেষ এক কাজে আমি ফিরে যাচ্ছি। এক মুহূর্তও দেরী করা সম্ভব নয়। কখনো সময় পেলে অবশ্যই বেড়িয়ে যাব।'

বিদায় হবার সময় সর্দাররা হাসানের ঘোড়ার দেখাশুনা এবং চারজন সশস্ত্র যুবককে তাবুর পাহারায় রেখে গেলেন। পরদিন ভোরে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে হাসান তাবু থেকে বেরিয়ে এল। একজন চাকর ঘোড়ার লাগাম হাতে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে বসে আবু আমের কথা বলছিল তার সাথে। আবুল হাসানকে তাবু থেকে বেরোতে দেখে সালাম দিয়ে আবু আমের বললঃ 'আমার সঙ্গীরা ফিরে গেছে। আপনার ঘোড়া দেখে আমি রয়ে গেছি। আপনি ফিরে যাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।' শ্লেষের সাথে আবুল হাসান জবাব দিল।

ঃ 'আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার সঙ্গীরা বেশী দূর যায়নি। একটু তাড়াতাড়ি চললে আমরা তাদের সঙ্গী হতে পারব।'

ঃ 'জনাব' চাকরটি বলল, 'ঘোড়া প্রস্তুত। মুনিব নির্দেশ দিয়েছিলেন পরবর্তী মঞ্জিলে যেন ঘোড়ার খাদ্যের অভাব না হয়। এ জন্য আমরা থলিগুলো ঘোড়ার খাদ্যে ভরে দিয়েছি।'

ঃ 'তোমাদের মুনিবকে ধন্যবাদ।' বলে সবার সাথে মোসাফেহা করে আবুল হাসান ঘোড়ায় চড়ে বসল। আবু আমেরও চলল তার পেছনে।

ঘন্টা দুই প্রায় নিরবেই কেটে গেল। এক চড়াইতে ঘোড়ার গতি কমে এল। আবু আমের নিজের ঘোড়াটা হাসানের কাছাকাছি এনে বললঃ 'আপনি ফিরে আসায় আমি খুব খুশী হয়েছি। মাসয়াবও দারুণ সন্তুষ্ট হবেন। আমার মনে হয়, সেদিন রাতে তার চাকর এসে আপনাকে মরক্কো যেতেই বারণ করেছিল। এত বড় জায়গীর তিনি কিভাবে একা একা সামলাবেন!'

ঃ 'আমি ফিরে চলেছি, এ হয়তো তোমার দোয়ার ফল। কিন্তু তার চাকুরী করতে হবে এমন তো কথা নেই।'

ঃ 'তাহলে আমি আমার মুনিবের সাথে কথা বলি। আশা করি তিনি আপনাকে আপনার মর্যাদা অনুযায়ী একটা চাকরী দেবেন।'

ঃ 'না, ফিরে গিয়ে কি করব এখনো তার কোন ফয়সালা করিনি। তবুও আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

ঃ 'সুলতান আপনাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তার সাথে যাননি বলে তিনি রাগ করেননি তো?'

ঃ 'না।' বলেই আবুল হাসান দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

একটু পর আবু আমেরের সঙ্গীদের নাগাল পেল ওরা। কয়েক মাইল চলল এভাবে। এর মধ্যে আবু আমের তার সাথে কোন কথা বলতে পারেনি। বিকেল বেলা কাফেলা পথের এক গাঁয়ে বিশ্রামের জন্য থামল। কিন্তু আবুল হাসান না থেমে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বাধ্য হয়ে আবু আমেরকেও বিশ্রামের সিদ্ধান্ত বদলাতে হল।

আরো এক মঞ্জিল এগিয়ে এক সর্দারের বাড়িতে ওরা রাত কাটাল। ভোরে নাস্তা শেষ করেই আবার রওয়ানা করল। সামনে অত্যন্ত কষ্টকর চড়াই। শ্রান্ত ঘোড়ার গতি ধীরে ধীরে কমে আসছিল। দুপুরে বিশ্রামের জন্য ওরা এক সরাইখানায় থেমে গেল।

খেয়েদেয়ে মসজিদের পথ ধরল আবুল হাসান। নামায শেষ করে ফিরে এল সে। আবু আমের তখন নাক ডাকাচ্ছিল। সরাইখানার মালিক বললঃ 'আপনার চাকর খুব ক্লান্ত। আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি, আপনিও সামান্য বিশ্রাম করে নিন। ঘোড়ার সামনেও ঘাস পাতা ঢেলে দিয়েছি। দু'তিন ঘন্টার মধ্যেই ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। আর রাতটা এখানে কাটালে তো ভালই হয়।'

ঃ 'না, একটু বিশ্রাম করেই আবার রওনা করতে হবে।'

নিজের কক্ষে গিয়ে আবুল হাসান শুয়ে পড়ল। গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল একটু পর। প্রায় আসর নামাযের সময় সে চোখ মেলল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সরাইখানার মালিককে ঘোড়া তৈরী করার নির্দেশ দিল। তখনো নাক ডাকাচ্ছিল আবু আমের। তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে আবুল হাসান আসর পড়ার জন্য মসজিদের পথ ধরল। নামাজ শেষে হাসান যখন ফিরে এল, ঘোড়া নিয়ে আবু আমের তখন আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে। সরাইখানার মালিককে ধন্যবাদ দিয়ে তার হাতে দু'টো রৌপ্য মুদ্রা তুলে দিল আবুল হাসান। মালিক বললঃ 'এ তো অনেক। এ পয়সায় আপনারা আগামীকাল পর্যন্ত থাকতে পারেন। এখন তো সন্ধ্যা হচ্ছে প্রায়। পার্বত্য পথে রাতে সফর করাও কষ্টকর।'

ঃ 'আমিও একমত।' আবু আমের বলল। 'রাতটা এখানেই বিশ্রাম করি। ঘোড়াগুলোরও বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল আবুল হাসান। রেকাবে পা রাখতে রাখতে বললঃ 'যথেষ্ট বিশ্রাম করেছি। তোমার ইচ্ছে হলে থাকতে পার। আমি চললাম।'

ঃ 'আপনি একা যাবেন তা কি করে হয়, চলুন।'

আবু আমেরও ঘোড়ায় উঠে বসল। গাঁ থেকে বেরিয়ে তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আবুল হাসান। সন্ধ্যার আগেই এক মঞ্জিলের অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করল ওরা। রাতের আঁধারে বাধ্য হয়ে গতি কমিয়ে দিল।

ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছিল আবু আমেরের শরীর। প্রতিটি গ্রামে পৌঁছলেই সে আবুল হাসানকে বিশ্রাম করার পরামর্শ দিত। কিন্তু হাসান বলতঃ 'এই তো আর একটু এগোই।'

মাঝ রাতে ওরা এসে সুলতান আবু আবদুল্লাহর কেল্লার কাছে পৌছল। পথের বাঁকে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে আবুল হাসান বললঃ 'আফসোস, আমার জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কেল্লার ফটক খোলাতে পারলে প্রাণ ভরে বিশ্রাম করতে পারবে এবার।'

ঃ 'আমি শুধু আপনার জন্যই এ পর্যন্ত এসেছি। নয়তো আমার ছেলেমেয়েরা থাকে পেছনের গ্রামে। মাসয়াবের ওখানে না গিয়ে যদি অন্য কোথাও থাকতে চান তাহলে এখানেই সে ব্যবস্থা করতে পারি। আমার ঘর আপনার থাকার উপযুক্ত হলে ওখানেই ব্যবস্থা করতাম।'

ঃ 'ধন্যবাদ। অন্য কোথাও থাকলে তোমার ওখানেই থাকতাম। তুমি

তাহলে ছেলেমেয়ের কাছেই যাও, বাকী পথ আমি একাই যেতে পারব।'

ঃ 'রাতে মাসয়াবের লোকেরা যদি কেল্লার ফটক না খোলে তাহলে কি করবেন?'

ঃ 'আমায় নিয়ে ভেবো না তুমি। কিন্তু তোমার বন্ধুরা কোথায়? ওদের তাবু যে দেখতে পাচ্ছি না!'

ঃ 'সম্ভবতঃ কেল্লায় চলে গেছে। আমার নতুন মুনীব আপনার মত সম্মানিত লোকদের জন্য মেহমানখানার দুয়ার বন্ধ করবেন না। মন চাইলেই আসবেন আপনি। আপনি কে, আমি থাকতে আপনাকে এ পরিচয়ও দিতে হবে না। সুলতান যাকে নিজের আস্তাবলের উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপহার দিয়েছেন তিনি মাঝ রাতে এখান থেকে চলে গেছেন শুনলে আমার নতুন মুনীব হারেস মন খারাপ করবেন কি না জানি না, তবে আমার সঙ্গীরা যে আমাকে গালমন্দ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।'

ঃ 'হারেসের কাছে আমার কথা বলার দরকার কি? সঙ্গীদের বলো, তুমি চেষ্টা করেছ, আমি থাকিনি। আচ্ছা চলি, খোদা হাফেজ।'

মাসয়াবের কেল্লার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল হাসান।

ফজরের নামায পড়ে বিছানায় শুয়েছিল সাদিয়া। চোখে তন্দ্রা। সাদিয়ার খালা কক্ষে ঢুকে তার পাশে এসে বসলেন।

ঃ 'মা সাদিয়া।' তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার জন্য একটা উপহার নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'কি উপহার খালাম্মা?' সাদিয়ার নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

জবাব না দিয়ে স্নেহ ভরে তিনি তার মোলায়েম হাত টেনে নিয়ে আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে দিলেন।

ঃ 'খালাম্মা! আমার অলংকারের শখ নেই।' সে উঠে আংটি খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল।

ঃ 'বেটি, এ তো রাণীর উপহার, এর অমর্যাদা করো না।'

অবাক দৃষ্টি নিয়ে সাদিয়া কখনো আংটির দিকে আবার কখনো খালার দিকে তাকাতে লাগল। সহসা ঝাপসা হয়ে এল ওর চোখ দু'টো। কোন মতে বললঃ 'তার কাছ থেকে কিছু নেয়া ঠিক হয়নি। এত দামী আংটি রেখে গেলেন, আপনি সন্ধ্যায় বলেননি কেন?'

ঃ 'আরে, আংটি তো এইমাত্র পেলাম। এটি ফিরিয়েও দেয়া সম্ভব নয়।

এখন হয়তো জাহাজ অনেক দূরে চলে গেছে।'

ঃ 'কে এনেছে?'

তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে খালা বললেনঃ 'মা, রাণীর দূত আমার কামরায় বসে আছে। সাদিয়া রাণীর উপহার নেবে না একথা তো তাকে বলতে পারি না, তুমি নিজেই তার সাথে কথা বলে দেখ।'

ঃ 'রাণীর দূত আপনার কক্ষে? কী বলছেন খালাম্মা?'

আনন্দের অশ্রু চিকচিক করে ওঠল তার চোখে।

ঃ 'হ্যাঁ মা, হাসান ফিরে এসেছে। সুলতান এবং রাণী জাহাজে চড়ার সময় হঠাৎ তার মনে হল তোমাকে নিঃসঙ্গ রেখে ওর যাওয়া ঠিক হবে না। ও এখানে এসেছে মাঝ রাতে।'

সাদিয়া পলকহীন চোখে তার খালাম্মার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ওর চোখ ফেটে বেরিয়ে এল বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রু। খালার বুকে মুখ লুকিয়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বললঃ 'ও মাঝ রাতে এসেছে আমাকে জাগাননি কেন? এও কি সম্ভব! আপনি ঠিক বলছেন খালাম্মা?'

ঃ 'আমার বিশ্বাস ছিল ও তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। আমিও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ও যদি ফিরে আসে তবে তার হাত ধরে তোমার খালুর কাছে গিয়ে বলব, আমার নিষ্পাপ মেয়েটির ভবিষ্যত এক শরীফ নওজোয়ানের হাতে সোপর্দ করছি। আমার এ সিদ্ধান্তের সাথে তুমি কি একমত?'

এক চাকরাণী ভেতরে মাথা গলিয়ে বললঃ 'মেহমানের ঘরে মুনীব আপনাকে ডাকছেন।'

মাসয়াবের স্ত্রী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আবুল হাসান তখন আলফাজরা থেকে সাগর তীর পর্যন্ত সফর এবং সুলতানের জাহাজে চড়া পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করছিল। তার কথা শেষ হতেই মাসয়াবের স্ত্রী স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আল্লাহর শোকর, হাসান ফিরে এসেছে। রাণীকেও ধন্যবাদ, তিনি তাকে বাঁধা দেননি।'

খানিকটা ভেবে মাসয়াব বললেনঃ 'হাসান, তুমি সুলতানের কাছে আসার অনুমতি নিয়েছিলে?'

মাসয়াবের স্ত্রীর চোখে মুখে চাঞ্চল্য ফুটে উঠল। তিনি বললেনঃ 'হাসান আসার সময় রাণী সাদিয়ার জন্য নিজের আংটি খুলে দিয়েছেন, একথা ও আপনাকে এখনো বলেনি?'

একটু ভেবে নিয়ে এবার আবুল হাসানকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বেটা, বরং বলতে পার সাদিয়ার জন্য তোমার করুণা জেগেছিল। আমার স্বামী এ কথাটা না বুঝার মত অজ্ঞ নন।'

লজ্জায় আবুল হাসানের চোখ নুয়ে এল।

ঃ 'বেটা' মাসয়াব বললেন, 'আমার স্ত্রী তোমার সাথে কি কথা বলেছে জানি না। তবুও বলতে পারি, সাদিয়া ও তার খালার কোন ইচ্ছে অপূর্ণ থাকবে না।'

মাসয়াবের স্ত্রী বললেনঃ 'আবুল কাসেমের মৃত্যুতে আমরা উদাসীন, মানুষের এ অপবাদের আশঙ্কা না থাকলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাদিয়াকে ওর হাতে তুলে দিতে বলতাম।'

মাসয়াব অধীর কণ্ঠে বললেনঃ 'সাঈদা, আগে তো আমাকে কথা বলতে দেবে। তুমি কেন মনে করলে সাদিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে আমার চেয়ে তুমি বেশী ভাবো? হাসান, তোমাকে মোবারকবাদ। আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি এক কঠিন দায়িত্বের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাব।'

ঃ 'এত তাড়াতাড়ি?' স্বামীর দিকে তাকিয়ে সাঈদা বললেন।

ঃ 'আমার ভবিষ্যত অনিশ্চিত সাঈদা। যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে যাবার জন্য হাসানকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। একমাত্র স্ত্রী হিসাবেই সাদিয়াকে ওর সাথে কোথাও পাঠানো যায়।'

একটু থেমে আবার তিনি বললেনঃ 'আবুল কাসেমের হত্যার খবর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিরাপদ। হত্যাকারীকে আমরা চিনি, রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দাদের এতটুকু সন্দেহ করতে দেয়া যাবে না। সুলতানকে ধন্যবাদ, আবুল কাসেমের ব্যাপারে তিনিই আমাকে নিরব থাকতে বলেছিলেন। নয়তো আমার বোকামীর ফলে এ বাড়ি এতদিনে গোয়েন্দায় ভরে যেত। আমার উৎকণ্ঠার কারণ এবার নিশ্চয়ই বুঝেছ?'

নিঃশব্দে সময় এগিয়ে চলল। ওরা নিরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে নিরবতা ভাঙ্গল আবুল হাসানঃ 'আপনারাও আমাদের সাথে চলে গেলে ভাল হয় না?'

ঃ 'না, তবে দেখো ওর খালাম্মাকে রাজি করাতে পার কি না। অতীতের স্মৃতি জড়ানো এ ভূমি ছেড়ে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর। পরিবেশ বাধ্য করলে স্পেনের শেষ বিদায়ী কাফেলার সাথে আমি থাকব।'

অশ্রুতে সাঈদার চোখ ভিজে এল। অনিরুদ্ধ কান্নার আবেগ চেপে

তিনি বললেনঃ ‘মৃত্যুর পূর্বে আমি আপনাকে ছেড়ে যাব একথা ভাবলেন কিভাবে?’

মাসয়াব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ ‘এখনো আমি কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। সাদিয়ার ব্যাপারে আগে নিশ্চিন্ত হই, তারপর নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবা যাবে।’

হরিষে বিষাদ

পর দিন। উপত্যকার ষাটজন সম্মানিত লোককে দাওয়াত করলেন মাসয়াব। সূর্যোদয়ের কিছু পরে সবাই কেল্লার সামনে টানানো শামিয়ানার নিচে জমায়েত হলেন।

তিন বছর পর ওরা এই প্রথম দামী কার্পেটে বসার সুযোগ পেয়েছিল। বরের পোশাকে কাজী ও মাসয়াবের সামনে মাথা নিচু করে বসেছিল আবুল হাসান। সকলের দৃষ্টি ছিল তার দিকে। মাসয়াব অনেকক্ষণ কাজীর সাথে কথা বললেন। তারপর মেহমানদের দিকে ফিরে বললেনঃ ‘বন্ধুগণ, আমার ভাতিজি সাদিয়ার বিয়ের উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে এখানে আসার কষ্ট দিয়েছি।’

নিরবতা নেমে এল মাহফিলে। সকলের সম্মিলিত দৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ল আবুল হাসানের ওপর। একান্ত সাধারণ পোশাকে থাকলেও মাসয়াবের সাথে আত্মীয়তা করার যোগ্য তাকেই মনে হতো। কিন্তু এ ঘোষণা ছিল যেমনি আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। মজলিশে আলফাজরার কোন সর্দারকে না দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিশেষ করে উজির আবুল কাসেমও মজলিশে নেই।

ঃ ‘বন্ধুগণ’ আবুল হাসানকে দেখিয়ে মাসয়াব বললেন, ‘আমার ভাতিজির জীবন সঙ্গী হিসাবে এই যুবককে নির্বাচন করেছি। ও আবুল হাসান। এ বিয়ে অনুষ্ঠানে বংশের শান-শওকত রক্ষা করা হয়নি ভেবে আপনারা আশ্চর্য হচ্ছেন। কিন্তু কোন কোন দায়িত্ব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মধ্যেও পালন করতে হয়।

সুলতানের হিজরত নিঃসন্দেহে এক বড় দুর্ঘটনা। এখনো মানুষের

চোখের অশ্রু শুকায়নি। এ জন্যে বড় বড় সর্দারদেরকে দাওয়াত করতে সাহস পাইনি। আমার বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদেরকে একথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছিল। আপনারাও আমায় খারাপ ভাবতেন। হঠাৎ করে কেন আমাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হল তা আপনাদেরকে বলছি।

হাসান গ্রানাডার এক বনেদী পরিবারের ছেলে। তার পিতা ছিলেন এক বাহাদুর মুজাহিদ। পিতামাতার মৃত্যুর পর খান্দানের আর সবার সাথে হিজরতের জন্যে ও সুলতানের কাছে এসেছিল। গতবার আবুল কাসেম এসে আমায় বলেছিলেন, উপযুক্ত পাত্র পেলে সাদিয়ার বিয়ে দিয়ে দিতে। আমি সুলতানের সাথে ওর ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন শোনলাম আবুল হাসানও সুলতানের সাথে যাচ্ছে তখন নিজের ইচ্ছে পরিবর্তন করেছিলাম।

হাসানের যাবার কথা শুনে আমার স্ত্রীও আফসোস করেছিল। ছেলেটাকে মনে ধরেছিল তারও। কিন্তু সবই আল্লাহর ইচ্ছে। রাণী সাদিয়াকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। সুলতান স্নেহ করতেন হাসানকে । ফলে দু'জনেই ওকে ফেরত পাঠালেন এবং জানালেন যে, সাদিয়াকে এর সাথে বিয়ে দিলে তারা খুশী হবেন। বিয়ের পরপরই দু'জনকে মরক্কো পাঠিয়ে দিতেও তাগিদ করলেন।

আবুল কাসেম থাকলে সুলতানের নির্দেশ পালন করতে একদিনও দেরী করতেন না। তিনি যাবার সময় বলেছিলেন, 'উপযুক্ত পাত্র পেলে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করবে। অনুষ্ঠানের দু'দিন পুর্বে সংবাদ পেলেও আমি চলে আসব।' আমি গ্রানাডায় সংবাদ পাঠিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি এলে দু'তিন দিনের ভেতর বিয়ের কাজ সমাধা করব। কিন্তু তিনি গ্রানাডায় নেই, বাসার কেউ বলতে পারল না তিনি কোথায় আছেন। সম্ভবতঃ টলেডো গিয়ে থাকবেন। যাই হোক, আপনারা বুঝতে পারছেন এছাড়া আমার করার কিছু ছিল না। তবুও এলাকার সবাইকে দাওয়াত দিতে পারলাম না বলে দুঃখ থেকে গেল। কেউ যেন মনে না করেন, কাউকে ইচ্ছে করে দাওয়াত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবুল কাসেমের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, এ বিয়ের সম্মানে সমস্ত কৃষকদের আগামী এক বছরের খাজনা মওকুফ করে দেয়া হল।'

বক্তৃতা শেষ করে আবুল হাসানের হাত ধরে ভেতরে চলে গেলেন তিনি। সাথে গেলেন কাজী এবং আরো ক'জন সম্মানিত ব্যক্তি। বিয়ের

রসম পালিত হল।

খাওয়া শেষ, মেহমানরা চলে গেছেন। এক কক্ষে কনেকে ঘিরে বসে আছে ঘনিষ্ঠ মহিলারা। অন্য কক্ষে আবুল হাসানের কাছে বসেছিলেন মাসয়াব ও তার স্ত্রী। মাসয়াব তার স্ত্রীকে বললেনঃ 'হঠাৎ বিয়ের আয়োজন করলে লোকেরা কি না কী ভাবে এ জন্যে তো তুমি দারুণ পেরেশান ছিলে, হাসানকে জিজ্ঞেস করে দেখ আমি কেমন গুছিয়ে কথা বলেছি। কাজী যে এত সতর্ক তাকেও বুঝতে দেইনি যে আমি বানানো কথা বলছি। তিনিও বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই ঠিক হয়েছে।

এখন হারেসকে নিয়ে আমি উৎকণ্ঠিত। তাকে দাওয়াত দেইনি বলে নিশ্চয়ই অভিযোগ করবে। সরকারের সাথে সম্পর্কিত কোন পড়শীকে আমি নাখোশ করতে চাই না। এ জন্যেই ভেবেছি, আজ বিকেলে অথবা কাল ভোরে তার সাথে দেখা করে বলব, উজিরের অনুপস্থিতির কারণে কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে পারিনি। তিনি এলে আপনাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। তবু, আবুল হাসান ও সাদিয়াকে যে কোন মুহূর্তে সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। আজ ভোরে আমি খবর পেলাম, কৃষকরা একদল অশ্বারোহীকে শেষ রাতের দিকে এদিকে আসতে দেখেছে। ওরা কেল্লার দিকে না অন্য দিকে গেছে তা জানা যায়নি।'

ঃ 'ওরা গ্রানাডার মুহাজির হবে হয়তো!'

ঃ 'মুহাজিরের কাফেলায় অল্প ক'জন থাকে না। আর ওরা রাতে সফরও করে না। গ্রানাডার কাফেলা এদিকে আসবে আর আমি জানব না, তা কি করে হয়। শেষ রাতে সফর করার অর্থ হচ্ছে, এরা কোন অভিযানে যাচ্ছে, এ জন্যে পথে কোথাও থামেনি।'

ঃ 'আপনি অহেতুক পেরেশান হচ্ছেন। এমনও তো হতে পারে যে, ওরা গ্রানাডা থেকে না এসে কোন উপত্যকা থেকে এসেছে।'

কতক্ষণ চিন্তা করে মাসয়াব বললেনঃ 'আসলে আমি একটু সন্দেহপ্রবণ হয়ে গেছি। সব সময়ই দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে আমার মন। সে যাই হোক, ওদের দু'জনের জন্য এ জায়গা নিরাপদ নয়।'

ঃ 'আপনি এসব বাজে চিন্তা না করে পারেন না!' একু বিরক্ত হয়ে বললেন সাঈদা।

এক চাকর এসে বললঃ 'একজন লোক আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন। নাম বললেন হারেস। সাদিয়ার বিয়ে উপলক্ষে তিনি আপনাকে

মোবারকবাদ জানাতে এসেছেন। আমি তাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে এসেছি।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মাসয়াব প্রশ্ন করলেনঃ 'তিনি কি একা?'

ঃ 'না জনাব, দশ বারোজন সশস্ত্র ব্যক্তি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঃ 'সাঈদা', দাঁড়াতে দাঁড়াতে মাসয়াব বললেন, 'আমি নিচে যাচ্ছি। হয়তো এখনই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি মহিলাদের বিদায় করে সাদিয়া এবং হাসানকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বল।'

আবুল হাসান দাঁড়িয়ে বললঃ 'আমিও আপনার সাথে যাব। আমরা ওদের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে চাইছি এ কথা বুঝতে দেয়া যাবে না। এখন পালানোর চিন্তা করা অবান্তর। ওরা আমার জন্য এসে থাকলে ইতিমধ্যে পালানোর সবকটা পথ বন্ধ করে দিয়েছে। একমাত্র সাহসিকতাই আমাদের রক্ষা করতে পারে। ওদের শুধু বলবেন, কয়েক সপ্তাহ আগেও আমি আপনার অপরিচিত ছিলাম। সুলতানের কাছে এসেছিলাম গ্রানাডা থেকে। আমার সাথে আপনার সাক্ষাত এখানেই। আবুল কাসেমের ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না। তিনি কোন সংবাদও পাঠাননি। আমার উপস্থিতিতে লাভ বৈ ক্ষতি হবে না। আসুন।'

হাসান মাসয়াবের হাত ধরে টান দিল। বাধ্য হয়ে মাসয়াব তার সাথে হাঁটতে লাগলেন।

ওরা হলরুমে এসে পৌঁছল। হারেসের মেদবহুল দেহ, মাঝারি গড়ন। বয়স পঞ্চাশ হলেও চল্লিশের মতই মনে হয়, চিবুকের চামড়া ঝুরির মত ঝুলে আছে।

ঃ 'আসুন।' মাসয়াব বললেন। 'আপনাকে দাওয়াত দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমি শুধু একটা রসম পুরো করেছি। সম্মানিত কাউকেই দাওয়াত দিতে পারিনি। বিয়ের কাজটা গোপনে করা নিষেধ বলেই গ্রামের কয়েকজন কৃষককে ডেকেছিলাম। সুলতানের হিজরতের পর কোন উৎসব করলে মানুষ আমাদের কী বলবে! তবুও আবুল কাসেম এসে পৌঁছলে অবশ্যই আপনাদেরকে দাওয়াত পাঠানো হত। আমার এতিম ভাতিজির বিয়ে দিয়েছি এ যুবকের সাথে। ওর নাম আবুল হাসান।'

হারেস আবুল হাসানের সাথে করমর্দন করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বসিয়ে বললঃ 'নওজোয়ান! তোমাকে মোবারকবাদ।'

অনেকক্ষণ তার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে থেকে মাসয়াবকে লক্ষ্য করে হারেস বললঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার কিইবা করার ছিল। আপনার বংশের একটা অনাথ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে জানলে দাওয়াত ছাড়াই হাজির হতাম। আমার এক চাকরের মুখে শুনলাম আপনি নাকি এক বছরের খাজনা মওকুফ করে দিয়েছেন। ও শুনেছে এক কৃষকের কাছে। আপনাকে ধন্যবাদ যে, এমন একটা চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

মাসয়াবের দুশ্চিন্তা বহুলাংশে দূর হয়ে গেল। তবুও নিজের স্বপক্ষে সাফাই পেশ করতে গিয়ে ছোটখাট একটা গল্প বললেন। উপসংহারে বললেনঃ 'আশা করি আবুল কাসেম খুব শীঘ্রই এসে পৌঁছবেন। তখন বড় আকারে মেহমানদারীর আয়োজন করব।'

হারেস বললঃ 'কেল্লার চাকররা আমাকে বলল, হাসান নাকি আবুল কাসেমের যাবার পরদিন এখানে এসেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ!' মাসয়াব আবুল হাসানের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন।

ঃ 'তাহলে পথে নিশ্চয়ই উজিরের সাথে তার দেখা হয়েছে।' হারেস দৃষ্টি ছুঁড়ল আবুল হাসানের দিকে।

আবুল হাসান বললঃ 'পথে ক'জন লোক দেখেছি সত্য, কিন্তু আবুল কাসেম তাদের সাথে ছিলেন কি না জানি না। গ্রানাডায় তাকে এত নিকট থেকে দেখিনি যে, এক নজর দেখেই তাকে চিনতে পারব।'

ঃ 'পথের কোথাও কোন খৃস্টান বা মুসলিম অশ্বারোহী সৈনিক দেখেছ!'

ঃ 'না, পথে ঘোড়া থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে ঘোড়াটা ওখানে পাইনি। এরপর দারুণ তৃষ্ণা অনুভব করলাম। পানির খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে এক গ্রামে গেলাম। কোন অশ্বারোহী সৈনিক আমার চোখে পড়েনি।'

মাসয়াবকে লক্ষ্য করে হারেস বললঃ 'কিছু সময়ের জন্য ওকে আমার সাথে দিতে হবে। আবুল কাসেম রওয়ানা হবার পরদিন যারা এ পথে সফর করেছে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভয়ের কারণ নেই। এ পথে সেদিন নাকি কিছু খৃস্টান এবং মুসলিম সৈনিক দেখা গেছে যাদের আর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সেদিন যারা এ পথে সফর করেছে তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এ মুহূর্তে আবুল হাসানকে কষ্ট দিতে আমারও মন চাইছে না। কিন্তু গ্রানাডার গভর্ণর এ ব্যাপারে আগত অফিসারদের সহযোগিতা করার জন্য

নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আশা করি আপনিও আমার সাথে সহযোগিতা করবেন।'

মাসয়াব অসহায়ের মত হারেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু আবুল হাসান মৃদু হেসে বললঃ 'আপনি অযথা উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন। গ্রানাডার পথে খৃস্টান অশ্বারোহী না দেখা কোন অপরাধ নয়। চাকরকে বলুন আমার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করতে। দু'তিন মিনিটের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।'

ঃ 'ঘোড়া প্রস্তুত করার দরকার নেই।' হারেস বলল, 'আমার লোকেরা ঘোড়া নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ঘোড়া নিয়ে গেলে বাড়ির সবাই চিন্তা করবে। আপনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন। ভাববেন না, আপনাকে পায়দল পাঠাব না।'

ঃ 'আমিও তার সাথে যাব।' মাসয়াব বললেন।

আবুল হাসান বললঃ 'না, আপনি এখানেই থাকুন। আমরা দু'জন গেলে ওরা দুশ্চিন্তা করবে। আমার ব্যাপারে বলবেন, গ্রানাডা থেকে ক'জন লোক এসেছে, আমাকে হঠাৎ করেই তাদের সাথে একটু দেখা করতে যেতে হচ্ছে।' এরপর হারেসের দিকে ফিরে বললঃ 'আমি কয়েক মিনিটের জন্য অনুমতি চাইছি।'

ঃ 'ঠিক আছে, আমি আপনার অপেক্ষায় রইলাম। মনে রাখবেন, আপনাকে ওখানে পৌঁছানো আমার দায়িত্ব। আর আমি এক সতর্ক ব্যক্তি।'

ঃ 'আপনি ভেবেছেন একজন খৃস্টানের ভয়ে আমি পালিয়ে যাব?'

মৃদু হাসল হারেস।

ঃ 'না না, অযথা আপনি এমনটি করতে যাবেন কেন?'

হাসান কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় চলে এল আবুল হাসান। তাকে দেখেই সাদিয়া এবং তার খালা দাঁড়িয়ে গেল।

ঃ 'সাদিয়া' হাসান বলল, 'হাতে সময় খুব কম। মন দিয়ে আমার কথা শোন। তোমাকে সুলতানের এক চাকর আবু আমের সম্পর্কে বলেছিলাম, যে সাগর তীর থেকে আমার সাথে এসেছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ও হত্যাকারীদের গোয়েন্দা। খৃস্টানরা তার দেয়া সংবাদেই এখানে এসেছে। সে কেল্লায় থাকে না, থাকে পাশের গ্রামে। তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আমি হারেসের সাথে যাচ্ছি। বুঝতে পারছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওরা মনের সন্দেহ দূর করতে চাইছে। ওদের সন্তুষ্ট করে কিছুক্ষণের মধ্যেই

হয়তো আমি ফিরে আসব। এমনও হতে পারে, এই আমাদের শেষ দেখা।'

ঃ 'না, না।' এগিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই স্বামীকে জড়িয়ে ধরল সাদিয়া। 'আবুল কাসেমের হত্যাকারীরা আলফাজরায় আপনার গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না। জনগণ ওদের মাথা গুঁড়ো করে দেবে।'

সাদিয়া ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ঃ 'সাদিয়া।' ভারী হয়ে এল আবুল হাসানের কণ্ঠ, 'সাহস হারিও না। মন দিয়ে আমার কথা শোন। আবুল কাসেমের ব্যাপারে আমি কি জানি এবং তোমাদের কী বলেছি ওরা তাই জানতে চায়। ওদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে ওরা আবার এখানে আসবে। তখন কেউ বাঁচবে না। এ বাড়িকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে ওদের শুধু বলবে, আমি আহত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। ঘটনাচক্রেই তোমরা ওখানে গিয়েছিলে। আমি সুলতানের কাছে যেতে চাইলে তোমরা একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিলে। কিন্তু পথে কাউকে নিহত হতে দেখেছি একথা তোমাদের বলিনি। সাদিয়া, আমি চাই না আমার কারণে এ বাড়িতে কোন বিপদ আসুক। তোমার খালুকে আমি আবুল কাসেমের নিহত হবার সংবাদ দিয়েছি, তিনি যেন কোন অবস্থাতেই তা স্বীকার না করেন। সামান্য ভুল হলেই তিনি সন্দেহের পাত্র হবেন। ফলে একদিনও তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। মুখ খোলার জন্য তিনি যেন সময়ের অপেক্ষা করেন। আমায় ছেড়ে দেবে আমার অবস্থার উপর। আলফাজরার লোকজন আবুল কাসেমের হত্যার প্রতিশোধ নেবে অথবা আমার মত এক বিদেশীর জন্য আন্দোলন করবে, এ আশা করা যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, নিজের অস্তিত্বের জন্য হলেও একদিন এরা তরবারী কোষমুক্ত করবে। অসহায় তো কেবল দু'হাত ওপরে তুলে দোয়া করতে পারে, আমার বিশ্বাস তোমার দোয়া বিফল হবে না।

সাহস হারিও না সাদিয়া। আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব। তোমাকে পাশব শক্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। বিদায় সাদিয়া, খালাম্মা খোদা হাফেজ।'

স্ত্রীর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আবুল হাসান দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কান্নার আওয়াজের সাথে মিশে গেল সাদিয়ার 'খোদা হাফেজ' ধ্বনি। দরজায় গিয়ে চকিতে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল হাসান।

সাদিয়ার খালাম্মা নির্বাক দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক কষ্টে দরজা পর্যন্ত

টেনে নিয়ে এলেন দু'টো পা। কিন্তু আবুল হাসান ততক্ষণে চলে গেছে।

আবুল হাসান কেল্লার এক কক্ষে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দিন সুলতান আবু আবদুল্লাহ এবং রাণীর সাথে সাক্ষাত হয়েছিল এখানেই। এখন তার সামনে রয়েছে হারেস এবং ফার্ডিনেণ্ডের এক ফৌজি অফিসার ডন লুই। তার ডানে বাঁয়ে চারজন চাকর, আবু আমের এবং আটজন সশস্ত্র সৈনিক।

ডন লুইয়ের গাট্টাগোট্টা শরীর। বয়স চল্লিশের মত। ফিস ফিস করে কতক্ষণ হারেসের সাথে কথা বলে আবুল হাসানের দিকে ফিরে বললঃ 'তোমার নামই কি আবুল হাসান?'

স্পেনিশ ভাষার পরিবর্তে সে আরবীতে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তোমাকে এখানে কি জন্য ডাকা হয়েছে জান?'

ঃ 'হারেস সাহেব বলেছেন আপনাদের ক'জন লোক নাকি নিখোঁজ হয়েছে। ওদের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

খানিকটা ভেবে নিয়ে ডন লুই বললঃ 'হারেসের কাছে শুনলাম আজই তোমার বিয়ে হয়েছে। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আমার সামনে মিথ্যে বললে পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে। তোমাকে দেখে বড় শক্তপ্রাণ মনে হয়। আর আমি এমন লোকের কাছ থেকে কথা বের করতে জানি।'

ঃ 'আপনাকে তেমন কিছুই করতে হবে না।'

ঃ 'ঠিক আছে, বলতো আমার লোকদের সম্পর্কে কি জান?'

ঃ 'পথে কার্ডিজের ক'জন হত্যাকারীকে দেখেছিলাম সৈনিকের বেশে। কিন্তু আমি ভাবতেও পারি না যে, ওদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক রয়েছে।'

ঃ 'হত্যাকারীদের দেখেছ?'

ঃ 'হ্যাঁ। সংগীকে ওরা জোর করে ঘোড়া থেকে নামাচ্ছিল। আমি কাউকে নিহত হতে দেখিনি। কিন্তু হত্যাকারীদেরকে তরবারী তুলতে দেখেছি। শুনেছি নিহত ব্যক্তির হৃদয়ফাটা চিৎকার।'

চঞ্চল হয়ে ডন লুই হারেসের দিকে তাকাল। হারেস ক্রোধ বিবর্ণ চোখে আবুল হাসানের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তুমি তখন আমার সামনে যা বলেছিলে, এখনকার কথা তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত?'

ঃ 'এখন যা বলা যায় মাসয়াব খালুর সামনে তা বলা সম্ভব ছিল না।'

ঃ 'কারণ?' আবুল হাসানোর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে ডন লুই প্রশ্ন করল।

ঃ 'কারণ মাসায়াব আমার স্ত্রীর খালু। তার সামনে নিজের কাপুরুষতা স্বীকার করাটা লজ্জাজনক। এক ব্যক্তিকে নিহত হতে দেখেছি, কানে বেজেছে তার অন্তিম চিৎকার, এরপরও তার সাহায্যে না এগিয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছি, একথা তাকে বলা যায় না।

সৈনিকদের বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক ভাব দেখে আমি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলাম। একটা ছুটে যাওয়া ঘোড়া সোজা আমার দিকে আসছিল। ওটা ধরার জন্য ওরাও ধাওয়া করে সোজা ছুটে আসছিল আমার দিকে। আমি পালাতে চাইলাম। পায়ে হেঁটে পালানোর চেয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালানো অনেক বেশী নিরাপদ এবং সহজ ভেবে ঘোড়াটা আমার কাছে আসতেই এক লাফে আমি ওর লাগাম ধরে ফেললাম। আরেক লাফে ওর পিঠে চড়ে ছুটলাম প্রাণপনে। ওরা নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য আমাকে হত্যা করতে চাইল। বিলম্ব না করে ওরা ধাওয়া করল আমাকে। সারারাত আমি ছুটে বেরিয়েছি, ওরাও আমার পিছু না ছেড়ে সারারাতই আমায় ধাওয়া করেছে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, ওরা আমাকে ধরতে পারেনি। সত্যি, এটা এক অলৌকিক ব্যাপার।'

ঃ 'তুমি কি জান নিহত ব্যক্তি কে?'

ঃ 'না, তবে আমার সন্দেহ লোকটি মুসলমান। কারণ সে মুসলমানদের পোশাক পরেছিল।'

ঃ 'সন্দেহ কেন?'

ঃ 'আমাদের মাঝে অনেক দূরত্ব ছিল। পাহাড়ের ওপর থেকে তাকে ভাল করে দেখাও যাচ্ছিল না।'

ঃ 'এখানে এসে কি কাউকে এ কথা বলেছ?'

ঃ 'আমি যে একজন কাপুরুষ একথা প্রচার করার জন্য ঢাকঢোল পেটানোর কোন প্রয়োজন মনে করিনি আমি।'

ঃ 'তুমি কি মাসয়াবের ভাতিজির সাথে এখানে এসেছিলে?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমার ঘোড়াটা মারা গিয়েছিল। নিজেও ছিলাম আহত। চলতে কষ্ট হচ্ছিল। পথে একটা মেয়ে আমার প্রতি করুণা করেছে। সে যখন শুনল আমাকে কেউ ধাওয়া করছে, তখন নিজের ঘোড়ায় তুলে আমাকে সুলতানের কাছ পৌঁছে দিয়েছিল। আমি তখনও জানতাম না, সে

উজির আবুল কাসেমের আত্মীয়া।'

ঃ 'পথে কাউকে নিহত হতে দেখেছ, এ কথা তাকেও বলনি?'

ঃ 'না।'

ঃ 'কেন?'

ঃ 'কোন নারী কাপুরুষদের পছন্দ করে না। এ জন্য একজন লোককে নিহত হতে দেখেও পালিয়ে এসেছি আমি এ কথা তাকে বলতে পারিনি। বুঝতেই পারছেন, প্রথম দেখাতেই যাকে ভাল লাগে তার সামনে কেউ নিজেকে হেয় করতে চায় না।'

ঃ 'তুমি আবু আবদুল্লাহকেও এ কথা বলনি?'

ঃ 'না। আমার ভয় ছিল, খৃস্টান সিপাইদের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি এ কথা জানতে পারলে আমাকে তিনি আশ্রয় দেবেন না। তাকে শুধু বলেছি, পথে ঘোড়া থেকে পড়ে আমি আহত হয়েছি।'

কিছুটা ভেবে নিয়ে ডন লুই বললঃ 'আচ্ছা, নিহত ব্যক্তি কে ছিল তুমি বলতে পারবে?'

ঃ 'এখানে এসে শুনেছি আমি আসার আগের দিন উজির আবুল কাসেম গ্রানাডা রওয়ানা হয়েছেন। নিজস্ব চাকর বাকর ছাড়া কয়েকজন সিপাইও তার সাথে ছিল। সম্ভবতঃ আমি যে পথে এসেছি সে পথেই তিনি গিয়েছেন। আমি যাকে নিহত হতে দেখেছি সে হয়ত উজিরের সঙ্গী কেউ হবে। আর হত্যাকারীও তাদেরই কেউ। আপনারা আমার কাছে না এসে তাদের কাছে গেলেই ভাল করতেন।'

ডন লুই স্পেনিশ ভাষায় সঙ্গীদেরকে ফিস ফিস করে কী যেন বলল। এরপর আবুল হাসানকে লক্ষ্য করে বললঃ 'তাহলে তুমি স্বীকার করছ, হত্যাকারীরা তোমাকে প্রত্যক্ষদর্শী ভেবেই খতম করতে চেয়েছিল।'

ঃ 'মৃত্যুর পরোয়া না করে ওরা বিপজ্জনক পথেও যখন আমায় ধাওয়া করেছে, তখন এ ছাড়া আমি আর কি মনে করতে পারি। আমার অপরাধ, আমি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে এসেছি ঘোড়া নিয়ে।'

ঃ 'সশস্ত্র সিপাইদের আক্রমণ করতে মনে একটুও ভয় জাগল না?'

ঃ 'আমি যখন নিশ্চিত হলাম, আমাকে হত্যা না করে ওরা নিরস্ত্র হবে না, তখন এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আশপাশে কোন আদালত থাকলে সেখানে গিয়ে তাদের নামে অভিযোগ করতে পারতাম।

বলতে পারতাম, ওরা একজন মানুষকে খুন করেছে। কিন্তু তা ছিল না। এ অবস্থায় কেবলমাত্র তীর এবং ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের ব্যবহারই প্রমাণ করতে পারে যে, আমারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে।'

ঃ 'তুমি কি জান, তোমার তীরে আমাদের তিনজন সিপাই খুন হয়েছে, চারজন হয়েছে আহত? আমাদের সিপাইদের মোকাবিলা করার অপরাধে তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারি?'

ঃ 'আমি জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছি, এই শুধু আমার অপরাধ। আপনার সিপাইদের অপরাধ ওরা আমাকে হত্যা করতে চাইছিল। সন্ধির শর্ত মতে মুসলমানরা আপনাদের প্রজা। তাদের জানমালের হিফাজত করা আপনাদের কর্তব্য। আমি একা হয়েও বেঁচে গেছি, ওরা বেশী হয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এখানেই যদি আপনার আপত্তি হয় তাহলে সন্ধির শর্ত পাল্টানো দরকার।'

ডনলুই রাগতঃ স্বরে বললঃ 'একে নিয়ে আটকে রাখো। পাহারাদারদের বলবে ও পালিয়ে গেলে আমি সব বেটার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

নাংগা তলোয়ারের পাহারায় আবুল হাসান এগিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে চকিতে পেছন ফিরে চাইল সে। হারেসের চোখে মুখে কোন ভাবান্তর নেই। আবু আমের মাথা নত করে বসে আছে।

ডন লুই হারেস এবং দু'জন ফৌজি অফিসারকে ছাড়া সবাইকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। তারপর কি ভেবে হারেসকে লক্ষ্য করে বললঃ 'ওর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আমাকে জানতে হবে, ওকে শাস্তি দিলে আলফাজরায় কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে?'

ঃ 'আলফাজরার বর্তমান পরিস্থিতিতে ওকে শাস্তি দেয়ার পরামর্শ আমি দিতে পারি না। আমার ভয় হয়, এখানে বন্দী করে রাখলে কেল্লা হিফাজত করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিন্তু ওকে ছেড়ে দিতেও বলছি না আমি। ও এখানে আসার আগেই আপনার লোকেরা তাকে গ্রেফতার করতে পারলে আবুল কাসেমের হত্যার অপরাধ তার ঘাড়ে চাপানো যেত। এমনকি কেল্লার ফটকে ফাঁসিতে ঝুলালেও জনগণ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাত। কিন্তু সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন এমনটি করতে গেলে প্রশ্ন আসবে, 'আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন? অথবা এতগুলো সৈন্যের সামনে একজন তরুণ উজিরকে হত্যা করে কিভাবে বেঁচে গেল?' এ প্রশ্নের জবাব দেয়া এখন সহজ নয়।'

ডন লুইয়ের এক সঙ্গী রাগে ঠোঁট কামড়ে বললঃ 'এখন কাউকে আবুল কাসেমের হত্যাকারী চিহ্নিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা আমাদের সিপাইদের হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে চাই। ও নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে।'

ঃ 'তিনজন সিপাইয়ের হত্যাকাণ্ডে আমিও দুঃখিত। কিন্তু এখন আমরা গ্রানাডায় নই, আলফাজরায়। নিজের জীবন বাঁচাতে কোন খৃষ্টান সৈন্যের মোকাবিলা করা যাবে না, আলফাজরার কাউকে এমন কথা বুঝানো যাবে না। ওকে মাসয়াবের বাড়ী থেকে ধরে আনার জন্য আমাকে অনেক বাহানা খুঁজতে হয়েছে। বলেছি, যে ক'জন সৈন্য পাওয়া যাচ্ছে না তাদের ব্যাপারে ওকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এখন অন্য কিছু করতে গেলে মাসয়াবের মনে সন্দেহ জাগবে।'

ঃ 'তুমি কি মনে কর এই যুবকের জন্য মাসয়াব সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে?' আরেকজনের প্রশ্ন।

ঃ 'না, মাসয়াব এমন সাহস করবে না। ব্যাপারটা তার ব্যক্তিগত হলে আলফাজরায় কেউ তার পক্ষে থাকতো না। কিন্তু যে মেয়েটার সাথে এর বিয়ে হয়েছে ওকে সবাই ভালবাসে। তার পিতা ছিলেন একজন নামকরা মুজাহিদ। গ্রানাডার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে তিনি জীবন দিয়েছেন। বিয়ের দিন তার স্বামীর গ্রেফতারের খবর বনের আগুনের মত সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। শুনেছি আবুল হাসানও গ্রানাডার কোন এক ভাল বংশের ছেলে।'

ঃ 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।' ডন লুই বলল, 'আপাততঃ এখানে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা সৃষ্টি করব না। খোলা আদালতে মোকদ্দমা চালাতে এখানে আসিনি। আমাদের সামনে আজ যে জবানবন্দী ও দিয়েছে তা প্রথম এবং শেষ নয়। আমরা ওকে ছেড়ে দিতে পারি না, খতমও করতে পারি না। এখানে বন্দী রাখাও অসম্ভব। একটা পথই আমাদের সামনে খোলা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আজ রাতেই ওকে নিয়ে চলে যাব।'

চঞ্চলতা ফুটে উঠল হারেসের চোখে মুখে।

ঃ 'কিন্তু মাসয়াবকে কি জবাব দেব?'

ঃ 'সে দায়িত্ব তোমার, তাকে তুমিই আশ্বস্ত করবে।'

ঃ 'তাকে শান্ত রাখা বড় কথা নয়, বরং তার মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

যেসব লোক ঝামেলা পছন্দ করে না, মাসয়াব তেমনি একজন মানুষ। আমার মনে হয়, আবুল কাসেমকে নিজের চোখে নিহত হতে দেখলেও সে ভয়ে কিছু বলত না।'

ঃ 'তাহলে সে কি এখনো আবুল কাসেমের পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানে না?'

ঃ 'না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার এ বিশ্বাসের প্রথম কারণ এ ছেলেটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ওর কথায় বুঝতে পেরেছি, ও এসব কথা কাউকে বলেনি। মাসয়াব বা অন্য কেউ তা জানলে অবশ্যই ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করত। তা ছাড়া পরিবারের কারো মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথেই কেউ নিজের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান করে না।'

ঃ 'এমনও তো হতে পারে, সে বলেছে, আবুল কাসেমের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তাকে খোঁজা হচ্ছে। বিয়ের উদ্দেশ্য আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া।'

ঃ 'এক অপরিচিত ব্যক্তির জন্য কেউ নিজের মেয়ের ভবিষ্যত নষ্ট করতে চায় না। মাসয়াব যদি জানতো আবুল কাসেমের মাথার উপর খড়গ ঝুলছে, তবে তাকে বাড়ীর চৌহদ্দির কাছেও ঘেঁষতে দিত না ওকে। অন্যের বিপদ নিজের ঘাড়ে নেয়ার মত লোক মাসয়াব নয়। ঠিক আছে, আপনি বন্দীকে নিশ্চিন্তে নিয়ে যেতে পারেন। মাসয়াবকে শান্ত রাখার চিন্তা আমার। তাকে বলব, কয়দিন নিরব থাকাই আবুল হাসানকে মুক্ত করার একমাত্র পথ। আশা করি সে মুখ খুলবে না।'

ঃ 'কিন্তু তুমি যে বললে ওর স্ত্রীকে এখানকার সবাই ভালবাসে। ওকে নিয়ে গেলে সে তো একটা গণ্ডগোল বাঁধাতে পারে?'

ঃ 'ওকে এখানে বন্দী রাখলে অথবা আলফাজরায় কোন শাস্তি দিলে তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ও যদি দূরে থাকে এবং বুঝতে পারে যে, শুধু নিরবতাই ওর মুক্তির পথ, তাহলে কেউ টু শব্দটি করবে না। তবে মাসয়াব হঠাৎ যদি তার খোঁজে গ্রানাডা গিয়ে উপস্থিত হয় তাকে বুঝতে দেয়া যাবে না যে, ওকে শেষ করে দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'তুমি কেন ভাবলে ওকে আমি হত্যা করতে চাই। তার মত দুর্বলকে শান্ত করতে পারব না, আমি এতটা গবেট নই।'

ঃ 'আমি জানি না বন্দীর ব্যাপারে কি ফয়সালা করেছেন। আমি মনে করেছি এমন দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক শত্রুকে আপনি জীবিত রাখবেন না।'

ঃ 'জীবিত রেখে ওকে দিয়ে কি কোন ভাল কাজ করানো যায় না?

গ্রানাডার গভর্ণর শাস্তি দিতে চাইলে আমি তাকে বেলেনসিয়া পাঠিয়ে দেব। ওখানে আমার জমিতে কাজ করার জন্য এর মত স্বাস্থ্যবান চাকরের প্রয়োজন।'

হারেস কিছু বলতে চাইল। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ডন লুই আবার বললঃ 'তোমার অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই। ও এখানে কোনদিন ফিরে আসবে না। তোমার মত হুঁশিয়ার ব্যক্তি মাসয়াবকে কয়েক মাস বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখতে পারবে। যারা কওমের সাথে গাদ্দারী করতে পারে তারা মৃত্যু পর্যন্ত আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকে। আমি রাতে রওনা করব, পার্বত্য পথে আমাদের একজন পথ প্রদর্শক প্রয়োজন।'

ঃ 'আবু আমেরের চেয়ে বিশ্বস্ত এখানে কেউ নেই, ও আবু আবদুল্লাহর চাকরীও করেছে আবার আমাদের গোয়েন্দাগিরিও করেছে। এ এলাকার প্রতিটি রাস্তা ওর নখদর্পনে। তাহলে আমি সফরের ব্যবস্থা করি। তবে আমার ভয় হচ্ছে, মাসয়াব সন্ধ্যা নাগাদ না আবার এখানে এসে পড়ে। ভাবছি, আপনার সাথে আলাপ শেষ করেই আমি তার কাছে চলে যাব।'

ঃ 'ঠিক আছে, তুমি ভাল মনে করলে আমার কোন আপত্তি নেই। সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক পরই আমরা রওয়ানা করব।'

ঃ 'এটাই ভাল হবে। মাসয়াবের সাথে এক অবাঞ্ছিত সাক্ষাত থেকে আপনি বেঁচে যাবেন, আর আবুল হাসানকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল এমন সন্দেহ থেকে আমিও বেঁচে যাব। সে যদি একান্তই আমার সাথে চলে আসে তবে পাহারাদারদের কি বলতে হবে তা ওদের আমি আগেই বলে যাবো। ওরা বলবে, রাতে হঠাৎ করেই আপনি আবুল হাসানকে নিয়ে গ্রানাডায় চলে গেছেন।'

ঃ 'তুমি খুব হুঁশিয়ার ব্যক্তি। ঠিক আছে, এখন সময় নষ্ট করো না। আমার ভয় হচ্ছে, তুমি যাওয়ার আগেই না আবার মাসয়াব চলে আসে।'

দশ মিনিট পর হারেসের ঘোড়া মাসয়াবের বাড়ির দিকে ছুটল।

মনের কোণে তুষের অনল জ্বলে

বিকেলের দিকে দোতলার ছাদে উঠে এল সাদিয়া। ওর বিষণ্ন দৃষ্টি দূরের দুই উপত্যকার মাঝে পাহাড়ের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সারা দিনের ঘটনা ওর মনে হচ্ছিল স্বপ্নের মত। দুঃসহ বেদনায় ওর হৃদয় মথিত হচ্ছিল বার বার। তবুও সে ছিল নির্বাক, নিশ্চল। এতটা ধৈর্য ধরতে পারবে মাসয়াব ও তার স্ত্রী মোটেও আশা করেননি।

মাসয়াব কয়েকবারই হারেসের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাদিয়া প্রতিবার এই বলে নিষেধ করেছেঃ 'খালুজান, ওখানে যেতে হাসান নিষেধ করেছে। আপনি শুধু দোয়া করুন, আবুল কাসেমের হত্যার ব্যাপারে ওকে গ্রেফতার করে থাকলে ওখানে গিয়ে আপনি পেরেশানী ছাড়া কিছু পাবেন না।'

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যখন দিগন্ত ঢেকে যাচ্ছিল তখন মাসয়াব ও তার স্ত্রী ছাদে উঠলেন। খালা এগিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বোনঝিকে। মাসয়াব বললেনঃ 'মা, সন্ধ্যা হয়ে এল প্রায়, আমি একবার ওখান থেকে ঘুরে আসি। কমপক্ষে ওর সাথে কি ব্যবহার করা হয়েছে তা জানা দরকার।'

ঃ 'না।' চঞ্চল হয়ে উঠল সাদিয়া, 'ওখানে গিয়ে আপনি ওর কোন সাহায্য করতে পারবেন না। আবুল কাসেমকে নিহত হতে দেখাটাই ওর বড় অপরাধ নয়, ওর হাতে কয়েকজন খৃস্টান সৈন্য নিহত হয়েছে। আপনি ওর পক্ষে সাফাই পেশ করতে পারবেন না। তাছাড়া সে নিজেই আপনাকে ওখানে যেতে বারণ করেছে। সত্যিই ওর ওপর কোন বিপদ এলেও আপনি এখন তাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। সময়ের অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

মাসয়াব অসহায় দৃষ্টি মেলে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তার স্ত্রী পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'ঐ যে ওরা আসছে।'

সাদিয়ার দৃষ্টি পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল। দূরে এক অশ্বারোহীকে দেখা যাচ্ছে। অশ্রুতে ভিজে উঠল তার চোখ দু'টো। ও খালাম্মাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মাসয়াব অনিমেষ নয়নে অশ্বারোহীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে বললেনঃ 'খোদা করুন এ যেন ও হয়। কিন্তু ....একে তো হারেসের মত মনে হচ্ছে। আমি একটু নিচে যাচ্ছি।'

খালাম্মাকে ছেড়ে সহসা সাদিয়া ঘুরে দাঁড়াল। চোখের পানি মুছে তাকাল অশ্বারোহীর দিকে। হঠাৎ ওর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। চোখের সামনে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। বুকে হাত দিয়ে ও নিচে পড়ে গেল। ওর

মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। মনে হল যেন অনেক দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে মাসয়াব ও তার খালার কণ্ঠ। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারাল সাদিয়া।

জ্ঞান ফিরলে সাদিয়া দেখতে পেল ও শুয়ে আছে বিছানায়। কক্ষে মিটমিট করে জ্বলছে প্রদীপের আলো। বৃদ্ধ ডাক্তার, মাসয়াব এবং সাঈদা তার সামনে চেয়ারে বসে আছেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক চাকরাণী। জড়ানো চোখে সাদিয়া ওদের দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ কেঁপে উঠল ওর শরীর। সাদিয়া আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ডাক্তার ওর হাত ধরে নাড়ীর গতি দেখলেন। ব্যাগ থেকে একটা শিশি বের করে মাসয়াবের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'চিন্তা করবেন না, ওর অবস্থা উন্নতির দিকে। এ অষুধটা খেলেই ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।'

সাদিয়ার বন্ধ ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। কোন কথা ফুটল না মুখে। চোখ মেলে চাইল আবার। সাঈদা একটু নুয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেনঃ 'এখন কেমন লাগছে মা?'

অসহায় দৃষ্টি মেলে সাদিয়া সবার দিকে তাকাল। আচমকা ও বিছানায় উঠে বসল। পেয়ালায় ওষুধ ঢেলে ডাক্তার মাসয়াবকে বললেনঃ 'ওর সাথে এখন কথা বলা ঠিক হবে না। নিন, এই ওষুধটা খাইয়ে দিন।'

মাসয়াব কাপটা সাদিয়ার দিকে এগিয়ে ধরে বললেনঃ 'নাও মা, ওষুধটা খেয়ে নাও।'

সাদিয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলঃ 'খালুজান, হারেস এখানে এসেছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ মা, ও এসেছিল আমাকে সান্ত্বনা দিতে। এই ওষুধটা খেয়ে নাও। তুমি ভাল হয়ে গেলে আমরা নিশ্চিন্তে আলাপ করব।'

সাদিয়ার দু'চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। সে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

ঃ 'বেটি, সাহস হারিও না।' খালাম্মা বললেন।

ঃ 'খালাম্মা' অনেক কষ্টে অনিরুদ্ধ কান্না সংযত করে সাদিয়া বলল, 'আমার ঘুমের ওষুধের প্রয়োজন নেই। আর আমি জ্ঞান হারাব না। হারেস কোন দুঃসংবাদ এনে থাকলে আমায় বলতে পারেন। আর ও যদি ফিরে না গিয়ে থাকে খোদার দিকে চেয়ে একটু এখানে নিয়ে আসুন।'

ঃ 'মা, সে কখন চলে গেছে! এখন তো প্রায় মাঝ রাত।'

সাদিয়া মাসয়াবের হাত থেকে পেয়ালা নিয়ে ঔষধ খেয়ে ডাক্তারকে

বললঃ 'বলতে পারেন কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকব।'

ঃ 'বেটি, তোমার যে বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'বিশ্রাম!' ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল এক টুকরো করুণ হাসি, 'হায় ডাক্তার! আমাকে যদি চির দিনের মতো ঘুমিয়ে থাকার ঔষধ দিতে পারতেন!'

সে বালিশে মাথা রেখে মাসয়াব ও তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। কতগুলো প্রশ্ন তার মনে তোলপাড় করছিল, কিন্তু তাদের চেহারা দেখে কোন প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

মাসয়াব বললেনঃ 'মা, হারেস বলল, আবুল হাসানের কোন বিপদ নেই। খৃস্টান অফিসার ওকে বেশী সময় আটকে রাখবে না। আমি নিজেই ওখানে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল বলে আর যাইনি। আগামীকাল ভোরেই আমি যাব সেখানে। এমনও হতে পারে, আমি যাবার আগেই ও ফিরে আসবে।'

ঃ 'খালুজান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চয়ই ও ফিরে আসবে। খৃস্টানদের কয়েদখানায়ই ওর শেষ মঞ্জিল নয়। আমার জন্য ওকে ফিরে আসতেই হবে। আমার জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত, একথা তো হারেসকে বলে দেননি?'

ঃ 'বেটি! আমরা উৎকণ্ঠিত ও বঝুতে পেরেছে নিশ্চয়ই। এখানে ও থাকা অবস্থায়ও আমি দু' দু'বার তোমায় দেখতে এসেছিলাম। বিয়ের দিনই স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হতে হল এ জন্য হারেসও দুঃখিত। ও বারবার আমায় বলেছে, হাসানের কিছুই হবে না। ডন লুই শুধু তাকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। আমার বিশ্বাস হারেস ওকে সাহায্য করবে।'

ঃ 'ওকে বিশ্রাম করতে দিন।' ডাক্তার বললেন, 'এখন এর সাথে কথা বলা ঠিক না।'

মাসয়াব উঠতে উঠতে বললেনঃ 'আপনি মেহমানখানায় চলুন। আজ রাতে বাড়ি না গিয়ে এখানে থাকলেই বরং ভাল হবে।'

সাদিয়া কিছুক্ষণ খালার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে নিল। দু'জনই এক সাথে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় ডাক্তার একটু থেমে পেছন ফিরে বললেনঃ 'বেটি, ঘুমোনোর আগে কিছু খেয়ে নিও।'

ঃ 'আমার খিদে নেই।'

ঃ 'খেতে মন না চাইলে একটু দুধ খেয়ে নিও।'

ঃ 'এখন আমি কিছু খাব না।'

ডাক্তার এবং মাসয়াব চলে গেলেন। সাঈদা চাকরাণীকে বললঃ 'তুমিও বিশ্রাম করো গে।'

চাকরাণী পাশের কামরায় চলে গেল। সাদিয়া খালার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'খালাম্মা, আমি আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি। আপনিও বিশ্রাম করুন।'

ঃ 'মা, তোমার ঘুম এলেই আমি চলে যাব। আবুল হাসানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেব এ নিয়ে আমি বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আল্লাহর শোকর, তিনি তোমাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দিয়েছেন।'

ঃ 'খালাম্মা, আমি অত্যন্ত দূর্বল। আপনার চেহারায় আমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছি বলেই কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আমি আত্মপ্রবঞ্চনায় থাকতে চাই। আমি যা দেখেছি তা ছিল স্বপ্ন। কওমের তরী ডুবে গেলে সাগরে পড়া মানুষগুলো খড়কুটোর আশ্রয়ে বেশী সময় থাকতে পারে না। হাসান কোন দিন ফিরে আসবে না, হারেস এ সংবাদ নিয়ে এলে অসংকোচে আমায় বলতে পারেন। কথা দিচ্ছি, আমি কান্নাকাটি করব না।'

ঃ 'সাদিয়া, হারেস আমাদের দুশমন হলে প্রবোধ দেয়ার জন্য এখানে আসত না। আমার মনে হয় সে তোমার খালুর কাছে মিথ্যে বলেনি। ইনশাআল্লাহ হাসান খুব শীঘ্র ফিরে আসবে। তখন সব কিছুই তোমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হবে।'

সাদিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল সাঈদার দিকে। অবশেষে বললঃ 'খালাম্মা, বার বার হারেসের কথা বলবেন না। আমি তার কাছে ভাল কিছু আশা করি না। হাসানের প্রতি তার কোন সহানুভূতি থাকলেও সে হাসানের কোন সাহায্য করতে পারত না। সে যখন সুলতানের কাফেলার সাথে যাচ্ছিল, তখন তাকে ঘিরে সুন্দর স্বপ্ন রচনা করতে ভাল লাগত। কিন্তু যখন ভবিষ্যতের কল্পনা করি, শিউরে উঠি আমি। আমার জন্য দোয়া করুন খালাম্মা। ভোরের আলো ফুটলে যেন রাতের এ বিভীষিকার কথা মনে না থাকে।' পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করল সাদিয়া। অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল ওর কান্নার মৃদু শব্দ।

পরদিন ভোরে মাসয়াব হারেসের সাথে দেখা করতে গেলেন। ফিরে এলেন দু'ঘন্টা পর। এসেই সাদিয়ার কামরায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু সাদিয়া নেই, বিছানা শূন্য। স্ত্রীর কামরায় ঢুকলেন, দেখলেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সাঈদা।

ঃ 'সাঈদা।' হাত ধরে স্ত্রীকে ডেকে তুললেন মাসয়াব।

ঃ 'আপনি এসে গেছেন।' ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন সাঈদা।

ঃ 'হ্যাঁ, এসেছি, কিন্তু সাদিয়া কোথায়?'

ঃ 'কেন, ওর ঘরে নেই?'

ঃ 'না।'

দরজায় উঁকি দিয়ে চাকরাণী বললঃ 'তিনি ছাদে। এখন ভালই আছেন। আমি তাকে নাশতা খাইয়ে এসেছি।'

ঃ 'তুমি আমায় জাগাওনি কেন?' ধমকের সুরে বললেন সাঈদা।

ঃ 'আমি আপনাকে জাগাতে চাইছিলাম, আপাই নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, খালাম্মা সারা রাত জেগে ছিলেন, উনাকে ঘুমোতে দাও, আমি একটু মুক্ত বাতাসে ঘুরে আসি। আপনাদের নাশতা নিয়ে আসব?'

ঃ 'হ্যাঁ, নিয়ে এসো।'

চাকরাণী চলে যাবার পর সাঈদা কতক্ষণ নিস্পলক স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ 'ভেবেছিলাম আপনি হাসানকে সাথে নিয়ে আসবেন।'

মাসয়াব ভারাক্রান্ত মনে চেয়ারে বসে পড়লেন।

ঃ 'সাঈদা। যদি আমি ওকে নিয়ে আসতে পারতাম! ডন লুই ওকে সাথে নিয়ে গেছে। এখান থেকে রাতে হারেস বাসায় ফিরে দেখে ওরা নেই। হয়ত ওদের সন্দেহ ছিল, হারেস আমাদের পক্ষে কথা বলবে। যাবার সময় বলে গেছে, গভর্ণরের পয়গাম পেয়ে ওদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাসানকেও নিয়ে যাচ্ছে। হারেস বার বার আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আবুল হাসানের পশমও নড়বে না। ওরা আলফাজরায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে চাইবে না, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত নই। সারা পথ ভেবেছি সাদিয়াকে কি বলব। ও এত শীঘ্র সেরে উঠবে ভাবিনি। ডাক্তার বলেছিলেন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে ওর শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে।'

আলতো পায়ে সাদিয়া কক্ষে প্রবেশ করল। চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললঃ 'ঘুম ভাঙতেই আমি অনুভব করলাম হাসানের জন্য আমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। যেদিন আমার এ দুর্বল হাত দুশনের শাহরগ পর্যন্ত পৌছবে আমি সে দিনের প্রতীক্ষায় থাকব।'

বিষণ্ন কণ্ঠে মাসয়াব বললেনঃ 'মা, হারেস কথা দিয়েছে, সে হাসানকে

সাহায্য করবে। ও ফিরে না এলে আমি নিজেই গ্রানাডা যাব। আজই যেতাম, কিন্তু হারেস কদিন অপেক্ষা করতে বলল।'

ঃ 'গ্রানাডায় গিয়েও আপনি ওর কোন সাহায্য করতে পারবেন না। আমাদের জন্য হারেসের কোন আন্তরিকতা থাকলে হাসানকে গ্রেফতার করতে সশস্ত্র লোক নিয়ে সে আসতো না। দ্বিতীয়বার আপনার কাছে এসেছে আলফাজরায় ওর গ্রেফতারীর ফলে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা জানার জন্য। পরিবর্তিত পরিবেশে গাদ্দার নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু ওদের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। খালুজান, এখনি হারেসের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বলছি না। আমি জানি বর্তমানে তার সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা আপনার জন্য অশেষ বিপদ ডেকে আনবে।'

ঃ 'বেটি, ওকে মুক্ত করার জন্য আমি যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।'

ঃ 'খালুজান! যাবার সময় দুশমন সম্পর্কে ওর ভুল ধারণা ছিল না। ও জানত, খৃস্টান অফিসার কেন তাকে ডেকেছে। তার শেষ কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে। তখন তার কথাগুলো আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি কোন্ সে আবেগ তাকে জীবন মৃত্যু সম্পর্কে এত বেপরোয়া করে দিয়েছিল। এখন কোন অন্ধকার থাকলেও ওর আত্মার আর্ত চিৎকার আমি শুনতে পাব। খালুজান! ও বলেছিল, 'সাদিয়া! আমার কারণে যেন এ বাড়িতে কোন মুসীবত না আসে। খালা এবং খালুকে আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে বলবে। আমার দুঃখে ওরা যেন ভাগী হতে চেষ্টা না করেন।' আমি এ আশায় বেঁচে থাকব যে, কোনদিন হয়ত আলফাজরার ভাইয়েরা কয়েদখানার দরজা ভেঙ্গে ফেলবে, তুর্কী আর বারবারী ভাইয়েরা তারিক ও মুসার মত এসে শোনাবে মুক্তির গান। ওকে বলবে তোমার গ্রানাডার ঘর বিরাণ হয়ে গেছে, কিন্তু আলফাজরায় এখনো এমন লোক আছে যে তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

সাদিয়ার কাঁধে হাত রেখে মাসয়াব বললেনঃ 'বসো মা! তোমার সাথে কিছু কথা আছে।'

সাদিয়া চেয়ার টেনে বসল। মাসয়াব বিষণ্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'বেটি! আমরা কত অসহায়! খৃস্টানরা সন্ধির শর্ত মেনে চলবে, এই বলে আমরা নিজকে প্রবঞ্চিত করতাম। কিন্তু পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে, মুনীব আর গোলামের মধ্যকার সন্ধির শর্ত টিকে থাকে না। আবুল কাসেম নিহত, তোমার স্বামী বন্দী, এরপরও হত্যাকারীদের নাম নিতেও ভয় পাই।

এরচেয়ে অসহায়ত্ব আর কী হতে পারে। আমরা জানি, গতকালের চেয়ে আজকের পরিস্থিতি কঠিন, আজকের চেয়ে আগামীকাল হবে আরো ভয়ংকর, আরো বিপজ্জনক। তবুও এ আশায় বেঁচে আছি যে, তোমার দোয়া নিষ্ফল হবে না। একদিন হারিয়ে যাবে এ রাতের বিভীষিকা। হঠাৎ একদিন আবুল হাসান দাঁড়াবে এসে তোমার দুয়ারে। তখন মনে হবে হারিয়ে যাওয়া অতীত ছিল অন্ধকার রাতের নিছক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। আমি হয়ত সেদিন পর্যন্ত থাকব না। আর তাই তোমার প্রতি উপদেশ, আবুল হাসান এলে এক মুহূর্তও এখানে থেকো না। আমি যে ভুল করেছি তুমি যেন তা করো না। আফ্রিকা গেলেই বুঝতে পারবে, একটা কুঁড়েঘরও এখানকার অট্টালিকার চেয়ে অনেক শান্তিদায়ক। যে ঝড়ের তোড়ে আমরা গ্রানাডা ছেড়েছি, এখানে বসে বসে সে ঝড়ের অপেক্ষা করো না মা। আমরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছি, সে পাপের শাস্তি তুমি ভোগ করবে কেন?'

প্রকাশ্যে খুব মনেযোগ দিয়েই কথা শুনছিল সাদিয়া, কিন্তু তার মন ছুটে গেছে অনেক দূরে। কল্পনার পাখায় ভর করে সে ছুটে গিয়েছিল আলহামরা। আবুল হাসান কয়েদখানার কপাট ভাঙছে, তার সাথে জাহাজে সওয়ার হচ্ছে ও। কল্পনায় দেখছিল মরু সাহারার বিশাল প্রান্তর। মাঝে মাঝে খর্জুর বীথিকা।

ঃ 'বেটি!' মাসয়াব বললেন, 'কয়দিন আগেই তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি, এ ছিল আমার চরম ভুল। আবুল কাসেমের মৃত্যু সংবাদ পাবার পরও দুশমনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই ভাবিনি। আল্লাহ যদি তোমার দোয়া কবুল করেন আর আবুল হাসান ফিরে আসে, তাহলে কথা দিচ্ছি, এক লহমাও এখানে থাকব না।'

ঃ 'খালুজান, আমি আপনার হুকুম অমান্য করব না। কিন্তু কথা দিন তার আসার পূর্বে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলবেন না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার জন্য প্রতীক্ষা করব আমি। প্রতিটি ভোরেই আল্লাহর কাছে দোয়া করব, যেন সন্ধ্যার পূর্বেই সে পৌঁছে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় দেউড়ির বুরুজে জ্বালাব প্রদীপের আলো। রাতের অন্ধকারেও সে যেন পথ দেখতে পায়। যখন আমার আশার প্রদীপ নিভে যাবে, একদিনও বেঁচে থাকব না। কিন্তু আমার একীন, সে অবশ্যই আসবে।

বন্দী হবার তিন দিন পর আবুল হাসান সশস্ত্র পাহারায় গ্রানাডার ফটকে এসে দাঁড়াল। এক অশ্বারোহী এগিয়ে ডন লুইয়ের আগমন সংবাদ দিল পাহারাদারকে। খবর পেয়ে দরজা খুলে নগর কোতোয়াল এবং রক্ষী প্রধান বেরিয়ে এল। হাতের ইশারায় অভিবাদনের জবাব দিয়ে কোতোয়ালকে লক্ষ্য করে ডন লুই বললঃ 'একে কয়েদখানায় নিয়ে যাও। আমার পক্ষ থেকে জেলারকে বলবে, গ্রানাডার মুসলমান বন্দী থেকে একে যেন দূরে রাখে। এ এমন গোপন কথা জানে যা প্রকাশ পেলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হতে পারে। গভর্ণরের সাথে আলাপ করে ওর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব। হয়ত ওকে গ্রানাডা থেকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে।'

ডন লুইয়ের এ কথা না শুনলেও নিজের ভবিষ্যত কি হতে পারে সে সম্পর্কে আবুল হাসান মোটামুটি ধারণা করতে পারছিল। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে তার একটাই চিন্তা, যাদের জন্য ও সব বিপদ মুসিবত ভোগ করতে প্রস্তুত হয়েছে তারা কতটুকু নিরাপদ!

সশস্ত্র পাহারায় ওকে কয়েকখানায় নিয়ে যাওয়া হল। একটা অন্ধকার কক্ষে শুয়ে সে বর্তমান ও অতীত নিয়ে ভাবছিল। কল্পনার আকাশে বিচরণ করা ছাড়া তার আর করার কিছুই ছিল না। কল্পনার পাখায় ভর করে ও চলে যেত সেই ভুবনে, যেখানে এসে মিশেছিল সাদিয়ার দুনিয়া। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন তার মনে পালানোর ইচ্ছে জাগল। সাথে সাথে উঠে বসল সে। তার মন বলল, গ্রানাডা আমার ঘর, আমার জন্মভূমি। আমাকে আশ্রয় দেয়ার মত অসংখ্য মানুষ এখানে এখনো রয়েছে। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে একদিন নিশ্চয়ই আলফাজরা যাবার সুযোগ পাব।

আবার তার মনে অন্য ভাবনা আসতেই হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে যেতো। না, না, সাদিয়া, আলফাজরায় তোমার বাড়ীর নিরাপত্তার জন্য হলেও আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমি পালিয়ে গেলে খৃস্টানরা তোমার বাড়ীর চারপাশে পাহারা বসাবে। এরই মাঝে হয়তো তোমার বাড়ী তল্লাশীও করেছে। আমার মতই হয়তো তোমাদেরকে কোন কয়েদখানার অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে। না সাদিয়া! আমার বিপদের ভাগী তোমাদেরকে করব না। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য

করবেন। কয়েদখানার নিঃসঙ্গ মৃত্যুই যদি আমার ভাগ্যে থাকে, তাই হবে। তবুও তোমার মাথার এক একটা চুলকে আমার জীবনের চেয়ে মূল্যবান মনে করব।

হাসান আবার শুয়ে পড়ল। সাদিয়ার নাম উচ্চারণ করল বারবার। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

আরো পাঁচদিন কেটে গেছে। একদিন ভোরে জেলের দরজা খুলে গেল। পাহারাদারের সাথে ভেতরে প্রবেশ করল দুইজন গাট্টাগোট্টা লোক। ওরা আবুল হাসানের হাত পা এবং গলায় লোহার শিকল পরিয়ে দিল। একটু পর ওকে হাজির করা হল এক বিশাল কক্ষে, ডন লুই এবং জেলারের সামনে।

জেলার বললঃ 'ডন লুইয়ের সম্মানে আমরা তোমার মাথা ন্যাড়া করিনি। তিনি নিজের চাকরদের রূপ বিকৃতি পছন্দ করেন না। তার দয়ায় তুমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছ। নয়তো খৃষ্টান সৈন্য হত্যাকারী এমন একজন মুসলমানও নেই যাকে চৌরাস্তায় ফাঁসিতে ঝুলানো হয়নি।'

ডন লুই বললঃ 'তোমার যৌবনের উপর আমার করুণা এসেছে। গভর্ণরকে অনেক কষ্টে বুঝিয়েছি যে, তুমি কেবল আত্মরক্ষার জন্যই তরবারী ধরেছিলে। তিনি তোমাকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এবার বল কোন দিন পালানোর চেষ্টা করবে না।'

ঃ 'আমি পালাব না, হাত ও পায়ের বেড়ি দেখেই তো আপনার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত।'

ঃ 'এ তো কেবল সতর্কতা। গ্রানাডার বাইরে মুক্ত হয়ে হঠাৎ যদি তোমার মত বদলে যায়? আরো ক'জন বন্দীর সাথে তোমাকে আমার জায়গীরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আগামী কালের মধ্যেই জায়গীরের ম্যানেজার এসে যাবে। তোমরা পরশু এখান থেকে রওনা করবে। কাজ সন্তোষজনক হলে তোমার ওপর কঠোরতা দেখানো হবে না। তুমি পালাবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেই তোমায় শৃঙ্খল মুক্ত করা হবে। পাঁচ বছর পর্যন্ত তোমার কাজ দেখব। আমায় তুষ্ট করতে পারলে তোমাকে মুক্ত করে দেয়া হবে।'

তিনি একটু থামলেন। গভীর ভাবে আবুল হাসানের ভাবান্তর লক্ষ্য করে আবার বললেনঃ 'বিয়ের দিন স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ বলে আমার দুঃখ হচ্ছে। সুযোগ মত তাকেও তোমার কাছে নিয়ে আসব। কিন্তু

এখন বড় জোর এ সংবাদ দেয়া যায় যে, তুমি বেঁচে আছ, আর তার সাথে দ্বিতীয়বার দেখা করার জন্য বেঁচে থাকতে চাইছ।'

আবুল হাসানের মনে হল তার বুকে কে যেন জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়েছে। রাগ সামলে সে বললঃ 'আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যে মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে সে সম্ভবতঃ কোন চাকরের স্ত্রী হতে চাইবে না।'

ঃ 'সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাও বদলে যায়। তোমাদের অতীতের স্বপ্নীল স্পেনের সমাপ্তি ঘটেছে। তার ধ্বংসস্তূপের ওপর আমরা ভবিষ্যতের স্পেন তৈরী করতে চাইছি। আমার বিশ্বাস কয়েক বছর পর বুঝতে পারবে, অতীত স্পেনের সাথে তোমার কোন সম্পর্কই ছিল না। আর সে মেয়েটার অবস্থাও হবে তোমারই মত।'

আবুল হাসান অনেকক্ষণ মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জেলার বললেনঃ 'নওজোয়ান, ডনলুই তোমার জীবন রক্ষা করলেন, এজন্য তুমি সন্তুষ্ট নও?'

আবুল হাসানকে নীরব দেখে ডন লুই বললেনঃ 'আমি তার দুশমন নই এ কথা বুঝতে ওর আরো সময়ের প্রয়োজন। ওকে দু'তিন দিন আপনার কাছে রাখুন। আপনি ব্যক্তিগত ভাবে ওর যত্ন আত্তি নেবেন।'

কক্ষে ঢুকল আবু আমের। আদবের সাথে সালাম করে ডন লুইকে বললঃ 'জনাব, আমার জন্য কী হুকুম! কয়েদীকে এখানে পৌঁছে দিয়েই ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার অনুমতি পাইনি।'

ঃ 'তুমিও বেরেনসিয়া চলো। আমার এলাকা যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে ওখানেই থাকবে। পারিবারিক কাজকর্ম এবং গোলামদের দেখাশোনার জন্য আমার একজন হুঁশিয়ার লোকের প্রয়োজন।'

ঃ 'কিন্তু জনাব,' চঞ্চল হয়ে বলল আবু আমের, 'আসার সময় আমার বিবি বাচ্চার সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। মুনীবের হুকুমে আকস্মিক ভাবেই আপনাদের সাথে গ্রানাডায় চলে এসেছি।'

ঃ 'হারেসকে বলব যে আমি তোমাকে রেখে দিয়েছি। তুমি অল্প ক'দিন আমার ওখানে থাকো। যদি দেখো তোমার মুনীবের তুলনায় আমি পারিশ্রমিক বেশী দেই তাহলে সুযোগ মত ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসবে। হয়তো নতুন দুনিয়ায় আমার চাকরদের দেখাশোনার ভার তোমাকেই দেব। কয়েক বছর পর ইচ্ছে করলে অনেক সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে আসতে পারবে।'

ঃ 'আপনার নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। আবুল হাসানের সাথে

আমি বেলেনসিয়া পর্যন্ত যাব। কিন্তু কোথায় থাকব সে সিদ্ধান্ত নেব নিজের বাড়ী গিয়ে।'

ঃ 'ঠিক আছে, মাস দু'য়েকের মধ্যেই আমি ওখানে যাব। আমি গিয়েই তোমাকে বিদায় দেব। চাইলে ফিরতি পথে তোমাকে কোন জাহাজে উঠিয়ে দিতে পারব। বারনোগুাকে বলেছি তোমার যেন কোন কষ্ট না হয়। শুনেছি তুমি ভাল রাঁধতে পার। আমার স্ত্রী দক্ষিণের খাবার খুব ভালবাসে। ভাল বাবুর্চি হতে পারলে বেতনও বেশী পাবে। তোমার কাজ হবে, গোলামদের মধ্যে কেউ পালাতে চাইলে আমার ম্যানেজারকে বলে দেবে। ওখানে থাকার জন্য যদি আবুল হাসানকে রাজি করাতে পার তবে তোমাকে আমি এমন পুরস্কার দেব, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তার সাথে দেখা করার পথে তোমার কোন বিধিনিষেধ থাকবে না। তাকে দেখেই বুঝেছি, নতুন পৃথিবীর জন্য যথেষ্ট কাজে আসবে ও। তাকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব আমি তোমাকে দিচ্ছি।'

ঃ 'আপনার হুকুম তা'মীল করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

আবু আমের বেরিয়ে গেল। ডন লুই জেলারকে বললেনঃ 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওদের গাদ্দারদের দিয়েই ভাল ফল পাওয়া যায়। এ ছেলে আবু আবদুল্লাহর চাকর ছিল। করত আমাদের গোয়েন্দাগিরি। আবু আবদুল্লাহ আফ্রিকা যাবার পর এর ময়দান অনেক বড় হয়েছে। এর কারণেই আমরা আবুল হাসানকে গ্রেফতার করতে পেরেছি। মুসলমানদেরকে শান্ত রাখার জন্য এদেরকে একটু উস্কে দেয়াই যথেষ্ট। দেখো, ও আমার কাছে ক'দিন থাকলে হুকুমতের জন্য জীবন দিতে রাজী হবে।'

ডন লুইয়ের জায়গীরের ম্যানেজার আটজন কয়েদী এবং পাঁচজন সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে বেলেনসিয়া রওনা হল।

ম্যানেজার এবং আবু আমের ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। পথে দু'জনের মধ্যে আলাপ জমে উঠল। এক মুসলমানের সাথে এমন দীল খোলা আলাপ দেখে জ্বলে পুড়ে মরছিল খৃষ্টান সিপাইরা। আবুল হাসান কখনো কখনো ওদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় মুখে ফিরিয়ে নিত।

রক্ষীদের একজনের হাতে ছিল বেত। কোন ছুতা পেলেই বন্দীদের ওপর চলত শক্তি পরীক্ষা।

আবুল হাসানের বিচ্ছেদে সাদিয়ার উদাস প্রহর কাটছিল। দিনগুলো

মনে হচ্ছিল মাসের মত দীর্ঘ। প্রথম দিকে আবুল হাসানের ছবি থাকত তার দৃষ্টির সামনে। ধীরে ধীরে সময়ের কুজ্ঝটিকায় তা হারিয়ে যেতে লাগলো। তবু ও বেঁচে ছিল, চাইছিল বেঁচে থাকতে।

হারেসের ব্যাপারে তার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল। কিন্তু মাসয়াবের সামনে তা প্রকাশ করত না, বরং বলতঃ 'বর্তমানে তার সাথে ভাল ব্যবহার করা প্রয়োজন। আপনি তার অভিনয় বুঝে ফেলেছেন সে যেন কখনো তা বুঝতে না পারে।'

হারেস দু' তিনদিন পর পর এসে আবুল কাসেম এবং আবুল হাসানের প্রসঙ্গ তুলত। কথায় কথায় প্রবোধ দিত তাদের। কয়েকদিন না এলে সাদিয়া জোর করে মাসয়াবকে পাঠিয়ে দিত।

আবুল হাসানের গ্রেফতারীর কারণে মাসয়াব তাকে সন্দেহ করছে, মাসয়াবের বন্ধু সুলভ আচরণে হারেসের এ ভয় দূর হয়েছিল। কখনো আবুল কাসেমকে ঘিরে মাসয়াবের নির্লিপ্ততা তাকে শংকিত করে তুলত। কখনো নিজেই তার প্রসঙ্গ তুলে বলতঃ 'মাসয়াব, আবুল কাসেমের কোন সংবাদ পাওনি। তিনি কবে আসবেন?'

মাসয়াব প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলতেনঃ 'না তিনি তো এখনো কোন সংবাদ পাঠাননি। গ্রানাডা থাকলে নিশ্চয়ই সংবাদ পেতাম। আমার মনে হয় কোন জরুরী কাজে তাকে টলেডো ডেকে পাঠানো হয়েছে। এমনও হতে পারে, কোন জরুরী কাজ নিয়ে বাইরের কোন দেশে চলে গেছেন।'

ঃ 'হ্যাঁ ভাই। তিনি বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। গ্রানাডার গভর্ণর পর্যন্ত তার তৎপরতার খবর জানেন না। আমি প্রায়ই ভাবি, তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে এলাকার লোকজন কী ভাবছে। এমন ব্যক্তির হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া কোন মামুলি ঘটনা নয়। আবার কখনো আশংকা জাগে যে, তার তো আবার কোন বিপদ হয়নি!'

ঃ 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে তাকে কত দেশ-বিদেশ ঘুরতে হয়। নিরুদ্দেশ না হয়ে তাদের উপায় কি। তার বিপদের কথা বলছেন? তার বিপদ হবে অথচ সরকার জানবে না তা কি করে সম্ভব?'

ঃ 'এমন কিছু বিষয় থাকে যা সরকার অনেক সময় গোপন রাখে। এমনও তো হতো পারে, গ্রানাডা আর আলফাজরার মাঝে বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করেছে?'

মাসয়াবের মনে হত তার জন্য ফাঁদ তৈরি করা হচ্ছে। চটজলদি তিনি

সতর্ক হয়ে যেতেন। বলতেনঃ 'এমন কথা বলবেন না। বিদ্রোহীরা আবুল কাসেমকে হত্যা করবে আর সরকারী প্রশাসন থাকবে নির্লিপ্ত, এমনটি হতেই পারে না। আলফাজরার লোকেরা জানে আবুল কাসেমের উপর আক্রমণ হলে তারা কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।'

দু'জনের মধ্যে এমন সব কথা অনেক দিন হয়েছে। হারেস আবুল কাসেমের প্রসঙ্গ তুললেই মাসয়াবের সচেতন অনুভূতি তৎপর হয়ে উঠত। সুতরাং হারেস বুঝেই নিয়েছিল যে, মাসয়াব আবুল কাসেমের পরিণতি সম্পর্কে এখনো বেখবর।

আবুল হাসানের গ্রেফতারের দু'মাস পর মাসয়াব দ্বিতীয় বারের মত গ্রানাডা গিয়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পর ফিরে এসে হারেসকে বললেনঃ 'আবুল হাসানের কোন খোঁজ পাইনি। ডন লুই কোথায় তাও জানতে পারিনি। অনেক কষ্টে গভর্ণরের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি বললেন, ডন লুইকে পুলিশের উচ্চপদ দেয়া হয়েছে। সম্রাট, রাণী এবং অল্প কজন সরকারী কর্মকর্তা ছাড়া কেউ তার তৎপরতার খবর জানে না। এবার তিনি গ্রানাডা এলে আবুল হাসানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব। আবুল কাসেম এমনকি তার স্ত্রীকে পর্যন্ত একটা সংবাদ দেননি। তাকে নাকি কোন গোপন অভিযানে পাঠানো হয়েছে। তার স্ত্রীর অনুরোধে আমি টলেডো গিয়েছিলাম। কিন্তু সম্রাট এবং রাণী ব্যস্ততার কারণে আমার সাথে দেখা করার দরখাস্ত কবুল করেননি।'

ঃ 'আপনি আবুল কাসেম সম্পর্কে জানতে চাইছেন। দরখাস্তে কি একথা উল্লেখ করেছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, জবাব পেয়েছি আবুল কাসেমকে নিয়ে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। সে এক জরুরী কাজে বাইরে গেছে। কাজ শেষ হলেই বাড়ি ফিরে যাবে।'

হারেস অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেনঃ 'এবার তো আপনার দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া উচিত।'

ঃ 'তাকে নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই। শুধু তার স্ত্রীর মন রক্ষার্থে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আলফাজরার লোকেরা তাকে নিয়ে অনেক কথা বলছে।'

ঃ 'কি ধরণের কথা?'

ঃ 'এই ধরুন, তিনি কোথায়? কোন সংবাদ পাঠাচ্ছেন না কেন? তিনি

যে গ্রানাডায় নেই এখানকার লোকেরা তা জেনেছে।'

ঃ 'আপনি বলবেন, এটা খুবই গোপনীয় ব্যাপার। তিনি এলে সব জানতে পারবে। আচ্ছা, লোকজন আবুল হাসানের ব্যাপারে আপনাকে পেরেশান করে না?'

ঃ 'সাদিয়া ও তার খালাম্মার অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। কোন ভাল সংবাদ হলে আপনি বলেই দিতেন, এজন্য আপনাকেও তার কথা জিজ্ঞেস করিনি। আমাদের মত আপনিও জানেন না ও কোন কয়েদখানায় আছে অথবা তাকে হত্যা করা হয়েছে কি না।'

ঃ 'আমি তো আগেই বলেছি, ডন লুই তার সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার তাকে কতটুকু নিরপরাধ মনে করে তার ওপর তার মুক্তি নির্ভরশীল।'

ঃ 'আপনি তো গ্রানাডার প্রতিটি কয়েদখানায় যেতে পারেন। আমরা শুধু জানতে চাই, ও কী অবস্থায় আছে।'

ঃ 'আপনি তো গ্রানাডা ঘুরে এসেছেন। বুঝতেই পারছেন কাজটা এত সহজ নয়। আমার মনে হয় বিপজ্জনক কয়েদী ভেবে গভর্ণর ওকে গ্রানাডার বাইরে কোন কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। হয়ত ডন লুই তার অবস্থা সম্পর্কে জানেন না। সে যাই হোক, যথাসম্ভব নিজকে বাঁচিয়ে আমি তাকে খুঁজব।'

রোদে কম্বল পেতে আবু আমেরের স্ত্রী রেশমী কাপড়ে ফুল তুলছিল। পাশে শুয়েছিল তার দু' বছরের সন্তান। মহিলার নাম আম্মারা। পাহাড়ি লোকদের মত ভরাট, সুন্দর ও সুগঠিত তার স্বাস্থ্য। হঠাৎ গাঁয়ের একটা মেয়ে আম্মারার এক সন্তানকে কোলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এল। আম্মারার কাছে এসে বললঃ 'খালাম্মা, একজন মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন। দেখতে খুব সুন্দরী। আগে কখনো তাকে এ গাঁয়ে দেখিনি। সম্ভবতঃ কোন উঁচু ঘরের হবে।'

ঃ 'বেটি, ঐ মোড়াটা এখানে নিয়ে এসো।' আম্মারা বলল।

মেয়েটি কোলের শিশুটিকে মাটিতে রেখে মোড়া নিয়ে এল। গেটের কড়া নেড়ে কে যেন বললঃ ' বোন আম্মারা, ভিতরে আসতে পারি?'

খালি পায়েই দরজার দিকে ছুটে গেল আম্মারা। দরজা খুলে অপরিচিতা মহিলাকে ভেতরে নিয়ে এল।

তাকে মোড়ায় বসিয়ে নিজে কম্বলের ওপর বসল আম্মারা। আগন্তুক

মেয়েটি বললঃ 'আমি একান্তে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।'

আম্মারা প্রতিবেশী বালিকার দিকে চাইতেই ও বেরিয়ে গেল। গেট বন্ধ করে ফিরে এসে আম্মারা বললঃ 'এবার নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

বোরকার নেকাব ঈষৎ ফাঁক করে আগন্তুক বললঃ 'আমার নাম সাদিয়া। মাসয়াব আমার খালু। আমার স্বামী আবু আমেরের বন্ধু। কথায় কথায় নিশ্চয় তোমার কাছে আবুল হাসানের নাম উল্লেখ করে থাকবে।'

ঃ 'এ নামতো কখনো শুনিনি। এমনিতেই তিনি নিজের দোস্ত দুশমনের কথা আমাকে বলেন না।'

একটু বিরতি নিয়ে সাদিয়া বললঃ 'বিয়ের দিনই আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। হারেস তাকে গ্রেফতার করে কেল্লায় নিয়ে এসেছিল। পরে খৃস্টান অফিসার ওকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি আবু আমেরের খোঁজে এক চাকরকে পাঠিয়েছিলাম। সেও নিখোঁজ। প্রতি সপ্তাহে আবু আমেরের খোঁজে চাকরকে পাঠাতাম। শুনেছি সে ফিরে এসেছে। আপনার কাছে এসেছি তিনি হয়ত আবুল হাসানের সংবাদ বলতে পারবেন।'

আম্মারা গভীর চোখে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বললঃ 'দেখুন আপনি এ বাড়িতে আসা কোন ছোটখাট ঘটনা নয়। আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু আমার মনে হয় কোন গোপন কথা হলে ও আমাকে তা বলবে না। এসব ব্যাপারে সে অত্যন্ত কঠোর। আমার সব ইচ্ছা পূরণ করে কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, কবে আসবে এ ধরণের প্রশ্নের কোন জবাব সে দেয় না। এবার আসার সময় আমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে এসেছে। বাচ্চাদের জন্য এনেছে রেশমী কাপড়। কিন্তু এ ছ'সাত মাস কোথায় কোথায় ঢু মেরেছে তার কিচ্ছু বলেনি। কিন্তু আপনার সমস্যা আলাদা। একজন নারী হিসাবে আপনার সমস্যা ও কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। কথা দিচ্ছি, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনার স্বামীর কোন খোঁজ পেলে আপনাকে জানাব।'

ঃ 'তোমার অনুমতি পেলে আমার চাকর মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ নিয়ে যাবে। কিন্তু আবুল হাসানের জন্য আমি উৎকণ্ঠিত গাঁয়ের লোকেরা যেন তা বুঝতে না পারে।'

ঃ 'এর সাথে গ্রামের লোকদের কি সম্পর্ক?'

ঃ 'তোমার স্বামী যদি মনে করেন, হাসানের অবস্থানের কথা বললে

তার ক্ষতি হতে পারে, তবে আমি তোমায়ও বাধ্য করব না। আমি.... আমি শুধু জানতে চাই ও বেঁচে আছে অথবা........'

ভারী হয়ে এল তার কণ্ঠ। চোখ দু'টো অশ্রুতে টলমল করছে।

আম্মারা আকুল কণ্ঠে বললঃ 'বোন আমার! আমার বিশ্বাস, তার কাছ থেকে এ কথা বের করতে পারব আমি। কিছু জানতে পারলে নিজেই তোমার কাছে চলে যাব।'

ঃ 'তুমি কি গ্রানাডা থেকে হিজরত করে এখানে এসেছ?'

ঃ 'না, এখানেই আমার জন্ম। এ বাড়ি ছিল আমার বাপের। আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি গ্রানাডায় সম্রাটের চাকর ছিল। আমার স্বামীও তার সাথে কাজ করত। আসলে তার জন্যেই বিয়েটা হয়েছে।'

সাদিয়া আম্মারার সন্তানদের কোলে তুলে নিল। প্রত্যেকের হাতে এক একটা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বললঃ 'আমি যাচ্ছি। দেখো আমার ওপর তোমার স্বামীর যেন কোন সন্দেহ না হয়। তুমি যে কোন সময় আমাদের বাড়িতে আসতে পার।'

তিন দিন পর আম্মারা তাদের বাড়ি এল। বললঃ 'আবু আমের আপনার স্বামীকে শেষ যখন দেখেছিল তখন তিনি সুস্থ। এখন কোথায় আছে তার জানা নেই। তার ধারণা, ডন লুই তাকে গ্রানাডা থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

দিনের পর মাস, মাসের পর বছর গড়িয়ে যেতে লাগল। গ্রানাডা থেকে আসতে লাগল ভয়ংকর সব দুঃসংবাদ। মাসয়াব এবং তার স্ত্রী কয়েক বার হিজরত করতে চাইল। কিন্তু প্রতি বার সাদিয়া বলতঃ 'আপনারা যান, আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করব।'

অবস্থা দৃষ্টে মনে হতো সাদিয়া আশ্রয়হীন। কিন্তু যখন ও দোয়ার জন্য হাত তুলত, তার মনে হত সে একা নয়।

ইনকুইজিশন

স্পেনের গীর্জার উপর কোন বই লিখতে গেলে ইনকুইজিশনের প্রসঙ্গ অবশ্যই আসবে। বিশেষ করে যে সময়টাতে মুসলমানরা এক ভয়ঙ্কর

পরিস্থিতির মুখোমুখী হচ্ছিল।

সাধারণতঃ ইনকুইজিশনের অর্থ নিরীক্ষা এবং যাচাই বাছাই করা। কিন্তু দু'চারটা শব্দে ইনকুইজিশনের প্রকৃত অর্থ বুঝানো সম্ভব নয়। নিরীক্ষার মত ইনকুইজিশনও সাদাসিধা মনে হয়। কিন্তু স্পেনীয় গীর্জার তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি ছুঁড়লে মনে হয়, ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর চাইতে ভয়ঙ্কর শব্দ আর কিছুই ছিল না।

'ইনকুইজিশন' এক বিস্তৃত ও বিশাল আদালত। সংবাদ সংস্থা, গোয়েন্দা বিভাগ, আদালত এবং জেলগুলো একই উদ্দেশ্যে কাজ করত। সে সব পাদ্রীরাই এগুলো পরিচালনা করত যারা মানুষকে জোর করে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিত। কারো সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার পরে তুমি মনে প্রাণে খৃস্টান হওনি এ অপবাদ আরোপ করে হত্যা করত।

কাউকে দোষী করার জন্য একটা গোপন সাক্ষীই যথেষ্ট ছিল। লোকদের ধরে এনে দুঃসহ যাতনা দিয়ে না করা অপরাধের স্বীকৃতি নেয়া হত।

নিঃস্বতার মাঝে চোখ মেলেছিল ক্রুশের পুজারীরা। শতাব্দীর ব্যবধানে রোম সম্রাটদের সাথে তাল মিলিয়ে ওরা নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর ধর্মের নামে বইয়ে দিয়েছিল এক নদী রক্ত।

৩১৬ খৃঃ কস্তুনতুনিয়ার মসনদে আসীন হওয়ার পর শুরু হল খৃস্টান ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। রোমান শাসকরা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণকারীদের কঠিন শাস্তি দিত। কিন্তু কস্তুনতুনিয়া হাতে আসার পর গীর্জাও সরকারী প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত পাদ্রীরা অবতীর্ণ হল জালেমের ভূমিকায়। কাইজার রাষ্ট্রীয় শত্রুদের সাথে যে ব্যবহার করত, এরা অ-খৃস্টানদের সাথে তেমন ব্যবহার করতে লাগল।

প্রথম দিকে গীর্জার উপর শাসকবর্গের আধিপত্য ছিল। ধীরে ধীরে দুর্বল শাসকরা হয়ে উঠল গীর্জার হাতের পুতুল। রোমান আইনে যে সহনশীলতা ছিল, গীর্জা ছিল তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাদ্রীদের সাথে কারো মতের অমিল হলেই তাকে নিকৃষ্টতম দুশমন মনে করা হত। কথার জবাব ছিল কঠোরতা। তাদের একটাই শ্লোগান ছিল, হয় আমাদের সঙ্গী হও, নয়তো দুনিয়া থেকে বিদায় নাও।

ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে খৃস্টানরা প্রায় নব্বইটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। নিজেদের মধ্যে চলছিল কঠিন সংঘাত। সরকারী দল

বিরোধীদেরকে বিচারের জন্য হুকুমতের সামনে পেশ করত। ধীরে ধীরে গীর্জা এ বিচারের ভার তুলে নিল নিজের হাতে। প্রশাসনে তাদের আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে পাদ্রীরা স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠল। উত্তরের জংগীরা যখন রোম সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিল, এসব পাদ্রীরা তাদের সাথে মিশে কায়েম করল গীর্জাধিপত্যের এক নতুন ইমারত।

এখন পোপ হলেন সরকারী দলের নেতা। অন্যান্য ধর্মীয় উপদলকে গীর্জা থেকে বের করা অথবা শাস্তি দেয়ার পূর্ণ এখতিয়ার ছিল তার। গীর্জার কর্মচারীরা উপদলের নেতা অথবা বিরুদ্ধবাদীদের পাকড়াও করার জন্য নতুন নতুন আদালত সৃষ্টি করত। ক্রমে মুক্তির হাতিয়ার বানানোর পরিবর্তে ধর্মকে তারা জুলুমের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করল।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনাতেই সামগ্রিক জনজীবন গীর্জায় আওতায় চলে এল। পোপ তৃতীয় উনুসেন্ট গীর্জার 'দমন বিভাগ'কে একটা স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন।[১] এর সাথে সাথে শুরু হল জুলুম অত্যাচারের এমন এক অধ্যায়– মানবতার ইতিহাসে যার কোন উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কখনো ইনকুইজিশনের পক্ষে বাইবেলের শ্লোক উদ্ধৃত করা হত। গীর্জার অবস্থান এমন দাঁড়ালো, ইউরোপের অত্যাচারী শাসকদের সৈন্যবাহিনী থেকেও এরা বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠল। কোন সম্রাটও গীর্জার আইনের সমালোচনা করতে পারতো না।

---

[১] *১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে পোপ উনুসেন্ট আয়গ্নন (AYIGNON) গীর্জাধারীদের এক কনফারেন্স আহবান করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতিটি এলাকায় বিশপ স্ব স্ব এলাকায় ঘোষণা করবেন যে, গীর্জা বিরোধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য তারা সর্বোতভাবে পোপের নির্দেশ মেনে চলবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় একজন পাদ্রী অথবা দু'জন সাধারণ মানুষ যদি কারো বিরুদ্ধে ধর্ম ত্যাগের সাক্ষ্য প্রদান করে তবে দেরী না করেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।*

১৬১৫ সালে পোপ আবার কনফারেন্স আহবান করেন। ইনকুইজিশনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য ঘোষণা করা হয় যে, গীর্জা কাউকে 'ধর্মদ্রোহী' বললে কোন সরকার তা বাতিল করতে পারবে না। তাকে হত্যা করার পূর্ণ অধিকার গীর্জার থাকবে। শাসকবর্গকে অবশ্যই হলফ করে এর স্বীকৃতি দিতে হবে। এর ফলে সরকার এবং জনগণ ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হল। তারাই ধর্মদ্রোহী যারা কথায় বা কাজে রাষ্ট্র স্বীকৃত চার্চের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের জবরদস্তির সমর্থন করে না। তাদেরকে গীর্জা থেকে বের করার পদ্ধতি হচ্ছে, তাদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা। আদালত তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করবে। যার বিরুদ্ধে কোনও প্রামাণ্য অভিযোগ থাকবে না তার নাগরিকত্ব বাতিল করবে এবং সরকার তাদেরকে কোন চাকুরী দিতে পারবে না।

গীর্জার ভয়ে ১৬৬২ সালে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ঘোষণা করলেন যে, পবিত্র ইনকুইজিশনের কর্মচারীরা যেখানেই যাবে তাদের হেফাজতের দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীদের। যদি তারা কাউকে সন্দেহ করেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হবে। ইনকুইজিশন কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করলে আট দিনের মধ্যেই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ধর্মদ্রোহীদের সাধারণতঃ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। কখনো কেটে ফেলা হত জিহ্বা। অপরাধ ছোট হোক বা বড় হোক, শাস্তি কঠোর হোক কি হালকা, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অবশ্যই ক্রোক করা হত। সম্পত্তিকে তিন ভাগ করে এক ভাগ পাকড়াওকারী, এক ভাগ সরকার ও এক ভাগ গীর্জার কাছে রাখা হত।

পাদ্রীদের লোভ এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এদের সব সময় চিন্তা থাকত কিভাবে এ সংস্থার পরিধি বিস্তৃত করা যায়। মিথ্যা মামলা চালানো, শাস্তি দিয়ে নিরপরাধীর কাছ থেকে অপরাধের স্বীকৃতি নেয়া ছিল মামুলী ব্যাপার। জনতার ওপর চলছিল অত্যাচারের স্টীম রোলার। অপর দিকে গীর্জাধারীদের জীবনযাত্রা ছিল রাজা বাদশাদের মত জাঁকজমকপূর্ণ।

ত্রয়োদশ শতকে 'ডোমিনিক্যান' (DOMINICAN) মতবাদ উদ্ভবের সাথে সাথে গীর্জার অত্যাচারের সাথে সংযোজিত হল আরেক নতুন অধ্যায়। অতীত রোম সাম্রাজ্যে যে সব পাদ্রীদের মাথা গোঁজার স্থান ছিল না, ওরা জ্বালিয়ে দিল প্রতিশোধের দাবানল।

গ্রেফতার থেকে শুরু করে আদালতের সামনে পেশ করা এবং শাস্তির হুকুম শোনানো, সব কিছুই চলতো গোপনে। কেউ হঠাৎ বাড়ি থেকে হারিয়ে গেলে মনে করা হত ইনকুইজিশনের জল্লাদরা তাকে গ্রেফতার করে কোন শাস্তি সেলে নিয়ে গেছে। ইনকুইজিশনের কোন কাজের সমালোচনা অথবা কোন সংবাদ আদান প্রদান করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এসব অত্যাচারের কাহিনী লেখার অনুমতি ছিল না কোন ঐতিহাসিকের। কিন্তু ষষ্টদশ শতকে ধীরে ধীরে অতীতের পর্দা উন্মোচিত হতে লাগল। চারদিকে ভেসে[২] বেড়াতে লাগল অসহায়দের

---

[২] *রেনাল্টো গঞ্জেলস মন্টেনো (REINALTO GBNZALLEZ MONTANO) সম্ভবতঃ প্রথম ঐতিহাসিক, যার লেখনী দমন সংস্থার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৫৬৭ খ্রিঃ তাই ইনকুইজিশন সম্পর্কিত এই*

'হাইডেল বুরগ' প্রকাশিত হয় জার্মানী থেকে। স্পেন থেকে তিনি জার্মানীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মন্টেনোর বই 'হাইডেল বুরগ' এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলো সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ইউরোপে কয়েকটি ভাষায় এ বইটি অনূদিত হয়। ব্রিটেনের একজন সরকারী কর্মকর্তা মথিউ পার্কার আর্কবিশপ ক্যান্টাবারার নামে উৎসর্গ করে বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্টদের কাছে বইটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ইনকুইজিশনের ভয়াবহ রূপ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতিহাস এবং সাহিত্যের দিকনির্দেশ করেছিল। কথা সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা শাস্তি সেলের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। কামুক পাদ্রীরা পুরুষের মত নারীদেরকেও উলঙ্গ করে শাস্তি দিত। এ বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে ১৮১৭ সালে স্পেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হয় জন এন্টোনিউ লোরেন্টের বিখ্যাত গ্রন্থ। প্যারিস থেকে চার খন্ডে তা ছাপা হয়েছিল। ১৭৫৬ সালে লরেন্টের জন্ম হয়। লেগরানোতে (LAGRANO) তিনি দমন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। তিনি আদালতগুলোকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংকীর্ণমনা পাদ্রীরা ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তাকে সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারণ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাই যোশেফ যখন স্পেন দখল করেন তিনি তখন তার সাথে মিশে গিয়েছিলেন। লোরেন্ট আদালতের অনেক পুরনো রেকর্ডপত্র হস্তগত করেন। বই শেষ না হতেই বোনাপার্টের পতন হয়। তাকেও দেশ ছাড়তে হয় সেনাবাহিনীর সাথে। তবুও অনেক পুরনো দলিলপত্র তিনি সাথে নিয়েছিলেন। প্যারিসে বসে বই সমাপ্ত করেন। লোরেন্টের ভাষায় স্পেনে প্রায় ৩১,৬১৬ জনকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল। লৌহপিঞ্জর ভেঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল ১৭,৬৫৯ জন। জন ম্যাটলের বই 'দি রাইজ অফ ডাচ রিপাবলিক' (THE RISE OF DUTCH REPUBLIC) ১৮৫৫ সালে লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক দমন সংস্থার আদালত সম্পর্কে লেখেনঃ 'দেশের সকল দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিধানসমূহের ওপর এ আদালতের কর্তৃত্ব ছিল। স্বল্পসংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত হত এই আদালত। এর রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যেত না। আদালতের গোয়েন্দা ছড়িয়েছিল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। প্রতিটি ঘরের সংবাদ তাদের কাছে ছিল। কারো সামনে এদের জবাবদিহী করতে হত না। তারা মানুষের মনের খবর জানার দাবী করত। আসামীরা প্রকাশ্য কাজের পরিবর্তে মনের মধ্যে লুকানো ধারনার শাস্তি পেত, লোকদের গ্রেফতার করা হত সন্দেহ বশে। যে অপরাধ করেনি, কঠোর শাস্তি দিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে সে সব অপরাধের স্বীকৃতি নেয়া হত। শাস্তি ছিল জীবন্ত দগ্ধ করা। কারো গোপন সাক্ষীই শাস্তি সেলে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। ঠান্ডা এবং ক্ষুৎ পিপাসায় দৈহিক এবং মানসিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে এলে সংস্থার কর্মচারীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। জবাব দেয়ার শক্তি থাকলে না করা অপরাধের স্বীকারোক্তি নেয়া হত। নূন্যতম শাস্তি ছিল স্থাবর অবস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা। তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অথবা জীবনভর 'সেন বেনিটো' (SAN BENITO) নামের অপমানকর পোশাক পরতে বাধ্য করা হত। কেউ নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে চাইলে অতিরিক্ত শাস্তি দেয়ার জন্য এক সাক্ষী এবং জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট ছিল। অপরাধীকে শোনানো হত শুধু দন্ডাদেশ। গোপন সাক্ষীর ব্যাপারে তাও শোনানো হতো না। গীর্জা যেটা অপরাধ মনে করে, তা জানার পর সংস্থার কাছে রিপোর্ট না করলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। এ নির্দেশকে জনগণ দারুণ ভয় করত। ফলে ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি স্ত্রীকেও গোপন সাক্ষী দিতে হত। লোক দেখানোর জন্য আসামীকে দেয়া হত একজন উকিল। কিন্তু আসামীর সাথে কথা বলা অথবা আদালতে টু শব্দ করার অনুমতি ছিল না উকিলের। শাস্তি শুরু হত মাঝ রাতে, প্রদীপের ক্ষীণ আলোয়। কয়েদী নারী পুরুষ অথবা বালিকা যেই হোক তাকে উলঙ্গ করে কাঠের বেঞ্চিতে বসান হত। এরপর সচল হয়ে উঠত সে যন্ত্র যার কল্পনা করলেও মানুষের আত্মা কেঁপে উঠে। আপাদমস্তক কালো পোশাকে আবৃত জল্লাদের নেকাবের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত তার খুনী দুটো চোখ। কখনো ঘাড়, বাহু এবং পায়ের হাড় পিষে ফেলা হত যন্ত্র দিয়ে।'

অশিতিপর বৃদ্ধ একজন শিক্ষক 'জন ফ্যাকসি' লিখেছেনঃ 'নিরপরাধ কয়েদীদের শাস্তি দিতেও পাদ্রীরা এতটুকু অনুকম্পা দেখাত না। এজন্য সংগ্রহ করা হত মিথ্যা শপথ।'

করুণ আর্তনাদ।

এদের দ্বিতীয় টার্গেট ছিল ইহুদীরা। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় ইউরোপের বিত্তশালী ইহুদীরা খৃস্টানদের জন্য খুলে দিয়েছিল সম্পদের দুয়ার। কিন্তু যখন ওসমানীয় তুর্কীরা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ইউরোপকে বেছে নিল এবং বলকান থেকে অষ্ট্রিয়া পর্যন্ত উড়িয়ে দিল বিজয়ের ঝাণ্ডা, তখন পশ্চিম ইউরোপের শাসকগণ তাদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ইউরোপের ব্যবসা ছিল ইহুদীদের হাতে। খৃস্টান শাসক থেকে একজন সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাদের কাছে ঋণগ্রস্থ ছিল। এ ঋণের দায়মুক্ত হবার জন্য ওরা গীর্জার সহযোগিতা কামনা করল। দমন সংস্থা তৎপর হয়ে উঠল। অত্যাচারের স্টীম রোলার গড়িয়ে গেল চারদিকে, জানমালের হেফাজতের জন্য ইহুদীদেরকে বাধ্য হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হল।

খৃষ্টধর্মের অনুসারী বৃদ্ধি করার সাথে সাথে ইহুদীদের সম্পদ হাত করা ছিল তাদের বড় অভিপ্রায়। মনে প্রাণে খৃস্টান হয়নি এ কথা প্রমাণ করলেই হত। এর জন্য ছিল ইনকুইজিশনের দমন বিভাগ। ঋণের দায় থেকে বাঁচার জন্য শাসক এবং প্রজারা ওদের পূর্ণ সহযোগিতা করতে লাগল।

সাধারণ মানুষ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে কোন মিথ্যা অভিযোগই বিশ্বাস করত। গোয়েন্দারা বিত্তশালী হলেই ইহুদীদেরকে পাকড়াও করত। বিগত যুদ্ধগুলোতে ইহুদীরা সব সময়ই খৃস্টানদের পক্ষে ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! জার্মানরা যখন ইহুদী নিধনযজ্ঞে মেতে উঠল তখন তাদের আশ্রয় দিয়েছিল তুর্কী শাসকরা। কুসংস্কারে বিশ্বাসী ইউরোপীয়রা যাদুকরদেরকেও সন্দেহের

পাদ্রী ইংগ্রাম গোবল (INGRAM GOBLE) নামক একজন পাদ্রী ফ্যাকসির লিখা 'শহীদদের বই'র বিংশতিতম সংস্করণে কিছুটা সংযোজন করে লিখেছেনঃ 'নেপোলিয়নের যুগে ফ্রান্সবাহিনী যখন স্পেন দখল করে তখন মিডরোডে 'দমন সংস্থার' গোপন কারা প্রকোষ্ঠে তল্লাশী চালানো হয়। এক স্থানে শাস্তি দেয়ার বিভিন্ন যন্ত্রাদি পাওয়া গেছে। একটা মেশিন এমন ছিল, কয়েদীকে তার সাথে বেঁধে মেশিন চালু করলে কয়েদীর পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত প্রতিটি হাড়ের জোড়া খুলে যেত। আর এক স্থানে কয়েদীকে পানি দিয়ে শাস্তি দেয়ার বিভিন্ন যন্ত্রাদি ছিল। একটা মেশিনে গাঁথা ছিল চল্লিশটি ছুরির ফলা। কয়েদীকে মেশিনে ঢুকিয়ে চালু করলে ছুরির আঘাতে তার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। সবচে' ভয়ংকর মেশিন ছিল একটা পুতুল। পুতুলটা সাজানো হত দামী পোশাকে। পুতুলের দুটো হাত ছিল প্রসারিত। যেন কাউকে আলিঙ্গনের জন্য আহবান করছে। তার সামনে বিছানা পাতা। বিছানার উপরে অর্ধবৃত্ত আঁকা। কয়েদীকে এ সুন্দর পুতুলের দিকে ঠেলে দেয়া হত। মেশিন চালু হতেই দাগের মধ্যে পা পড়তো বন্দীর। সাথে সাথে পুতুলটি সাপটে ধরত কয়েদীকে। মুহূর্তে হাজার হাজার ছুরির ফলা ছিন্ন ভিন্ন করে দিত তার দেহ।'

চোখে দেখত। ১৪৮৩ খৃস্টাব্দে পোপ সপ্তম উনুসেন্ট এক ফরমান জারী করলেন যেঃ 'যাদুকর দেশের জন্য খোদায়ী গজব। সময় থাকতে এর প্রতিরোধ করা জরুরী।'

উত্তর এবং মধ্য জার্মানীতে যাদুর চর্চা বেশী ছিল। সুতরাং ডোমেঙ্কি সম্প্রদায়ের দুই নেতা ক্যানর এবং স্প্রেংগারকে যাদুকরদের শায়েস্তা করার জন্য নিয়োগ করলেন। তাদের প্রকাশিত এক রিপোর্টে সমগ্র জার্মানীতে চলল ধ্বংসের হোলি খেলা। পাদ্রীদের মতে যাদুকরদের সাথে শয়তানের সম্পর্ক রয়েছে। তারা চার্চগুলোকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, যাদুকররা মানুষের সন্তান খায়, শোয় শয়তানের সাথে। শনিবারে বাতাসের সাথে মিশে পশু পাখির অনিষ্ট করে। ওরা ঝড় সৃষ্টি করতে পারে, পারে বজ্র বর্ষাতে। এ সতর্কবাণী প্রকাশ হবার পর অন্যান্য পোপরা ক্যানর এবং স্প্রেংগারের রিপোর্টের সাথে একমত হতে লাগল। ১৫৪৫ সালে যাদুকরদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু হল। জিনুয়ায় একদিনেই তেরো ব্যক্তিকে হত্যা করা হল।

এক রিপোর্ট অনুযায়ী তেরো থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝে যাদুকরীর অপরাধে শুধু পশ্চিম ইউরোপেই পনেরো লাখ মানুষকে জীবন্ত পোড়ানো হয়েছিল। তখন ব্রিটেনে জীবন্ত দগ্ধকারীদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষেরও বেশী। কারো ওপর যাদুর অপরাধ আরোপের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার করা হত। ঋণের দায়মুক্ত হওয়ার জন্য অথবা শত্রুর উপর প্রতিশোধ সাব্যস্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত।

জানমালের হেফাজতের জন্য যেসব ইহুদীরা খৃষ্টবাদে দীক্ষা নিয়েছিল তাদের একটা দল জালিমদের কাতারে শামিল হয়েছিল। ওদের আশংকা ছিল, স্বজাতির প্রতি একটু নমনীয়তা প্রদর্শন করলে গীর্জায় তারা বিশ্বাস যোগ্যতা হারাবে। তাছাড়া শত বছর ধরে গীর্জার অত্যাচার সয়ে সয়ে ওদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ওরা ছিল সবচেয়ে নিষ্ঠুর।

মানবতার বিরুদ্ধে তাদের এ ঘৃণ্য তৎপরতার জন্য পাদ্রীদের পোশাকেই ওরা সান্ত্বনা খুঁজে পেত। শাস্তি সেলের কষ্টদায়ক শাস্তির পরিকল্পনা বের হত এদের উর্বর মস্তিস্ক থেকে। যাদের শিরায় পাওয়া যেত ইহুদী রক্ত তাদেরকে স্বপক্ষে সাফাই পেশ করার এবং দমন সংস্থার হিংস্রতা থেকে বাঁচার জন্য খৃস্টানদের তুলনায় কঠিন হৃদয়ের প্রমাণ দিতে হত। ইউরোপের অন্যান্য দেশে খৃস্টান উপদলগুলো দমন করার পর দমন

সংস্থা ইহুদীদেরকেই বড় দুশমন মনে করত। এসব দেশের চাইতে স্পেনের অবস্থা ছিল ভিন্ন। উত্তর স্পেনে খৃস্টানরা যখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ইহুদীরা তখন খৃস্টানদের পক্ষে ছিল। এদের জন্য খুলে দিয়েছিল সম্পদের দুয়ার।

১২২৪ সালে খৃস্টানরা সেভিল অধিকার করে। ইহুদী বণিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য সরকার তিনটি মসজিদ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। মসজিদগুলো তারা প্যাগোডায় রূপান্তর করেছিল।

পরবর্তী যুগ ছিল ইহুদীদের সুখ সমৃদ্ধির যুগ। ব্যবসায় পূর্ব থেকেই তাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এবার অনেকে সরকারী পদ দখল করল। সপ্তম ফান্সুর কোষাধ্যক্ষ ছিল একজন ইহুদী। তার হারেমে ছিল ইহুদী রক্ষিতা। প্রশাসনের সহতেযাগিতায় ওরা শতকরা চল্লিশ টাকা সুদ গ্রহণ করত। অতিরিক্ত সুদের চাপে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

খৃস্টান জায়গীরদাররা ইহুদীদের পকেট ভরার জন্য প্রজাদের কাছে বেশী করে খাজনা উসুল করত। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে তাদের বিপুল সম্পদ এবং আমীরানা চালচলনের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে উঠল। গীর্জার পাদ্রীরা পূর্ব থেকেই ওদের প্রতি ছিল অপ্রসন্ন। এবার তারা জনতার সাথে আন্দোলনে একাত্ম হয়ে গেল।

খৃস্টানদের এক পাদ্রী হার্নিও মার্টিন, তার কণ্ঠে অনল ঝরতো। এ উন্মাদ পাদ্রী যেদিকে যেত ইহুদীদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠত প্রতিশোধের আগুন। আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ইহুদীর কাছে দায়গ্রস্থ ব্যক্তিরা।

বিত্তশালী ইহুদীরা সম্রাট সেভিলের বিশপ এবং পোপের কাছে মর্টিনের বিরুদ্ধে আপীল করল। সম্রাট এবং বিশপ ইহুদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করার নির্দেশ জারী করলেন। কিন্তু মার্টিন এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করলঃ 'আমার ভেতর রয়েছে প্রভুর আত্মা। কোনও মানুষের আইন আমার জবান স্তব্ধ করতে পারবে না।'

সেভিলের আর্ক বিশপ ডন পেড্রো ক্রুদ্ধ হয়ে গীর্জা থেকে বের করে তাকে দেয়া সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। তার মামলা চলার সময় আর্ক বিশপ দেহ ত্যাগ করলেন। বিভিন্ন উপায়ে মার্টিন তার পদ অধিকার করে বসল। বিশপ হয়ে মার্টিন সর্ব প্রথম ইহুদীদের কতগুলো প্যাগোডা পুড়িয়ে দিল।

সেভিলের এ অগ্নিশিখা ছড়িয়ে গেল সমগ্র স্পেনে। কর্ডোভা, বারগেস, টলেডো, আরাগুন, কতলুনা এবং বিরশেলুনার অলিগলি ইহুদীদের রক্তের

বন্যায় ভেসে গেল। বেঁচে থাকার জন্য খৃষ্টবাদের দীক্ষা নেয়া ছাড়া ইহুদীদের আর কোন উপায়ই রইল না।

সাধারণ মানুষ ছিল এতটা উত্তেজিত, কোন সরকারী কর্মকর্তা পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালে তাকেও হত্যা করত। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে তখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইহুদী নিহত হয়েছিল। খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল দশ লাখেরও বেশী।

আন্দোলন শান্ত হয়ে এলে বাকী ইহুদীরা ভগ্ন প্যাগোডাগুলোর মেরামত করতে লাগল। কিন্তু আবার জ্বলে উঠল প্রতিশোধের আগুন। এক সরকারী ঘোষণায় বলা হলঃ 'কোন ইহুদী এখন থেকে নিজেদের ধর্মীয় আদালতের জর্জ হতে পারবে না। তাদের সকল মোকদ্দমা এখন থেকে খৃস্টানদের আদালতে চলবে। সমস্ত শহরে থাকবে একটা মাত্র প্যাগোডা। বাকী সব প্যাগোডা গীর্জায় রূপান্তরিত করা হবে। ইহুদীরা চিকিৎসা, সার্জারী এবং রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারবে না। কেউ খৃস্টানদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য এবং কোনও প্রকার লেনদেন করতে পারবে না। তারা টেক্স কালেক্টর হতে পারবে না। কোন ইহুদী খৃস্টানদের সাথে খেতে পারবে না, এমনকি ইহুদীদের কোন ছেলেমেয়ে খৃস্টান ছেলেমেয়েদের সাথে একই স্কুলে শিক্ষা লাভ করতে পারবে না।

ইহুদীরা বাড়ীর চারপাশে প্রাচীর তুলবে। ইহুদী এবং খৃস্টানদের মধ্যে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে না। কোন ইহুদী যদি খৃস্টান নর্তকীর সাথে সম্পর্ক রাখে তবে তাকে জীবিত পোড়ানো হবে। চুল কাটতে পারবে না কোন ইহুদী। বছরে কমপক্ষে তিনবার তাদেরকে খৃস্টান পাদ্রীদের বক্তৃতা শুনতে হবে। এসব বক্তৃতায় তাদের পূর্ব পুরুষদের গালি দেয়া হত।

খৃষ্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত ইহুদীদেরকে মারানু নামে ডাকা হত। খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করার ফলে এতদিন উন্নতির যেসব পথ তাদের জন্য রুদ্ধ ছিল একে একে খুলে গেল সে সব। আসীন হল সরকারী বড় বড় পদে। ধর্মান্তরিত হলেও খৃস্টানরা তাদের বরদাশত করতে পারত না। তারা প্রচার করে বলে বেড়াতে লাগল যে, এরা মনে প্রাণে খৃস্টান হয়নি। লোভ অথবা ভয়ে এদের কেউ কেউ সাক্ষ্য দিত নিজের জাতির বিরুদ্ধে।

ফার্ডিনেণ্ড যতদিন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ইহুদীরা তাকে সাহায্য করত। তিনি বেলেনসিয়া, কাতলুনা এবং আলমনওয়ারে ইনকুইজিশনের শাখা স্থাপনের অনুমতি দেননি। কিন্তু গ্রানাডা পতনের পর

রাণী প্রথমবার সেভিল গিয়েই ইনকুইজিশনের ভিত্তি স্থাপন করলেন।

কী আশ্চর্য! রাণী ইসাবেলার পরামর্শদাতা, সেক্রেটারী এবং নিজস্ব কর্মচারীদের অনেকেই ছিল ইহুদী ধর্মান্তরিত খৃস্টান। অথচ তারাই সম্পদের লোভে ইনকুইজিশনের পক্ষে রাণীর সাথে একাত্ম হয়ে গেল।

ডোমেঙ্কি সম্প্রদায়ের এক পাদ্রী তুর্কমেণ্ডা। থাকতেন সিগুদিয়ার খানকায়। পরতেন মোটা পোশাক। তার সাদাসিধে জীবনযাপনের কারণে লোকজন তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এ পাদ্রীই ইনকুইজিশনকে ধর্মের পবিত্র অঙ্গে রূপান্তরিত করেছিলেন। স্পেনে জুলুম অত্যাচারের শক্তিশালী ভিত গেড়েছিলেন তিনি। তার শয়তানী চিন্তাধারায় জনগণ প্রভাবিত ছিল। ৫৮ বছর বয়সে ১৪৭৮ সালে তুর্কমেণ্ডা টলেডো এবং আরাগুনের দমন সংস্থার প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। এর সাথে শুরু হল পাশবিকতার এমন ভয়ঙ্কর পন্থা, যার কল্পনায় মানুষের বিবেক শিউরে উঠে।

গ্রানাডার মুসলমানদের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য ফার্ডিনেণ্ডের অজস্র সম্পদের প্রয়োজন ছিল। তার প্রয়োজন পূরণ করার ভার গীর্জাকে না দিয়ে 'দমন সংস্থার' হাতে সোপর্দ করেছিলেন। চিহ্নিত অঞ্চলের অধিকাংশ রায়ত জানমাল বাঁচানোর জন্য খৃষ্টধর্ম কবুল করেছিল।

বিত্তশালী নব্য খৃস্টানরা ছিল তাদের চোখের কাঁটা। প্রয়োজন ছিল এমন ব্যক্তির, যে ধর্মের ছদ্মাবরণে ওদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে। তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে যে, যা কিছু হচ্ছে তা কেবল ধর্মের জন্য। সে প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল তুর্কমেণ্ডা।

ফার্ডিনেণ্ডের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তুর্কমেণ্ডা ফার্ডিনেণ্ডের জন্য গঠনতন্ত্র তৈরী করেছিলেন। তৈরী করেছিলেন কিছু আইন কানুন। জনগণের ধনসম্পদ হাত করাই ছিল এ সব আইনের উদ্দেশ্য। গীর্জার বিরুদ্ধে ন্যূনতম বিরোধিতা দেখলেও ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তার ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হত। ধর্মদ্রোহীরা গ্রেফতার হবার পূর্বে সম্পদের কিছু অংশ বিক্রি করলে অথবা ঋণ পরিশোধ করলে তাও ক্রোক করা হত। এরপর দমন সংস্থার জল্লাদ কয়েদীকে শাস্তি দিয়ে আরো কয়েক ব্যক্তিকে ফাঁসিয়ে দিত। যেমন কোনও কয়েদীকে একথা বলতে বাধ্য করানো হত যে, তার পিতা, ভাই, মামা, চাচাও তার মতই একই রকম চিন্তার অধিকারী। তখন তাদেরকেও শাস্তি সেলে পাঠিয়ে দেয়া হত। এভাবে এক ব্যক্তির ধ্বংস ডেকে আনতো অসংখ্য মানুষের ধ্বংস ও বরবাদী। কারো মৃত্যুর চল্লিশ

বছর পরও তাকে কাল্পনিক শাস্তি দেয়া হত। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়া তার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হত। বিক্রিত সম্পদও রেহাই পেত না।

মৃতদেরকে দৈহিক শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়, এ জন্য কবর খুঁড়ে পুড়িয়ে দেয়া হত তাদের হাড়গোড়। এগুলো নিক্ষেপ করা হত কোন জ্বলন্ত ব্যক্তির চিতায়। পলাতক আসামীর অনুপস্থিতিতেই তার বিরুদ্ধে চলত মোকদ্দমা। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হত। অপ্রাপ্ত বয়সের অপরাধীদের প্রতি কিছুটা নমনীয়তা দেখানো হতো যদি ওরা বলত যে, পিতা মাতাই তাদের এ পথে এনেছে। এ অজুহাতে পিতা মাতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হতো সম্পদ, আর ওরা বাপ-মায়ের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হত চিরদিনের জন্য।

অতীত শাসকবর্গ বেশী করে খাজনা উসুলের দায়িত্ব দিয়েছিল ইহুদীদেরকে। কিন্তু তুর্কমেণ্ডা তাদেরকে সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। তখন কারো সম্পদ অধিকার করার সহজ পদ্ধতি ছিল কাউকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেয়া। সাক্ষীর কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বীকারোক্তির জন্য ছিল 'শাস্তি সেল।'

কঠিনপ্রাণ লোকদের বিভিন্ন প্রকারে শাস্তি দেয়া হত। প্রতিবার নেয়া হত নতুন জবানবন্দী। ইনকুইজিশনের জল্লাদদের হিংস্রতার সামনে ধৃত ব্যক্তি মিথ্যা জবানবন্দী দিতে বাধ্য হত।

না করা অপরাধ স্বীকার করার পরও তাকে ছাড়া হত না। দেয়া হত আরো কঠিন শাস্তি। দুঃসহ যন্ত্রণায় কয়েদী বাধ্য হয়ে আরো নিরপরাধ মানুষের নাম প্রকাশ করত। মামলা নিস্পত্তি হতে চলে যেত বছরের পর বছর। কয়েদীর সম্পত্তি গীর্জার হাতে, বেঁচে থাকার জন্য তার সন্তান সন্ততির ভিক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় থাকত না।

কয়েদীকে দৈহিক শাস্তির পূর্বে দেয়া হত মানসিক শাস্তি। সেল ঘুরিয়ে ভয় দেখানো হত তাকে। এরপর কদিন বঞ্চিত রাখত নিদ্রা থেকে। এ সময় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করে দেয়া হত। কয়েদীর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হলে তাকে ক্ষুধার্ত রাখা হত। জবানবন্দী নেয়া হত সে সময়। কয়েদী অপরাধ স্বীকার না করলে শুরু হত দৈহিক শাস্তি।[৬] গীর্জা

---

[৬] *ঐতিহাসিকগণ ইনকুইজিশনের মাত্র অল্প কটা পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ম্যালগর্স উল্লেখ করেছেন চৌদ্দ প্রকারের শাস্তির কথা। কয়েদীর পায়ে চর্বি মেখে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর*

সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের ভাগ করেছিল দু'ভাগে। প্রথম ভাগ, যারা শাস্তি সেলে অপরাধ স্বীকার করে পরে অস্বীকার করেছে। দ্বিতীয় দল, যারা অপরাধ স্বীকার করার পরও মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু পরে আবার সে পূর্বের অপরাধ করেছে বলে সাক্ষী পাওয়া গেছে। এ দু'দলকেই জীবন্ত দগ্ধ করা হত।

শাস্তি সেল থেকে আদালত পর্যন্ত, আদালত থেকে চিতা পর্যন্ত পথে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হত। দমন সংস্থার কর্মচারীরা সবসময় চেষ্টা করত কমপক্ষে মৃত্যুর পূর্বে হলেও যেন কয়েদী অপরাধ স্বীকার করে। পাদ্রীরা এ ব্যাপারে সফল হলে অপরাধীকে পুরস্কার দিত। তা হচ্ছে চিতার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত জল্লাদ। আগুনের লেলিহান শিখা তাকে গ্রাস করার পূর্বেই জল্লাদ তাকে গলা চেপে মেরে ফেলত অথবা ঘাড় মটকে দিত। এতে গীর্জার প্রভুরা যারপরনাই সন্তুষ্ট হত। কারণ এক ব্যক্তি নিজের আত্মাকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে।

তুর্কমেণ্ডা মৃত্যুর পূর্বে এমন এক ভয়াবহ চিতা জ্বালিয়েছিল, যে আগুন

দাঁড় করিয়ে রাখা হত, অথবা দাগ দেয়া হত গরম লোহা দিয়ে। এরপর এদের শুলিতে ঝুলিয়ে দেয়া হত। কাঠের সাথে দু'হাত আটকে দেয়া হত পেরেক দিয়ে। কপি কলের সাথে রশি লাগিয়ে একমাথা দিয়ে কয়েদীর দুবাহু বেঁধে দেয়া হত। অপর মাথা ধরে টান দিলে কয়েদীর পা আলগা হয়ে যেত মাটি থেকে। দু'বাহুতে চলে আসত শরীরের ওজন। আবার রশি ঢিলা করে তার জবানবন্দি নেয়া হত। অপরাধের স্বীকার না করলে টেনে তোলা হত ছাদ পর্যন্ত। হঠাৎ রশি ছেড়ে দিলে কয়েদীর পা মাটি না ছুঁতেই আবার রশি টেনে ধরা হত। বারবারের টানা হেচড়ায় ছিঁড়ে যেত তার বাহু। এ পাশব যন্ত্রণার মধ্যে আবার তার জবানবন্দী নেয়া হত। কখনো কখনো তার পায়ে পাথর বেঁধে দেয়া হত। মাটি আর ছাদের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা হত দীর্ঘ সময় ধরে। ঐতিহাসিক ম্যালগর্স আরো লিখেন, কখনো এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হত তিন চার ঘন্টা পর্যন্ত। কয়েদী অজ্ঞান হয়ে গেলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত শাস্তি মূলতবী করা হত। অপরাধ স্বীকার না করা পর্যন্ত এ শাস্তি চলতেই থাকত। জল্লাদদের তৎপরতা, আসামীর বয়স, ঝুলিয়ে রাখার সময়, তার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখত দমন সংস্থার কেরানীরা।

পানির সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্তিগুলো ছিল 'দমন সংস্থার' কর্মচারীদের বেশী প্রিয়। আসামীকে একটা সিঁড়ির মত কাঠে শোয়ান হত। একটু নিচে চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে দেয়া হত দু'পা। হাটু এবং বাহুও বাঁধা হত চামড়ার রশিতে। চামড়া ঘিরে রশি যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে এ জন্য রশির নিচে কাঠ দেয়া হত। নাক এবং কানে তুলা পেঁচিয়ে দেয়া হত। কয়েদী শ্বাস নেয়ার জন্য মুখ খুললে জল্লাদ তার মুখে পুরে দিত ছেঁড়া ন্যাকড়া। এরপর তার উপর পানি ছিটানো হত। শ্বাস টানতে গিয়ে বাতাস এবং পানির চাপে ন্যাকড়া আটকে যেত গলার ভেতর। দম বন্ধ হয়ে আসত। কিছুক্ষণ পর পানি ঢালা বন্ধ করে অপরাধ স্বীকার করার কথা বলা হত তাকে। বাধ্য হয়েও না করা অপরাধ স্বীকার করত। তখন খুলে দেয়া হত তাকে। কেরানীরা লিখে নিত তার জবানবন্দী। তাকে বলা হত কাগজে দস্তখত করতে, যদি সে অস্বীকার করত আবার শুরু হত শাস্তির ধারা।

জ্বলেছিল দুইশত বছর পর্যন্ত। তার এ চিতার জ্বালানি ছিল ইহুদী। কিন্তু গ্রানাডার পতনের পর সে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল মুসলমানদেরকে। ফার্ডিনেণ্ডের সাথে মুসলমানদের সন্ধি শর্তের একটা ছিল বিজিত এলাকায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইনকুইজিশনের কোন তৎপরতা চালানো হবে না।

আঁধারের মুখোমুখী

সুলতান দেশ ছেড়েছেন চার বছর হল। স্পেনের লোকেরা শুনেছে তিনি নাকি মরক্কোর সুলতান মওলায়ে হাসানের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছেন।

আবুল কাসেমকে নিয়ে বিভিন্ন গুজব রটল আলফাজরায়। প্রতিটি গুজবের সাথে সৃষ্টি হত উৎকণ্ঠার হালকা ঢেউ। কিন্তু ক'দিন পর আবার শান্ত হয়ে যেত ধীরে ধীরে। তাকে ঘিরে মানুষের আকর্ষণে ভাটা পড়তে লাগল। এভাবে তাকে ভুলেই গেল মানুষ।

গ্রানাডার গভর্ণর মিণ্ডোজা ফার্ডিনেণ্ডের পরামর্শে গ্রানাডাবাসীর সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করছিলেন। আর্কবিশপ ট্যালভেরুও ছিলেন সতর্ক। এর ফলে শহরবাসীর দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হল। মুসলমানদের নিঃশেষ করে গীর্জার সর্বময় কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাদ্রীদের কোন বিলম্ব সইছিল না। রাণী ইসাবেলা ছিলেন এসব সংকীর্ণমনা পাদ্রীদের দ্বারা প্রভাবিত। মুসলমানদেরকে জোর করে খৃস্টান বানানো এবং তাদের মসজিদগুলো গীর্জায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা তৈরী করল তারা। রাণীর সহানুভূতি ছিল তাদের সাথেই কিন্তু বিদ্রোহের ভয়ে ফার্ডিনেণ্ড পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিলম্ব করছিলেন।

১৪৯৯ সালের হেমন্ত। ফার্ডিনেণ্ড, রাণী ইসাবেলা এবং টলেডোর আর্ক বিশপ জেমস গ্রানাডা এলেন। তাদের আগমন মুসলমানদের জন্য বয়ে নিয়ে এল অবর্ণনীয় দুঃখের কালো রাত।

জেমসের বয়স ছিষট্রির মত। ডোমেঙ্কি সম্প্রদায়ের এ পাদ্রীর মতে ধর্মকে সমুন্নত করার জন্য এবং পাপীকে পরকালীন মুক্তির জন্য মৃত্যুর পূর্বেই আগুনে নিক্ষেপ করা জরুরী।

চার বছর পূর্বে তিনি ছিলেন 'সিগুদিয়া' খানকায়। তাকে দেখা যেত সংসার বিবাগী পাদ্রী হিসেবে। নিরবচ্ছিন সাধনা তাকে জীবনের সকল হাসি আনন্দ থেকে উদাসীন করে দিয়েছিল। কঠোর কৃচ্ছসাধনার ফলে তিনি দয়া, অনুকম্পা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার কৃচ্ছতায় রাণী ছিলেন প্রভাবিত। ক্যাথলিক নিয়ম অনুযায়ী রাণীও তার সামনে পাপের স্বীকারোক্তি করতেন। তিনিই ফার্ডিনেণ্ডের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে টলেডোর আর্ক বিশপ নিযুক্ত করেছিলেন।

গ্রানাডার সুসজ্জিত অলিগলির দৃশ্য ছিল জেমসের কল্পনা বিরোধী। তিনি দেখলেন সে সব সুন্দর মসজিদ, যেখানে পাঁচবার আজানের সুর ধ্বনিত হয়। হাজার হাজার হাম্মামে গোসল করত মুসলমানরা। গ্রানাডার লাইব্রেরীতে দেখলেন আটশো বছরের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার। বছরের পর বছর ধরে তার বুকে যে ঘৃণার আগুন জ্বলছিল অকস্মাৎ তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

ফার্ডিনেণ্ড এবং রাণী এসেই ফৌজি ও পুলিশ অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। বিজিত এলাকার খোঁজ খবর নিলেন। ফার্ডিনেণ্ড যথেষ্ট খুশী। গ্রানাডার মত প্রত্যেক এলাকার পরিস্থিতি শান্ত। গ্রানাডা পতনের পর রাণী যা সন্দেহ করেছিলেন, তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। স্পেনের মুসলমানরা পরাজয় মেনে নিয়েছে, এখন আর বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু রাণী যেন সন্তুষ্ট হত পারলেন না। মুসলমানরা এখনো নিজ ধর্মের উপর অটল রয়েছে এজন্য তিনি ছিলেন উৎকণ্ঠিত। এ জন্যই তিনি মাঝে মাঝে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে জেমসের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

একদিন তিনি গভর্ণর এবং গ্রানাডার বিশপের সামনে ফার্ডিনেণ্ডকে বললেনঃ 'গ্রানাডা বিজয়ের সময় আমার একান্ত ইচ্ছে ছিল, মৃত্যুর পর আমাকে আলহামরায় সমাহিত করা হবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমরা শুধু সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেছি, যুদ্ধের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারিনি। আমাদের সৈন্যরা গ্রানাডায় যিশুর ধর্ম প্রচার করার পরিবর্তে দুশমনের বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। গভর্ণর ও আর্ক বিশপ হচ্ছে তাদের ঢাল।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল ফার্ডিনেণ্ডের চেহারা। রাগ সামলে বললেনঃ 'ফাদার জেমস গ্রানাডার গভর্ণর এবং বিশপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে থাকলে খোলাখুলি বলা উচিৎ।'

ঃ 'ফাদার জেমসের অভিযোগ অনেক পুরনো। আমার আশংকা হয়,

তার অভিযোগ দূর না করলে ভবিষ্যত বংশধর আমাদের বিদ্রুপ করবে। গ্রানাডায় ক্রুশের বিজয় হয়েছে সাত বছর আগে। গভর্ণর এবং বিশপের কাছে প্রশ্ন, আজ পর্যন্ত ক'জন মুসলমানকে খৃস্টান বানানো হয়েছে? নির্মিত হয়েছে কতগুলো গীর্জা। অথচ মানুষকে খৃষ্টবাদের কোলে আশ্রয় দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো কি আমাদের প্রথম কাজ ছিল না?'

ঃ 'রাণী!' ফার্ডিনেণ্ড জবাব দিলেন, 'আমি আমার কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল নই। তোমায় কে বুঝাবে, মুসলমানদের পদানত করার জন্য শক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের খৃস্টান বানাতে হেকমত এবং বুদ্ধিমত্তার দরকার। আমাদের হাত ওদের শাহরগে। কিন্তু তাদের হৃদয়গুলো বশ করার জন্য ধৈর্য এবং কুশলতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে।'

জেমস কক্ষে প্রবেশ করলেন। মসনদ থেকে উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন রাণী। হাঁটু গেড়ে বসে তার জুব্বায় চুমো খেয়ে বললেনঃ 'আসুন, পবিত্র পিতা।'

জেমস বেপরোয়া দৃষ্টিতে ফার্ডিনেণ্ডের দিকে তাকিয়ে মিণ্ডোজার ডানের শূন্য চেয়ারে বসে পড়লেন। আবার মসনদে গিয়ে বসলেন রাণী। কক্ষে নেমে এল অখণ্ড নিরবতা। অবশেষে নিরবতা ভেঙ্গে ফার্ডিনেণ্ড বললেনঃ 'পবিত্র পিতা! রাণীর অভিযোগ, আপনি নাকি গভর্ণর এবং বিশপের কাজে সন্তুষ্ট নন।'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট', জেমস বললেন, 'গ্রানাডার গভর্ণরের কোন কাজে বাঁধা দেয়ার কোন অধিকার আমার নেই। কিন্তু ভাই ট্যালাভেরার সম্পর্ক গীর্জার সাথে। গীর্জার ক্ষুদ্র খাদেম হিসেবে তাকে যদি কোন পরামর্শ দিই নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে না।'

ঃ 'গীর্জার কল্যাণে আপনি কোন ভাল পরামর্শ দিলে আমি তা গ্রহণ করব না, এ কী করে হতে পারে।' গ্রানাডার বিশপ বললেন।

ফার্ডিনেণ্ডের দিকে তাকিয়ে জেমস বললেনঃ 'মহামান্য সম্রাট, অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু গ্রানাডার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আপনার বিজয়ে গীর্জা যে আশা করেছিল ধীরে ধীরে তা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এখানকার মসজিদ, মাদ্রাসা এবং লাইব্রেরীগুলো দেখলে বিশ্বাসই হয় না, গ্রানাডা আপনার সাম্রাজ্যের অংশ। তাদের সংস্কৃতি, চালচলন এবং কথাবার্তায় এক রত্তি পরিবর্তন আসেনি। পোশাকে আশাকে মনে হয় তারাই গ্রানাডার শাসক। সরকারী আস্কারা পেয়ে ওদের এতটা বাড়

বেড়েছে যে, কোন পাদ্রীর সামনে হাঁটু গেড়ে সম্মান পর্যন্ত দেখায় না ওরা। ফাদার ট্যালাভেরার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার, তিনি তো সরকারের ইচ্ছাই পূর্ণ করবেন। খৃস্টবাদের দুশমনদের শায়েস্তা করার পথ তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে নয় অথবা তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বা আরবী শিক্ষার মধ্যেও নয়। গীর্জার কর্ণধার এই বৃদ্ধ ফাদারকেও আরবী শিখতে হয়েছে। এতে আমি বড় দুঃখ পেয়েছি। আমি মনে করি ধর্মের ব্যাপারে ওদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। আলামপনা! ইহুদীরা পারিবারিক পরিবেশে আরবী বলত, কিন্তু বাইরে ব্যবহার করত আমাদের ভাষা। এরপরও আমাদের পাদ্রীরা খৃস্টবাদকে বিজয়ী করতে পারেননি। কোন ইহুদী লোভে পড়ে খৃস্টান হলে তাদের সবটুকুন আন্তরিকতা থাকত স্বজাতির সাথে। গ্রানাডা বিজয়ের পর এ অপবিত্র জাতির জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন ধর্মান্তরিত অথবা দেশ ত্যাগ ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই। এ আপনার ও রাণীর মহান নীতি।'

একটু বিরতি নিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেনঃ 'দেশ ছেড়ে যাওয়া ইহুদীদের নিয়ে গীর্জা চিন্তিত নয়। যারা গীর্জাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য খৃস্টান হয়েছে, তাদের মনের শয়তানীর জন্য রয়েছে ইনকুইজিশন। হয় মনে প্রাণে খৃস্টান হবে, নইলে নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত চিতায়। ওদের প্রতিটি সন্তান জ্বলে পুড়ে ছাই-ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকতে এ চিতার আগুন। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আপনার এ সহানুভূতির কারণ আমি বুঝতে পারছি না। ওরা যেভাবে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে, আমার আশংকা হচ্ছে, আগামী প্রজন্ম ওদের ঘৃণা না করে বরং ওদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।'

ফার্ডিনেণ্ড চাইলেন রাণীর দিকে। চোখের ইশারায় তিনি জেমসের ভাষায় কথা বলছিলেন। জেমসকে লক্ষ্য করে ফার্ডিনেণ্ড বললেনঃ 'আপনার অভিযোগ ইহুদীদের মত মুসলমানদেরকে কেন খৃস্টান বানাইনি। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন ইহুদীরা আমাদের শর্তহীন প্রজা। কিন্তু মুসলমানদের সাম্রাজ্য আমরা কব্জা করেছি তাদের বিগত শাসকদের সাথে লিখিত চুক্তি করে। যে চুক্তির মধ্যে ছিল মুসলমানদের কোন ধর্মীয় অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হবে না। চুক্তির দলীলে রোম সম্রাটও সই করেছেন। গ্রানাডার সাথে করা চুক্তির প্রতিটি শর্ত আমরা যথাযথভাবে পালন করার শপথ করেছি। সে চুক্তির সাথে গীর্জাও একমত ছিল। আমাদের বিশপও এতে কোন আপত্তি তোলেননি। এখন আপনি কি আমাকে শপথ ভেঙ্গে দিতে বলেন!

ভবিষ্যত ঐতিহাসিকগণ আমাদের কী মনে করবে এ কথা যদি আপনি না ভাবেন, কমপক্ষে একথা তো বুঝেন যে, এ চুক্তি ভঙ্গকে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারবে না। যারা আটশো বছর এদেশ শাসন করেছে, তারা ইহুদীদের চেয়ে ভিন্ন। আহত পশুর শেষ আক্রমণ বড় মারাত্মক। আমিও ওদের খৃস্টান বানাতে চাই, তবে আহত পশুর চামড়া তুলে নেয়ার জন্য তার দেহটা শীতল হওয়ার অপেক্ষা করা উচিত।'

ঃ 'আলামপনা!', জেমস বললেন, 'বেঁচে থাকার জন্য যারা আমাদের গোলামী কবুল করতে পারে, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে ওরা আমাদের ধর্মও গ্রহণ করবে। আপনি চুক্তির কথা বললেন, আমি জানি গোলামী করার জন্য কোন শর্তের দরকার পড়ে না। রাজা প্রজার চুক্তির মধ্যে রাজা যা বলবেন কেবল তাই কার্যকর হবে। রোম সম্রাট ইচ্ছে করলে সে সব চুক্তি থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারেন, যে চুক্তি যিশুর ধর্মের খেদমতে বাঁধা দেয়।'

বিরক্ত হয়ে ফার্ডিনেণ্ড বললেনঃ 'যারা সাগরে না সাঁতরে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে চায় তাদের আমি কী করে বুঝাব। আপনাকে কি নতুন করে বলতে হবে, মুসলমানরা ইহুদী নয়। তাদের পক্ষে রয়েছে স্পেনের চাইতে শক্তিশালী দেশসমুহ। আমরা তো তাদের কাছ থেকে গ্রানাডা ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু তুরস্ক ইউরোপের অর্ধেকটাই গিলে ফেলেছে। আমরা এখানে বাইরের দেশ দ্বারা আক্রান্ত হবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেইনি এ আমাদের বড় সফলতা। আমরা খুঁজে নিয়েছিলাম গ্রানাডার সেসব আভ্যন্তরীণ দুশমনকে, যারা নিজেদের স্বাধীনতার চাবি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। আবু আবদুল্লাহর উজিরকে দিয়ে যে কাজ করিয়েছি তা আমাদের সৈন্য দিয়ে সম্ভব ছিল না। সে আমাদের ক্ষতি করতে পারে আপনাদের এমন আশংকা ছিল, কিন্তু এখন মানুষ তার নামও ভুলে গেছে।

রাণী বলেছিলেন, আবু আবদুল্লাহ যে কোন মুহূর্তে বিগড়ে যেতে পারে। তিনি কয়েকবারই আমাকে আলফাজরায় সৈন্য পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানতাম, তাতে হাজার হাজার সৈন্য ক্ষয় হবে। সেখানে তুরস্ক এবং বারবারীদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল। আমার মনে হয়, লোক ক্ষয় ছাড়া আবু আবদুল্লাহর সমস্যা চুকে গেছে বলে আপনারা মোটেও সন্তুষ্ট নন।'

রাণীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে ফার্ডিনেণ্ড আবার বললেনঃ 'আবু

আবদুল্লাহকেও আলফাজরা ছাড়তে হল। এখন তাদের বিদেশী বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে যে, গ্রানাডার মত আলফাজরার লোকেরাও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। ওখানকার মুসলমানরাই আমাদের গোয়েন্দা। টলেডোর অনেকে আবুল কাসেমের আকস্মিক অন্তর্ধানে বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আবুল কাসেম কোথায় এ প্রশ্নও আমায় কেউ করেনি। শুনেছি আলফাজরার লোকজন তারও নাম ভুলে গেছে।

আমরা খামচে ধরেছি মুসলমানদের শাহরগ। দিন দিন তা শক্ত হচ্ছে। ওদের সাথে ইহুদীদের মত ব্যবহার করতে আপনাদেরকে হয়তো আরো কয়দিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিটি কাজের জন্য রয়েছে উপযুক্ত সময়।'

লা-জবাব হয়ে গেলেন জেমস। বললেনঃ 'মহামান্য সম্রাট, আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করলে তা হবে অকৃতজ্ঞতা। তবুও আমার মনে হয়, মিশনারী কাজকে আরো আকর্ষণীয় করা উচিত। মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে আপনার বিড়ম্বনা বাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং ওদের বুঝতে দিন যে, খৃষ্টবাদই ভবিষ্যত সুখ সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। এতে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।'

ঃ 'এ ব্যাপারে ফাদার ট্যালাভিরাকে কোন পরামর্শ দিলে আমি বরং খুশীই হব।'

ঃ 'ফাদারের সহযোগিতায় আমি এখানে কিছুদিন থাকতে চাই।'

ঃ 'আপনার সান্নিধ্যকে আমি গৌরবজনক মনে করব।' ট্যালাভিরা বলল।

সম্রাট রাণীর দিকে চাইলে তিনি বললেনঃ 'ফাদার জেমসের এ আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। গ্রানাডার কয়েকজন পাদ্রী আমার সাথে দেখা করেছেন। তারা বলেছেন, গ্রানাডার বিশপের সফলতার জন্য ফাদার জেমসের দোয়ার প্রয়োজন। আমার মনে হয়, কাউন্ট অব টেণ্ডেলারও এতে কোন আপত্তি নেই।'

গভর্ণর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেনঃ 'আমার কী আপত্তি থাকবে।'

ফার্ডিনেণ্ড বললেনঃ 'ফাদার জেমস, আপনার ইচ্ছের সম্মান না করে পারি না। কিন্তু বেশী তাড়াহুড়া করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না, যাতে সৈন্য সহ আমাকে আবার আসতে হয়।'

ঃ 'আলামপনা, আমায় বিশ্বাস না করলে আমি এখনি ফিরে যেতে প্রস্তুত। আমি টলেডোর বিশপের পদ থেকেও ইস্তফা দেব।'

রাণী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ 'না, না, পবিত্র পিতা। তা হয় না।'

ঃ 'ফাদার জেমস।' ফার্ডিনেণ্ড বললেন, 'এখানে থেকে যদি ধর্মের বেশী খেদমত করতে পারেন, আপনাকে নিষেধ করব না। কিন্তু আপনি ভাল করেই জানেন, স্পেনের সুখ সমৃদ্ধি বহুলাংশে এদের উপর নির্ভরশীল। কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এদেরই শ্রমের ফল! এরা যেখানে বসতি স্থাপন করে– অনুর্বর জমিতে বাতাসের দোলায় দুলতে থাকে ফসলের শীষ, ফলে ফুলে ভরে যায় বাগানগুলো। শান্তিপূর্ণভাবে এদের খৃষ্টবাদের দীক্ষা দিতে পারলে আমি খুশী হব। গ্রানাডা এবং আলফাজরার হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। যারা আছে তাদেরকে মনে করতে হবে রাষ্ট্রের মূল্যবান সম্পদ। এরাও যদি ভয় পেয়ে পালানো শুরু করে তাহলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। দেশ গরীব হয়ে গেলে গীর্জা শক্তিশালী হয় না।'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট, এ অভিযোগ করার সুযোগ আপনি পাবেন না।'

এ সভা সমাপ্তির পর ফার্ডিনেণ্ড রাণীকে একা পেয়ে বললেনঃ 'আমি তোমার খায়েশ অপূর্ণ রাখতে পারি না। খোদা করুন জেমস যেন তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করে। কিন্তু আমি তার উপর ভরসা রাখতে পারছি না।'

সাধারণ অবস্থায় পাদ্রীরা হয়ত ফর্ডিনেণ্ডের নির্দেশ অমান্য করার সাহস পেত না। কিন্তু জেমসের প্রতি ছিল রাণীর পূর্ণ সমর্থন। ফার্ডিনেণ্ড রাণীর আবেগপ্রবণ ফয়সালাগুলোর যদ্দুর সম্ভব বিরোধিতা করতেন। কিন্তু কোন ব্যাপারে রাণী জেদ ধরলে ফার্ডিনেণ্ড সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে যেতেন।

কয়েকদিন পর্যন্ত মুসলমানদের ব্যাপারে নিজের মনোভাব জেমস গোপন রেখেছিলেন। তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে গ্রানাডার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ফার্ডিনেণ্ড যখন সেভিলের পথ ধরলেন, বিশপ ট্যালাভিরার পক্ষ থেকে মুসলমান আলেম ওলামাদের দাওয়াত দেয়া হল। বলা হল, আমাদের এক সম্মানিত ব্যক্তি ফ্যান্সিসকো জেমস আপনাদের সাথে দেখা করতে চাইছেন। পরশু ভোরে তার বাসভবনে দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে আলেমরা জেমসের বাসভর্বনে সমবেত হতে লাগলেন। পরিচয় পর্ব শেষে আলোচনা শুরু হল। গ্রানাডার বিশপের সাথে সবাই মন খুলে আলাপ করত। কিন্তু জেমসের সাথে আলাপ শুরু করেই তারা বুঝলেন যে, জেমস অন্য দুনিয়ার বাসিন্দা। জেমস ইসলামের উপর খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করছিলেন। তার কণ্ঠ থেকে যেন আগুন

ঝরছিল। বৃদ্ধ ওলামারা কখনো তার কথার মারপ্যাঁচে হিমশিম খেতেন, কখনো মৃদু হাসার চেষ্টা করতেন, আবার কখনো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ তার সাথে তর্কে যাবার প্রয়োজন দেখলেন না। অনেকেই টলেডোর ভাষা জানতেন না। কিন্তু তার ধমক এবং গালাগালি বেশ বুঝতে পারছিলেন। জেমস মনের ঝাল প্রকাশ করে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। তার বিজয়ী দৃষ্টিরা ঘুরে ঘুরে ওলামাদের দেখতে লাগল।

মজলিশ নিরব হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সরব হতে লাগল এতোক্ষণকার নিস্তব্ধ পরিবেশ। একজন আরেকজনকে কাপুরুষ বলে অভিযুক্ত করল। ট্যালাভিরার এগিয়ে জেমসের কানে কানে কী যেন বললেন। চেঁচিয়ে উঠলেন জেমসঃ 'না, আমি নিজের ভাষায় কথা বলব। যারা এ ভাষা বুঝবে না, স্পেনে তাদের কোন মূল্য নেই।'

একজন স্বাস্থ্যবান সুশ্রী স্পেনিশ তরুণ দাঁড়িয়ে টলেডোর ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন। তার নাম জায়গারা। তার বক্তৃতা শুনে জেমস ক্রোধে আগুনের মত লাল হয়ে গেলেন। তিনি কয়েকবার বাঁধা দিতে চাইলেন। কিন্তু তরুণ বক্তার আওয়াজের নিচে হারিয়ে গেল তার শব্দ। তার বক্তৃতা শেষ হলে দু'হাত তুলে জেমস বললেনঃ 'তুমি এমন এক ধর্মের পক্ষে ওকালতি করছ, স্পেনে যার স্থান নেই। আমরা বিজয়ী, খৃষ্টবাদের সত্যতার এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? তোমাদের ধর্ম আমাদের গোলামী থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারেনি।'

আবার গর্জে উঠল তরুণঃ 'আমরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার শাস্তি পেয়েছি। আমরা শান্তির পথ ছেড়ে দিয়েছিলাম। যতদিন আমরা আল্লাহ এবং তার নবীর নির্দেশ মেনে চলেছিলাম, মানবতার সব অহঙ্কার ছিল আমাদের পায়ের নিচে। আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের সুখ সমৃদ্ধির অসংখ্য কাহিনী ছড়িয়ে আছে স্পেনের প্রতিটি প্রান্তে। কিন্তু আমরা এখন নাফরমান হয়ে গেছি। যুগের অন্ধ হাওয়া আমাদের ঘিরে ধরেছে। আমাদের শাস্তি শুরু হয়েছিল এ বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে। আমরা শহিদী মৃত্যুর চাইতে গোলামীকে প্রাধান্য দিয়েছি। আমরা এত অসহায়, আমাদের কেউ গালি দিলেও তার প্রতিবাদ করার অধিকার নেই।'

ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে জেমস বললেনঃ 'আমি এক আবেগপ্রবণ যুবকের সাথে তর্কে যেতে চাই না। তুমি একটু ধৈর্য ধর। সব শেষে তোমার সাথে কথা বলব।'

এক প্রবীণ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'এ যুবকের কথায় আপনি যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে আমরা সবাই ক্ষমা চাইছি। ভবিষ্যতে কোন মজলিশে আলেমদের বাছাই করে আনব। আশা করি বিতর্কে না গিয়ে জায়গারা নীরবে আপনার মূল্যবান কথা শুনবে।'

ঃ 'আপনাদের ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই।' জায়গারা বলল, 'আমি কোন অপরাধ করে থাকলে শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।'

অগ্নিঝরা দৃষ্টি নিয়ে যুবকের দিকে তাকালেন জেমস। অন্য একজন আলেম তার হাত ধরে ফিসফিস করে বললেনঃ 'খোদার দিকে চেয়ে একটু চুপ কর। ওতো একটা জানোয়ার। জানোয়ারের সাথে তর্ক করা যায় না।'

জেমস আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। এবার তার ভাষা পূর্বের চেয়ে অনেকটা মোলায়েম মনে হল। গ্রানাডার ওলামারা এই ভেবে খুশী হলেন যে, আমাদের এক যুবকের সাহসিকতা এই হিংসুটে পাদ্রীর মেজাজ ঠিক করে দিয়েছে।

মজলিশ ভেঙ্গে গেল। সবাই বেরিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু পাদ্রীর ইশারায় দৈত্যের মত এক সিপাই জায়গারার পথ রোধ করে দাঁড়াল। যুবক পাশ কেটে বেরিয়ে যেতে চাইলেন। সিপাইটা তার হাত ধরে বললঃ 'পবিত্র পিতার অনুমতি ছাড়া তুমি যেতে পারবে না।'

সঙ্গীদের কেউ কেউ জেমসের কাছে তার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু তার তেতো মেজাজ দেখে সবাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

জেমস জায়গারার শাস্তির দায়িত্ব দিলেন লিওনকে। এই পশু চরিত্রের লোকটি শাস্তি সেলের উদ্ভাবিত সব রকমের শাস্তির পদ্ধতি সম্পর্কে ছিল যথেষ্ট পারদর্শী।

প্রথম দিকে ওকে শুধু বেত্রাঘাত করা হত। রাতে শোয়ানো হতো ঠাণ্ডা বিছানায়। তার জন্য এমন একজন লোককে নিযুক্ত করা হল, যে তাকে এক মুহূর্তের জন্যও শুতে দিত না। রাতের গভীরে যখন তার হৃদয় ফাটা চিৎকারে চারদিক প্রকম্পিত হত, এ সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কক্ষে পাদ্রীদের অট্টহাসি ছাড়া তার সঙ্গী কেউ হত না।

দু'সপ্তাহ পর তাকে জেমসের সামনে হাজির করা হল। হাড় ছাড়া তখন তার দেহে কিছুই ছিল না। চোখ নেমে গিয়েছিল খাদে। দুর্গন্ধ আসছিল শরীরের ক্ষতস্থান থেকে।

জেমস অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেনঃ 'আমার সাথে

তর্ক করবে?'

ঃ 'না।' মাথা নেড়ে জবাব দিল জায়গারা।

ঃ 'শুনেছি তুমি খুব সাহসী।'

ঃ 'আমি মরতে রাজি, ফাঁসির হুকুম শুনলেও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু এ শাস্তি সইতে পারছি না। আপনি আমায় বুজদিল বলতে পারেন।'

ঃ 'কিন্তু তুমি তো এখনো মুসলমান।'

জায়গারা মাথা নিচু করল। লিওন বললঃ 'পবিত্র পিতা, আমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ও তওবা করেছে। এ খৃষ্টধর্মের এক মোজেযা।'

জেমস প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে জায়গারার দিকে তাকালেন। জায়গারার চেহারায় পরাজয়ের গ্লানি। ঈষৎ মাথা তুলে সে বললঃ 'আমার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে এমন চলতে থাকলে গ্রানাডায় একজন মুসলমানও থাকবে না। সহ্যেরও তো একটা সীমা থাকে। আমি যে এখনো বেঁচে আছি এতো এক অলৌকিক ব্যাপার।'

ঃ 'তোমার কষ্টের দিন শেষ হয়ে গেছে। ঈশ্বরের কাছে শোকর কর, আমরা তোমায় নরকের আগুন থেকে বাঁচাতে পেরেছি।'

ঃ 'খুশী আর দুশ্চিন্তা, আমাদের জন্য দুটি শব্দই সমান। এক সংকীর্ণ অন্ধকার কক্ষে আমি দোযখের আজাব প্রত্যক্ষ করেছি। আমি আবার সেখানে ফিরে যেতে চাই না।'

জেমস লিওনকে বললেনঃ 'ওকে নিয়ে যাও। ভাল খাবার দেবে, চিকিৎসার জন্য ভাল ডাক্তার দেখাবে। তবে দীক্ষা নেয়ার পূর্বে ওকে কোন মুসলমানের সাথে দেখা করতে দেবে না।'

জায়গারা ক্ষীণ কন্ঠে বললঃ 'দীক্ষা নিলে যদি প্রাণ ভরে ঘুমুতে পারি তবে আমি এখুনি দীক্ষা নিতে প্রস্তুত।'

ঃ 'না, যাদের সামনে সেদিন প্রতিবাদ করেছিলে, তাদেরকে খৃস্ট ধর্মের অলৌকিক শক্তি দেখাব। কিন্তু এ অবস্থায় তোমাকে তাদের সামনে উপস্থিত করা যাবে না। এখন বিশ্রাম করগে। লিওনকে তোমার সেবক মনে করবে।'

জেমস এক সপ্তাহ পর জায়গারাকে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। গ্রানাডার ওলামারা বিমূঢ়ের মত তাকিয়েছিল। ব্যাপ্টিস্ট 'রসম' শেষ করলে এক পাদ্রী গান ধরল। জেমসের ইশারায় জায়গারাও তাদের সাথে কণ্ঠ

মিলানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বের হল না তার। অত্যাচারিত ক্ষতবিক্ষত আত্মার ফরিয়াদ তার বুকে বিঁধে রইল। তার হতাশ দৃষ্টিরা সঙ্গীদের বলছিলঃ 'প্রিয় ভায়েরা! আমার দিকে তাকিও না। আমার এ দেহ আমার আত্মার কবর। এই অপমানকর পথে আমিই প্রথম পা বাড়িয়েছি। আমায় দেখে হয়ত থুথু নিক্ষেপ করবে। কিন্তু হায়! তোমরা যদি আমার ক্ষতস্থানগুলি দেখতে। আমায় হয়ত কাপুরুষ বলছ, কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে আমার হৃদয়খাঁচার চিৎকার কি কেউ শুনেছিলে? কেউ কি আমার শারীরিক মানসিক শাস্তি অনুমান করতে পারো?

সম্মানিত বন্ধুরা! আমি মরে গেছি। আমাদের সকলের মৃত্যু হয়েছে। আমরা মরেছি সেদিন, যেদিন জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। যেদিন শহীদ হয়েছিলেন হামিদ বিন জোহরা। মরেছি সেদিন, যেদিন আমাদের শেষ আশ্রয় গ্রানাডার দুয়ার শত্রুদের জন্য খুলে দিয়েছিলাম। এরপর শুরু হল জেমসের বক্তৃতা। এ বক্তৃতার ভাষা ছিল আগের চেয়ে অশালীন এবং কঠোর। শ্রোতাদের প্রতিবাদ ছিল কয়েক ফোটা অসহায় গোপন অশ্রু।

পাদ্রীদের রাজত্ব

পর দিন গ্রানাডার গভর্ণর এবং আর্ক বিশপ জেমসকে বুঝিয়ে বললেন যে, এত তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। মুসলমানরা উত্তেজিত হলে পরিণতি হবে বিপজ্জনক। কিন্তু এই মাথা পাগল পাদ্রী জবাব দিলঃ 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজনৈতিক সহনশীলতা দরকার। কিন্তু ধর্ম বিলম্ব সহ্য করে না।'

দু'দিন পর অন্যান্য পাদ্রীদের সাথে নিয়ে জেমস আলবিসিনের পথ ধরলেন। গভর্ণরের পক্ষ থেকে তাদের হেফাজতের জন্য দেয়া হল দু'শ সশস্ত্র সিপাই। এরা যখন আলবিসিনের জামে মসজিদে প্রবেশ করল, দরজার সামনে কাতার বেঁধে দাঁড়াল প্রহরীরা। একটু পর বনের আগুনের মত গ্রানাডার প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল যে, আল্লাহর ঘরকে গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। গীর্জায় স্থাপন করা হয়েছে যিশু এবং মেরীর মূর্তি।

বিদ্রোহের আশংকায় গভর্ণর আরো নতুন সৈন্য পাঠালেন। যারা মসজিদের দিকে যেতে চাইল ওদের সামনে বল্লমের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দাঁড়িয়েছিল সিপাইরা।

মসজিদ কব্জা করে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার জন্য জেমস সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। একদিন পাদ্রীরা পুলিশের সহায়তায় স্পেনিশ মুসলমানদের এক হাজার লোককে জেমসের সামনে নিয়ে এল। তাদের দীক্ষা দেয়া হল নাঙ্গা তলোয়ারের প্রহরায়।

কয়েক ব্যক্তি প্রতিবাদ করেছিল, সিপাইরা তাদের পাঠিয়ে দিল কয়েদখানায়। সঙ্গীদের কারো মুখ খোলার সাহস হল না। পরবর্তী লজ্জাস্কর ঘটনা বর্ণনা করতে খৃস্টান ঐতিহাসিকদের মাথাও লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়।

জেমস খৃস্টধর্মের প্রসারের পথে মুসলমানদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সবচেয়ে বড় অন্তরায় মনে করলেন। এ জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল মুসলমানদের গর্বের বস্তু। সরকার নিয়ন্ত্রিত লাইব্রেরীগুলো দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাদিতে পূর্ণ ছিল। প্রত্যেকের বাড়িতেই ছিল ব্যক্তিগত পাঠাগার। কোরান শরীফ ছাড়াও সেখানে পাওয়া যেত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর গ্রন্থাদি।

আরবী ভাষার যে কোন বইকেই জেমস খৃস্টবাদের ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক মনে করতেন। এসব গ্রন্থাদির বিরুদ্ধে শুরু হল তার অভিযান। এজন্য যাদের জোর করে খৃস্টান বানানো হয়েছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। আরবী ভাষার প্রতিটি কিতাব গীর্জায় জমা দেয়ার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল। যে অপারগতা এসব হতভাগাদের খৃস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিল, সে একই কারণে তাদেরকে জেমসের নির্দেশ পালন করতে হল।

তাদের কাছে পাওয়া গ্রন্থাদি এক চৌরাস্থায় জমা করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। এ ঘটনার পর বেড়ে গেল জেমসের দুঃসাহস। গ্রানাডার গভর্ণর মাথা পাগলা পাদ্রীর এ কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু রাণীর লোককে তিনি চটাতে চাইলেন না। ফার্ডিনেণ্ড মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি জানতেন রাণীকে চটিয়ে তিনি গ্রানাডার গভর্ণর থাকতে পারবেন না। সুতরাং তিনি ফৌজি অফিসারদের বললেনঃ ‘আমি জানি একরোখা এ পাদ্রী আগুন নিয়ে খেলছে, কিন্তু সে রাণীর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। তার সহযোগিতা এবং হেফাজত করা আমার প্রথম দায়িত্ব।’

জেমস মুসলমানদেরকে জোর করে খৃস্টান বানানো শুরু করল। তল্লাশী

নিতে লাগল প্রতিটি বাড়িতে এবং লাইব্রেরীতে। বাধ্য হয়ে পুলিশ এবং ফৌজকে তার সাহায্যে ময়দানে আসতে হল। ঘোষক প্রতিটি মহল্লায় ঢেঁড়া পিটিয়ে দিতঃ 'নিজের বাড়িতে রক্ষিত সমস্ত কিতাব স্বেচ্ছায় গীর্জায় এনে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র আপত্তিকর গ্রন্থগুলো রেখে বাকীগুলো ফিরিয়ে দেয়া হবে। অমুক তারিখের পর ঘরে ঘরে তল্লাশী নেয়া হবে। কারো কাছে আপত্তিকর কোন কিতাব পাওয়া গেলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।'

লোকজন স্বেচ্ছায় হাজার হাজার বই গীর্জায় এনে জমা দিল। হাজার হাজার কিতাব জোর করে ছিনিয়ে নেয়া হল। সশস্ত্র ব্যক্তিরা কারো বাড়িতে প্রবেশ করলে তারা কোরান শরীফ লুকানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু জেমস সবচেয়ে আপত্তিকর মনে করত এ কিতাবটিকে।

প্রতিবাদ করত মুসলমানরা। এর প্রতিকার নারীদের চিৎকার আর পুরুষের নীরব অশ্রু ছাড়া কিছুই ছিল না। এসব কিতাব গরুর গাড়িতে করে এক বিশাল প্রাসাদে পৌঁছে দেয়া হত। এই অট্টালিকাটি আগে মাদ্রাসা ছিল, এখন গীর্জার হেড অফিস। এখানে হাজার হাজার পাদ্রী গ্রন্থরাজির বাছাই করতে লাগল। জেমস ব্যক্তিগতভাবে এর দেখাশোনা করতেন। কোরান শরীফ খুঁজে বের করা ওদের জন্য কষ্টকর ছিল না। কোন কিতাবের উপর ঝকঝকে গেলাফ দেখলে না পড়েই ওরা বুঝতে পারত যে এটি কোরান শরীফ। এগুলো ছুঁড়ে ফেলা হত একদিকে। এরা আরবীকে মুসলমানদের ভাষা মনে করতো এবং সে জন্য আরবী ভাষার যে কোন বই-ই ছিল ওদের কাছে আপত্তিকর।

এক ভোরে ঘুম থেকে উঠে লোকেরা দেখল শহরের চৌরাস্তায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পবিত্র কোরান এবং অন্যান্য কিতাবপত্র নিয়ে একের পর এক গরুগাড়ি আসতে লাগল। এসব গ্রন্থরাজি জমা করা হচ্ছিল অগ্নিপিণ্ডের কাছে। এরপর সশস্ত্র প্রহরায় পাদ্রী এগিয়ে এসে দু'হাতে কিতাবপত্র আগুনের মাঝে ছুঁড়তে লাগলেন।

চিৎকার দিয়ে এক যুবক বললঃ 'মুসলমান! হামিদ বিন জোহরা যে বর্বরতা আর অত্যাচারের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, এ হচ্ছে তার সূচনা। আমাদের শাস্তি শুরু হয়েছে। আমাদের সামনেই জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে কোরান-হাদীস এবং পবিত্র সব গ্রন্থরাজি। ছাইয়ের স্তুপ দেখে ভেবোনা গীর্জার আগুন নিভে গেছে। স্পেনের প্রতিটি শহরে এভাবে আগুন জ্বালানো

হবে। আজ যে অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তোমরা আল্লাহর কিতাব জ্বলতে দেখছো তার চেয়ে অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তোমাদের মেয়েরা তাদের ভাই এবং স্বামীদের, তোমাদের নিষ্পাপ শিশুরা তাদের পিতামাতাকে আগুনে ছাই-ভস্ম হতে দেখবে।'

আলহামরার এক বিশাল কক্ষ। গভর্ণর এবং গ্রানাডার বিশপ গত রাতের ঘটনা নিয়ে আলাপ করছিলেন। বিশপ বললেনঃ 'আপনার পাঠানো সংবাদ পেয়ে আমি ফাদার জেমসের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তখনো ঘুমিয়ে। তার চাকর বলল, চারটা নাকে-মুখে দিয়েই তিনি শুয়ে পড়েছেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলেই এখানে পাঠিয়ে দিতে তাগিদ দিয়ে এসেছি। আমি তো ভেবেছিলাম, এরই মধ্যে তিনি আপনার সাথে দেখা করেছেন।'

ঃ 'তিনি যে ঘুমিয়ে আছেন এ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। হয়তো শহরের পরিস্থিতির সংবাদ পেলে আমাদের জন্য আরেক মুসিবত দাঁড় করাতেন।'

গভর্ণর মিণ্ডোজা উঠে পায়চারী শুরু করলেন। এক অফিসার এসে বললঃ 'জনাব, ফাদার জেমস আসছেন।'

গভর্ণর চেয়ারে বসে বিশপকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আমার মনে হয় তার সাথে তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাদশাহ এবং রাণী সেভিল থেকে টলেডো রওনা হয়ে গেছেন। নয়তো আমি নিজেই তার কাছে চলে যেতাম।'

জেমস কক্ষে প্রবেশ করে বললেনঃ 'মাফ করুন। আজ বেশ ঘুমিয়েছি। কোন জরুরী কথা হলে ফাদার ট্যালাভিরা আমায় জাগিয়ে দিলেই পারতেন।'

ঃ 'আপনার শরীর কেমন?' গভর্ণর প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'ভাল। আমার মাথা থেকে এক বোঝা নামল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

ঃ 'আপনাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমে এক বিশাল অগ্নিপিণ্ড তৈরি হয়েছিল। আলহামরা থেকেও দেখেছি সে আগুনের লেলিহান শিখা।'

ঃ 'গীর্জার এ সাফল্য আপনার সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব ছিল না। আমি রাণীকে লিখব যে, আপনার প্রতিটি সিপাই পুরস্কার পাবার উপযুক্ত। কিন্তু এখনো আমার কাজ শেষ হয়নি। মুসলমানরা এখনো অনেক কিতাব লুকিয়ে রেখেছে। কোন কোন ঘরে কোরানও থাকতে পারে। আপনার সহযোগিতা পেলে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, বাদশাহ এবং রাণী

আবার এলে গ্রানাডায় আরবী ভাষার একটা বইও থাকবে না।'[১]

ঃ 'একান্ত অপারগ হয়েই আপনার সাহায্য করতে হচ্ছে।'

ঃ 'তার মানে আমার কাজে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি? আমি তাড়াহুড়া করছি বলে আপনি আপত্তি করেছিলেন। আমরা শুধু কিতাবই পুড়িনি, বরং প্রমাণ করেছি যে, তাদের ধর্মের চাইতে আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। তাদের লুকানো কিতাব নিয়ে আমি ততো পেরেশান নই। আপনি তো দেখেছেন এদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন কোন ফৌজ ছাড়াই নিশ্চিন্তে ওদের প্রতিটি ঘরে তল্লাশী করা যেতে পারে। গ্রানাডার মুসলমানরা ছিল আমাদের পথের শেষ বাঁধা। সরকার এদের ভয়েই জোরেশোরে কোন ধর্মীয় পদেক্ষপ নিতে পারছেন না। আমি প্রমাণ করেছি, তিনি ভুলের মধ্যে ছিলেন।

অতীত ছিল স্পেনের মুসলমানদের গর্ব। বুকের সাথে জড়িয়ে রাখা কিতাবগুলো অতীতের সাথে তাদের সম্পর্ক ধরে রেখেছিল। কিন্তু সে সম্পর্ক আমরা ছিঁড়ে ফেলেছি। তাদের অহংকার ডুবিয়ে দিয়েছি কোরানের ভস্মস্তুপের নিচে।'

ঃ 'আপনি কি সে ছাইয়ের স্তুপ দেখেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। আগুন নিভে গেলেও ছাই তখনো গরম ছিল।'

ঃ 'রাতে আপনি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, মুসলমানরা তখন কি করেছে জানেন?'

ঃ 'কাউকে তা জিজ্ঞেস করিনি। বিছানা থেকে সোজা এখানে এসেছি। আমার বিশ্বাস শহরে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।'

ঃ 'এ সংবাদটা দেয়ার জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। ক্লান্ত সিপাইরা যখন সেখান থেকে সরে এসেছিল মুসলমানরা তখনো চৌরাস্তায়। ভোরে দেখা গেল ছাইয়ের স্তুপ গায়েব হয়ে গেছে।'

ঃ 'ছাই গায়েব হয়েছে মানে?' জেমস আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি

---

[১] একজন আধুনিক ঐতিহাসিক হেনরি কামান (HENRY KAMAN) তার লেখা 'স্পেনিশ ইনকুইজিশন'-এ (SPANISH INQUISITON) লিখেছেন, জেমসের নির্দেশে গ্রানাডার দশ লাখ পাঁচ হাজার গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এ সংকীর্ণমনা পাদ্রী কেবলমাত্র চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, রসায়ন এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রায় তিনশত বই 'আলকিল্লা' বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলেন।

করে সম্ভব?'

ঃ 'আপনার সৌভাগ্য, শহরের পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত তখন আপনি ঘুমিয়েছিলেন।'

ঃ 'ওরা কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করলে ফৌজ ময়দানে নিয়ে এলেই হতো!'

ঃ 'ওরা কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। আর ফৌজকে আপনি এতটা ক্লান্ত করে দিয়েছিলেন যে, ওরা অশান্তি করলেও ফৌজ কিছু করতে পারত না।'

ঃ 'তাহলে কিসের জন্য আপনার এত উদ্বেগ?'

ঃ 'আগুন নিভে যাওয়ার পর আপনি যখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলেন, ছাই তুলে নিয়ে ওরা তখন নদীর পথ ধরেছিল। ওরা ছাইয়ের স্তুপ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। ওদের বুকের আগুনের তপ্ততা আমি এখানে থেকেও অনুভব করেছি। এ আগুন নেভানোর জিম্মা কেবল আমাকেই দেয়া হবে, এ জন্যেই আমি উৎকণ্ঠিত।'

অস্থিরতা লুকানোর চেষ্টা করে জেমস বললেনঃ 'ফটকের প্রহরীরা ওদেরকে নদীতে যেতে দিল কেন?'

ঃ 'প্রহরীরা জানে, মৃত্যু-ভয় শূন্য হাজার হাজার মানুষকে ওরা বাঁধা দিতে পারবে না। শহর শান্ত রাখাই ওদের প্রধান দায়িত্ব। ওদের তখনকার আবেগকে কেউ কাজে লাগায়নি এটা আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে। নইলে আমরা মস্ত বড় বিপদে পড়তাম। আপনি যে আমার জন্য আরো কত সমস্যা সৃষ্টি করবেন জানিনা, জানিনা এর ফলে পার্বত্য কবিলাগুলোর প্রতিক্রিয়া কি হবে, অনেকে শহরে না এসে আলফাজরার দিকে চলে গেছে। আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কয়েক দিন একটু চুপ থাকুন। এটি হবে রাষ্ট্রের প্রতি আপনার অনুগ্রহ। বাদশাহ এবং রাণী আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করেন। একবার জয়লাভের পর শুধু শুধুই আবার আমরা নতুন করে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে চাইনা।'

ঃ 'গীর্জার খাদেম রাষ্ট্রের দুশমন নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার কোন কাজ আপনার উৎকণ্ঠার কারণ হবে না।'

ঃ 'ধন্যবাদ। রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি, এবার একটু ঘুমুতে চাই।'

গভর্ণর অন্য কক্ষে চলে গেলেন। জেমস ট্যালাভিরাকে বললেনঃ 'কষ্ট না হলে আমার সাথে চলুন। এখন প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার পরামর্শ দরকার।'

এক সপ্তাহ চলে গেছে। শহরে কোন অঘটন ঘটেনি। কিন্তু মসজিদগুলো আরো বেশী করে সাজানো হয়েছে।

গ্রানাডায় কোরানে হাফেজের অভাব ছিল না। সকাল সন্ধ্যা প্রতিটি অলিগলি থেকে ভেসে আসতে লাগল কোরানের সুললিত সুর। গীর্জার গোয়েন্দা দল মুসলমানদের মসজিদ এবং মাদ্রাসায় ঢুকে যেত। জেমসকে এসে বলতঃ 'পবিত্র পিতা! মুসলমানদের সাহস বেড়ে গেছে। মসজিদগুলোতে সারা রাত কোরান পড়া হয়। অমুক মসজিদে শিশু কিশোররা কোরান তেলাওয়াত করছে। সেই তেলাওয়াত শুনে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে হাজার হাজার লোক। পুরুষের মত কোরান মেয়েদেরও কণ্ঠস্ত। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওরা ছোট ছোট বাচ্চাদের কোরান শিখাচ্ছে। পবিত্র পিতা! কিতাব পুড়িয়েও তাদের হৃদয় থেকে কিতাবের মহব্বত কমাতে পারেননি। এ কিতাবকে ওরা খোদায়ী কালাম মনে করে। কোরান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কত কিতাব ওদের মুখস্ত।'

জেমস শুনে দাঁতে দাঁত পিষলেন। যাদের খৃস্টান করা হয়েছে তারা আবার তওবা করেছে, এখানেই তার বড় কষ্ট। চুক্তি মতে ফার্ডিনেণ্ড তাদের এ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন যে, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর কেউ স্বধর্মে ফিরে গেলে সে 'দমন সংস্থার' আওতায় আসবে না।

গীর্জার অধিকার খর্ব করে, জেমস এমন কোন চুক্তি মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, একবার দীক্ষা নিলে সে চির জীবন খৃস্টানই থাকবে। ধর্ম ত্যাগ করলে 'দমন সংস্থা' তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাতে বাধ্য। দমন সংস্থার সচিবের কাছ থেকে জেমস এসব লোকদের গ্রেফতার করার অনুমতি আদায় করলেন। গ্রানাডার যেসব লোক ভেবেছিল ফার্ডিনেণ্ড চুক্তির বাইরে যাবেন না, এরপর তারা দেখতে পেল অত্যাচারের নতুন যুগ।

ধর্মান্তরিত হবার পর যারা আবার স্বধর্মে ফিরে গিয়েছিল জেমস প্রথম তাদের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। তাদের গ্রেফতার করে শাস্তি সেলে পাঠিয়ে দেয়া হতো। এরপর গীর্জার ইচ্ছে মত তাদেরকে আদালতের সামনে পাদ্রীর শিখিয়ে দেয়া জবানবন্দী দিতে হতো।

কিছুকাল সরকার মুসলমানদের মানসিক উৎকণ্ঠা টের পায়নি। কোন পাদ্রী চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ইসলামকে গালাগালি করলে অথবা তাদের পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করলেও কোন মুসলমান বাঁধা দিত না। জেমস

এ জন্য মনে মনে সন্তুষ্ট ছিলেন।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনও বাঁধার সম্ভাবনা থাকলে গভর্ণর নিশ্চয়ই এ উম্মাদ পাদ্রীকে বাঁধা দিতেন। কিন্তু কেউ ভাবতেও পারেনি, নিভু নিভু ছাইয়ের স্তুপে লুকিয়ে ছিল জ্বলন্ত অঙ্গার।

হঠাৎ একদিন এমন এক ঘটনা ঘটল যা কেউ কল্পনাও করেনি। একদিন দু'জন খৃস্টান একজন মুসলমান মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। দু'জনের একজন ছিল জেমসের চাকর, অন্যজন ফৌজি কর্মচারী। ওরা যখন আলবিসিনের চৌরাস্তায় এল, বালিকার চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এল।

মেয়েটি চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আমার ভাইয়েরা, আমি এক মুসলিম বালিকা। এ খৃস্টানরা আমাকে জোর করে ধর্মান্তরিত করতে চায়। এ জালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন! তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখছ? তোমাদের বিবেক কি মরে গেছে?'

কয়েকজন যুবক এগিয়ে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ভীড় বেড়ে গেল। এক যুবক বুঝাতে চাইল সিপাইদের। তখনো মেয়েটি ওদের হাতের মুঠোয়। একজন মুসলমানদের গালাগালি করতে লাগল। ভীড়ের মধ্যে কেউ একজন তার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারল। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে ছুটে পালাল জেমসের চাকর।

এরপর একজন অনলবর্ষী বক্তা বক্তৃতা করলেন। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মিছিল ছুটল জেমসের বাসভবনের দিকে। ততোক্ষণে গভর্ণর মিণ্ডোজার কাছে এ সংবাদ পৌছে গেছে। তিনি আলহামরা থেকে কয়েক প্লাটুন সিপাই জেমসের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

বিক্ষুব্ধ জনতা সারারাত জেমসের বাড়ি অবরোধ করে রাখল। গভর্ণর ভোরে নতুন ফৌজ নিয়ে সেখানে পৌছলেন। মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হল। কিন্তু শহরের পরিস্থিতি শান্ত হলনা। মুসলমানরা দল বেঁধে দিন-রাত শহরে টহল দিতে লাগল। কোন খৃস্টান অথবা পাদ্রী তাদের সামনে আসার সাহস পেল না।

গভর্ণর দূত মারফত মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। বাইরে থেকে ফৌজ ডেকে তাদের শাস্তি দেয়ার ভয় দেখানো

হল। বলা হলঃ ‘স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার না করলে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।’

মুসলমানরা জবাব দিলঃ ‘এ বিপর্যয়ের জন্য আমরা দায়ী নই। যারা সন্ধির শর্তবিরোধী কাজ করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার তাদের শায়েস্তা না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত এ চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের কর্তব্য। সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিলেই কেবল পরিস্থিতি শান্ত হতে পারে।’

গ্রানাডার বিশপ সাহস করে কয়েকজন পাদ্রী এবং নিরস্ত্র সিপাই নিয়ে বাবুন্নবুওতে গিয়ে পৌছলেন। তাঁকে দেখেই মুসলমানদের শ্লোগান থেমে গেল। তিনি যখন নেতাদের সাথে আলাপ করছেন, কয়েকজন তীরন্দাজ নিয়ে ওখানে পৌছলেন গভর্ণর। তীরন্দাজদের একটু দূরে রেখে তিনি মিছিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে এসে নিজের টুপি খুলে মাটিতে রাখলেন। এর অর্থ তিনি এসেছেন সন্ধির জন্য।

একজন প্রবীণ ব্যক্তি টুপি তুলে নিলেন। ধূলোবালি ঝেড়ে তাকে ফিরিয়ে দিলেন টুপি। যারা হাতিয়ার ত্যাগ করবে গভর্ণর তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন।

ঃ ‘আমি জানি তোমরা বিদ্রোহী নও। তোমরা চাইছ ভবিষ্যতে যেন চুক্তি বিরোধী কোন ঘটনা না ঘটে। কথা দিচ্ছি, তোমরা আর কখনো কোন অভিযোগ করার সুযোগ পাবে না।’

এক যুবক এগিয়ে বললঃ ‘আপনি এ জিম্মা নিন যে, ভবিষ্যতে আমাদের জোর করে খৃস্টান বানানো হবে না। আর গ্রানাডায় দমন সংস্থার শাস্তি সেলের শাখা বন্ধ করে দিতে হবে। জেমসকে দেয়া চুক্তি বিরোধী সব অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে।’

ঃ ‘গ্রানাডায় শান্তি রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। আমার বিশ্বাস প্রতিটি পদক্ষেপেই আমি বাদশাহ এবং রাণীর সমর্থন পাব। তিনি যখন বুঝবেন জেমস চুক্তি বিরোধী কাজ করার পরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন। আমার দূত রওনা হয়ে গেছে। আশা করি, সে জবাব নিয়ে তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। তোমাদের আশ্বস্ত করার জন্য আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে রাজী আছি।’

গভর্ণরের এ ঘোষণায় উত্তেজিত জনতা কিছুটা শান্ত হল। আলোচনা করে স্থির করা হলো যে, গভর্ণরের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা থাকবে

মুসলমানদের হেফাজতে আর মুসলমানদের চারজন নেতৃস্থানীয় নেতা যাবেন গভর্ণরের সাথে।

গভর্ণর যখন যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এক প্রবীণ ব্যক্তি এগিয়ে বললেনঃ 'আপনার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের এখানে রেখে না গেলেও আপনাকে আমরা অবিশ্বাস করি না। এ স্থান তার সম্মানের উপযুক্ত নয়। আপনি তাদেরকে সাথে নিয়ে নিন।'

গভর্ণর বললেনঃ 'আলহামরার চেয়ে এ স্থান ওদের জন্য বেশী নিরাপদ। যে বীর জাতি আটশ বছর এদেশ শাসন করেছে তাদের প্রতি এটুকু আস্থা আমার অবশ্যই আছে যে, তারা আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভালভাবেই হেফাজত করতে পারবে। আমার এ আস্থার প্রমাণ হিসেবেই আমি ওদেরকে আপনাদের হাতে তুলে দিতে চাই। আর আমার সাথে আপনাদের যে চারজন নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি যাচ্ছেন, আমি কথা দিচ্ছি, ওদের সাথে কয়েদীর মত ব্যবহার করা হবে না। শহর শান্ত হলেই ওদের ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

হাঙ্গামার সময় নিজের বাড়িতে নজরবন্দীর মত ছিলেন জেমস। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার পর তিনি রাণীর কাছে একজন দূত পাঠালেন। কিন্তু তার দূত পথে থাকতেই গভর্ণরের দূত সম্রাটের কাছ থেকে জেমসের নামে চিঠি নিয়ে হাজির হল।

বিগত তৎপরতার কারণে জেমস ফার্ডিনেণ্ডের কাছে কোন ভাল ব্যবহারের আশা করেননি। কিন্তু বাদশাহর সাথে রাণীও তাকে অপরাধী বলবেন এমনটি তার ধারণা ছিল না। সুতরাং তিনি নিজে টলেডো যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এক সপ্তাহের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি টলেডো পৌঁছলেন। রাণীর সাথে সেদিনই তার সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু দু'দিন পর্যন্ত ফার্ডিনেণ্ড তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন না। রাণীর অক্লান্ত চেষ্টায় তৃতীয় দিন ফার্ডিনেণ্ডের সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হল। সাক্ষাত অনুষ্ঠানে দমন সংস্থার সচিবও উপস্থিত রইলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত ফার্ডিনেণ্ড মনের ঝাল ঝাড়লেন। জেমস মাথা নুইয়ে বসে বসে সব শোনলেন।

ফার্ডিনেণ্ডের ক্রোধ পড়ে এলে তিনি বললেনঃ 'আলীজাহ, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আপনাকে এ সুসংবাদ দিতে পারি যে, আমি সফল। আপনি এখন মুসলমানদের সাথে যে কোন চুক্তি থেকে মুক্ত। মুসলমানদের

ন্যূনতম প্রতিরোধ শক্তি থাকলে আমি এ ঝুঁকি নিতাম না।

গ্রানাডার গভর্ণর আপনাকে বিদ্রোহের যে সংবাদ দিয়েছেন তা ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু হাঙ্গামা। গভর্ণরের নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে তারা আমার বাড়ি আক্রমণ করেছিল। তাদের এ বিদ্রোহী সুলভ কাজে এখন আপনি চুক্তির সব শর্ত থেকে মুক্ত। এখন খৃস্টান হওয়া অথবা স্পেন ছেড়ে যাওয়া ছাড়া ওদের সামনে বিকল্প কোন পথ নেই। আপনি এত শীঘ্র চুক্তি মুক্ত হয়েছেন একে আমি খৃস্ট ধর্মের কেরামতি মনে করি। আমি ভাবতাম, কর্তব্য শেষ না করেই যদি আমরা মরে যাই ঈশ্বরের কাছে কী জবাব দেব? আগামী প্রজন্ম কী ভাববে আমাদের। এ মুসলমানরাই কি স্পেনে আটশো বছর শাসন করেনি? গ্রানাডা রক্ষার জন্য এরাই তো আমাদের সাথে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে।'

রেগে গেলেন ফার্ডিনেণ্ড।

ঃ 'আপনি কি জানেন, দশ বছরের কাজ দশ মাসে করার চেষ্টা করলে আমাদের পরিণতি কি হত? গ্রানাডা জয় করেছি সাত বছর হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটেনি। অথচ কয়েক সপ্তাহে আপনি সেখানে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন, হয়তো আমাদেরকে আবারো লড়াইয়ের ঝুঁকি নিতে হবে। আপনি সরাসরি আমার নির্দেশ অমান্য করেছেন। ওদের জোর করে খৃস্টান বানিয়ে এবং ওদের ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে উল্টো অভিযোগ করছেন যে, ওদের বুকে ঘৃণার আগুন জ্বলছে। স্পেন হবে এক বিশাল সাম্রাজ্য যাকে নিয়ে গীর্জা গর্ব করবে। কিন্তু আপনি আমায় সে সুযোগ দিচ্ছেন না। শান্তি প্রিয় লোকদের আপনি উসকে দিয়েছেন। গ্রানাডার গভর্ণর শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়ে আপনার হিফাজত করেছেন, এ আপনার সৌভাগ্য। বুদ্ধি খরচ করে তিনি পরিস্থিতি শান্তও করেছেন। নইলে এতদিনে সমগ্র সালতানাতে এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ত।'

ঃ 'আলীজাহ, ওরা মনেপ্রাণে খৃস্টান হয়ে যাবে বিশ্বাস থাকলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। 'চুক্তি' তাদের আর আমাদের মাঝে দুর্লঙ্ঘ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হয়, তাদেরকে ধর্মান্তরিত করতে হলে এ দেয়াল উপড়ে ফেলা উচিত। ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দিয়েছেন, যে কোন সময় ওদের আপনি শায়েস্তা করতে পারেন।'

রাণী জেমসের পক্ষ সমর্থন করে বললেনঃ 'গ্রানাডার ব্যাপারে আমিও উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু ফাদার জেমস আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন।

আপনি গভীরভাবে ভাবলে বুঝতে পারবেন, ঈশ্বর আমাদের সহায়। সদা প্রভুর সন্তুষ্টির অন্তরায় কোন চুক্তি মেনে চলা ঠিক নয়। যুদ্ধের সময় গীর্জার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এখন তা মেনে চলা দরকার। মুসলমানরা খৃস্টান হয়ে গেলে তা হবে আমাদের সবচেয়ে বড় বিজয়। ভবিষ্যত ইতিহাস আমাদের অত্যাচারী না বলে বরং আমাদের প্রশংসা করবে। ওরা দেশ ত্যাগ করলে আমাদের সান্ত্বনা থাকবে যে, স্পেনের মাটি ওদের অস্তিত্ব থেকে পবিত্র। ফাদার নিশ্চুপ কেন? কিছু বলছেন না যে?'

ঃ 'মহামান্যা রাণী ও মহামান্য সম্রাটের অনুমতি পেলে বলবো, টলেডো আর আরাগুনের তরবারী আমাদের জন্য বিজয়ের যে পথ খুলে দিয়েছিল, ফাদার জেমসের চেষ্টা সে পথ প্রশস্ত করেছে মাত্র। তার কাজে আমি গর্ব করতে পারি। তিনি সম্রাটকে দুশমনের সত্যিকার চেহারা খুলে দেখিয়েছেন। যে চুক্তি গীর্জার ইচছা পূরণের অন্তরায় ছিল তিনি তা দূর করেছেন। স্বীকার করি, তার প্রতিটি কাজে আমার অনুমোদন ছিল। সম্রাটকে জিজ্ঞেস না করেই তাকে দমন সংস্থার আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছিলাম আমি। এ জন্য আমি যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত।' বললেন ফাদার মিণ্ডোজা।

ঃ 'ফাদার মিণ্ডোজা! গীর্জার ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করছি না। আপনাদের কারণে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হলে তার দায় দায়িত্ব আপনাদেরকেই বহন করতে হবে।'

ঃ 'আলামপনা, হুকুমত গীর্জার সহযোগিতা করলে আপনার রাষ্ট্রের কোনই ক্ষতি হবে না। খৃস্টবাদের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথেই গীর্জার সহযোগিতা থাকবে। শুধু স্পেনের নয়, আপনি সমগ্র ইউরোপের গীর্জার সমর্থন পাবেন।'

ফার্ডিনেণ্ড কতক্ষণ রাণী, জেমস এবং মিণ্ডোজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে বললেনঃ 'আজ থাক, আমাকে আরো দু'দিন ভাবতে হবে। আশা করি আমার কোন ফয়সালা গীর্জা বিরোধী হবে না।'

গ্রানাডার মুসলমানগণ খুব খুশী। তারা ভাবলো, গভর্ণরের অনুরোধে ফার্ডিনেণ্ড জেমসকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। তারা গভর্ণরের ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে দিল। চারজন কয়েদীর সমস্যা ছেড়ে দিল সরকারের হাতে

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় ওরা খবর পেল জেমস পুনরায় ফিরে

এসেছে। পরদিন ভোরে নেতৃস্থানীয় সেই চারজন মুসলিম বন্দীকে ওরা দেখতে পেল এক বিশাল ময়দানে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়। শহরের অলিগলিতে সশস্ত্র সিপাইরা টহল দিচ্ছে। মুসলমানদের ভয়ার্ত চিৎকার আটকে রইল তাদের বুকের মধ্যে।

যেখানে কিতাব পোড়ানো হয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে জেমস ঘোষণা করলেনঃ 'মুসলমানগণ, হয় খৃষ্টান হও, আর নয় শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।'

গোয়েন্দারা যাদের উপর বিদ্রোহে উসকানির অভিযোগ এনেছিল, তারা গ্রেফতার হতে লাগল। তারপর এল সে সব আলেম ওলামাদের পালা, খৃস্টবাদের পথে যারা ছিল সবচে বড় অন্তরায়। এরপর সমগ্র স্পেনে চলতে লাগল জুলুম অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা।

অল্প কয়েক দিনেই জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলো হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষে ভরে উঠল। মসজিদে গমনকারী মুসুল্লীদের হত্যা করা হত পথের মধ্যে। নেতৃস্থানীয় লোকদের খোঁজা হত প্রতিটি অলিগলিতে। ছিনিয়ে নেয়া হত অস্ত্রশস্ত্র। যারা তখনও কোরান শরীফ লুকিয়ে রেখেছিল, তাদের পাঠিয়ে দেয়া হত শাস্তি সেলে। মুসলমানরা আড়ালে আবডালে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলাপ করত। কিন্তু কোন খৃস্টানের সামনে একথা বলতে স্যাহস পেতনা যে, তোমাদের সরকার শর্ত মেনে চলার শপথ করেছেন, কিন্তু এখন চুক্তি বিরোধী কাজ করছেন।

মুসলমানরা উপলব্ধি করলো, গ্রানাডা এখন আর তাদের স্বদেশ নয়, গ্রানাডা হিংস্র হায়েনার চারণ ভূমি। একজন অন্যজনকে প্রশ্ন করত, গ্রানাডার গভর্ণর কোথায়? কোথায় বিশপ ট্যালাভিরা! এ আমাদের কোন পাপের শাস্তি? এর জবাবে শোনা যেত ঘরে, বাইরে, বাজারে এবং অলিতে গলিতে অসহায় মানুষের আর্তচিৎকার। ভেসে আসত হত্যাকারীর পৈশাচিক অট্টহাসি।

গভর্ণর ছিলেন এক নীরব দর্শক। তিনি ফার্ডিনেণ্ডকে প্রতিদিনের ঘটনা লিখে জানাতেন। কিন্তু জেমসের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে সাহস পেতেন না। তিনি কয়েক বারই ইস্তফা দেয়ার কথা ভাবলেন, কিন্তু একে তার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা মনে করা হবে ভেবে নিবৃত রইলেন।

একদিন তিনি বিশপ ট্যালাভিরাকে বললেনঃ 'পবিত্র পিতা! এসব কি হচ্ছে? জেমসকে বুঝিয়ে বলুন আগুন নিয়ে যেন খেলা না করেন।'

বিশপ লজ্জায় মাথা নুইয়ে বললেনঃ 'কে তাকে বুঝাবে? দমন সংস্থা

তাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে সেখানে আমি কিভাবে হস্তক্ষেপ করব। যেখানে সম্রাটই আপনার চিঠির জবাব দিচ্ছেন না সেখানে আমি কে?'

ঃ 'রাণীর কারণে সম্রাট নীরব। তিনি রাণীকে রাগাতে চান না। কিন্তু আর কতদিন এ অত্যাচার চলবে?'

ঃ 'আগুনের তো জ্বালানির প্রয়োজন। জেমস সে জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারেন। শুকনো কাঠ পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলে নতুন তরতাজা গাছ কেটে এ কুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করবেন। গীর্জার শাস্তি সেলগুলোতে নিরপরাধ মুসলমানদের চিৎকার শুনে আমার মনে হয়, এই জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে আসবে খৃস্টানদের পালা। জেমসের পর শাস্তি সেলে যারা শাস্তি দেবে তারা হবে আরো ভয়ংকর, আরো জালেম। তখন দর্শকরা হবে আমাদের চেয়ে বেশী অসহায়। দমন সংস্থার[1] বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে আমরা ভয় পাই। কিন্তু ওরা কিছু ভাবতে গিয়েও আমাদের চেয়ে বেশী ভয় পাবে।'

ঃ 'আমি ভেবেছিলাম ফাদার জেমস আসায় আপনি খুশী হয়েছেন। এজন্য তাকে কিছু বলছেন না।'

ঃ 'আমি এক দুর্বল ব্যক্তি। গীর্জার বিরোধিতা করলে যে শাস্তি আসবে আমি তা থেকে বাঁচতে চাই। আমি জেমসকে সন্তুষ্ট করতে চাইছি। কিন্তু আমার মন বলছে, তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট নন। কখনো মনে হয় 'দমন

---

[1] *দমন সংস্থার সহযোগিতা না করে যারা তাদেরকে সৎ পরামর্শ দিত নিজদের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ অমূলক ছিল না। এই ঘটনার সাত বছর পর ১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার সচিব 'লুসিরো' ট্যালাভিরার ওপর সবংশে ধর্মান্তরিত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। এক অশিতিপর বৃদ্ধ সম্পর্কে এমন কথা মানতে জনগণ প্রস্তুত ছিলনা। কিন্তু লুসিরোর মতের প্রতি ছিল মহাসচিবের সমর্থন। ট্যালাভিরার পূর্বে লুসিকে তার আত্মীয় স্বজন গ্রেফতার করলেন। তাদের স্থাবর অস্থাবর সব কিছু ক্রোক করা হল।*

ট্যালাভিরা এক বছর পর্যন্ত জিন্দানখানায় দুঃসহ দিন কাটালেন. পরিশেষে ১৫০৭ সালে মে মাসে রোম সম্রাটের হস্তক্ষেপে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু জেলের অবর্ণনীয় অত্যাচারে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে অল্প ক'দিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

ট্যালাভিরার মৃত্যুর পর একজন জেনারেল সম্রাটের সেক্রেটারীর কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি দমন সংস্থার কাজে দুঃখ প্রকাশ করে লিখেনঃ 'ওদের হাতে সালতানাত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। লুটপাট এবং হত্যাযজ্ঞ ছাড়াও কোনও যুবতী অথবা সুন্দরী নারীরা নিরাপদ নয়। খ্রিষ্টবাদের জন্য এরচে' বড় অপমান আঁর কী হতে পারে! ট্যালাভিরার মৃত্যুর মাত্র এক বছর পর সে সব নিরপরাধ বন্দীদের মুক্ত করা হচ্ছিল, যাদের বন্দী করা হয়েছিল কর্ডোভার দমন সংস্থার সচিবের নির্দেশে। কিন্তু কী আশ্চর্য। এই পাদ্রীকেই শৃঙ্খলিত করে জেলে নেয়া হচ্ছিল। তারাই তাকে হাকাচ্ছিল, পাদ্রীর হুকুমে যারা নিরপরাধ মানুষের মিথ্যা মামলা তৈরী করেছিল।

সংস্থার গজব' আমার উপর নাজিল হবে। মুসলমানদের শাস্তি দিয়ে আজ ওরা যতটা আনন্দিত, আমার অসহায়ত্বে তারা এর চেয়ে বেশী আনন্দিত হবে।'

মিণ্ডোজা তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতেন।

ঃ 'পবিত্র পিতা! আপনি অস্থির হবেন না। লোকজন আপনাকে ভালবাসে। সম্রাট আপনাকে সম্মান করেন। জেমসের কাজের বিপজ্জনক দিকটা উন্মোচিত হওয়া পর্যন্তই সম্রাট এবং রাণী নিশ্চুপ থাকবেন। গ্রানাডার হাজার হাজার মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। আমার তো মনে হয়, সালতানাতের সবচেয়ে বড় এবং সমৃদ্ধশালী শহরে কবরের নিরবতা নেমে আসুক রাণীও তা চাইবেন না।'

ঃ 'আরাগুনের বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য ফার্ডিনেণ্ড রাণীকে সন্তুষ্ট রাখতে বাধ্য। কিন্তু জেমসের তৎপরতার পরিণতি দেখলে রাণীকেও নিজের মত পাল্টাতে হবে।'

ঃ 'কিন্তু আমার মনে হয় সম্রাটও রাণীর মতের সাথে একাত্ম। জেমস হয়তো তাকে আশ্বস্ত করেছে যে, গ্রানাডার মুসলমানদের মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। আপনি কি জানেন, জেমস প্রতিদিন রাণীকে সংবাদ পাঠাচ্ছেন! আজ এতজন খৃস্টান হয়েছে, এতজন দেশ ছেড়ে চলে গেছে। রাণী ভরা দরবারে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। টলেডোর আমীর ওমরা এবং সংস্থার সচিব তাকে মোবারকবাদ জানিয়েছে। মসজিদগুলো গীর্জায় রূপান্তরিত হবে, পাদ্রীরা এ জন্য খুব খুশী। সরকারী লোকজন মুসলমানদের ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ি দখল করার জন্য ছুটে আসছে। আপনি বলছেন, সিপাইরা শহরের পরিস্থিতি শান্ত রাখবে, কিন্তু এখন তারা জেমসের নির্দেশে কাজ করে। জেমস তাদেরকে খোলাখুলি লুটপাট করার অনুমতি দিয়েছেন।'

ঃ 'মুসলমানরা পাদ্রীদের গায়ে হাত তুললে তাদের হেফাজত করা সেনাবাহিনীর পক্ষে যদিও সম্ভব কিন্তু সৈন্যদেরকে লুটপাট থেকে বিরত রাখা আমার সাধ্যের বাইরে। পাদ্রীদের চাইতে সোনা রূপার লোভ আমার সৈন্যেদের কম নয়। আর কারো সামনে না হলেও আপনার সামনে স্বীকার করছি, আমি অসহায়। আমি গ্রানাডার গভর্ণর এ জন্য আমার লজ্জা হচ্ছে।'

ঃ 'আমরা দু'জনই অসহায়। স্পেনের প্রতিটি লোকের বিবেক আমাদের মত অসহায়।'

গভর্ণর কিছু বলার জন্য হা করেছেন, হঠাৎ জেমস হাঁপাতে হাঁপাতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। মিণ্ডোজা প্রশ্ন করলেনঃ 'খবর ভাল তো? আপনাকে কেমন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে?'

ঃ 'আমি মোটেও উদ্বিগ্ন নই। এইমাত্র পাঁচ হাজার মুসলমানকে দীক্ষা দিয়েছি, এ সুসংবাদটাই আপনাকে দিতে এলাম।'

ট্যালাভিরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেনঃ 'পাঁ-চ হা-জা-র!.....'

তার মুখের কথা টেনে নিয়ে জেমস বললেনঃ 'পাঁচ হাজার মুসলমানকে এত তাড়াতাড়ি কিভাবে দীক্ষা দিলাম এইতো? আমি এক সাথে সবার উপর পবিত্র পানি ছিটিয়ে দিয়েছি। এতে আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো?'

ঃ 'ওরা যদি মনেপ্রাণে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে থাকে তাহলে আপত্তির কি আছে!'

ঃ 'ওদের মনের অবস্থা জানার সময় আমার হাতে নেই। ওদের বলেছি, এখন থেকে তোমরা খৃস্টান। ধর্ম ত্যাগ করলে দমন সংস্থার কাছে জবাব দিতে হবে। আরো একটি সুখবর আছে। আজ আট হাজার মুসলমান শহর ছেড়ে চলে গেছে।'

ঃ 'এ দুটো সফলতার জন্য আপনাকে মোবারকবাদ।'

ঃ 'কিন্তু দীক্ষা নিয়েছে এমন এক হাজার লোক তাদের সাথে চলে গেছে। তাদের ধরে নিয়ে আসার জন্য সিপাইদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমার কথা মানেনি। ওরা বলছে, আপনার নির্দেশ ছাড়া গ্রানাডার বাইরে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না।'

ঃ 'আট হাজারের মধ্যে এক হাজার বাছাই করবেন কিভাবে? ওরাই বা কিভাবে বলবে ওদের মধ্যে কে দীক্ষা নিয়েছে!'

ঃ 'ওদের সবাইকে ধরে আনার জন্য সিপাইদের বলেছিলাম। সিপাইরা যেতে চাইলেও অফিসাররা তাদের যেতে দেয়নি।'

ঃ 'সদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ফৌজি অফিসাররা এখনো নিজেদের দায়িত্ব ভুলে যায়নি।'

ঃ 'গীর্জাকে অপমান থেকে বাঁচানো ওদের প্রথম দায়িত্ব। এক হাজার লোক খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করেছে গীর্জার জন্য এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছুই হতে পারে না।'

ঃ 'ফাদার জেমস! আপনি কি জানেন, গ্রানাডা ত্যাগীরা আলফাজরা

অথবা সিরানুবিদার অন্য এলাকায় চলে যায়?'

ঃ 'জানি। এজন্যই তাড়াহুড়া করে এখানে ছুটে এসেছি। ওরা এখনো বেশি দূর যেতে পারেনি।'

ঃ 'আপনি পার্বত্য এলাকা দেখেছেন?'

ঃ 'গ্রানাডায় আমার কাজ শেষ হলেই সেদিকে নজর দেব।'

ঃ 'আপনি কি জানেন, আমার সিপাইরা ওদের ধাওয়া করলে কয়েক মাইল গিয়েই চরম ধ্বংসের মুখোমুখী হত? ফৌজের সহযোগিতায় গ্রানাডার চৌরাস্তায় কেতাব কোরান পোড়ানো সহজ। এখানে বিশাল সমাবেশে মানুষের গায়ে পানি ছিটিয়ে বলা সহজ যে, তোমরা খৃস্টান হয়ে গেছ। কিন্তু পাহাড়ী এলাকার জঙ্গী মুসলমানরা গ্রানাডাবাসীর চাইতে ভিন্ন।'

ঃ 'ওরা আমাদের গোলাম। কোন গোলামকে আমি ভয় পাই না।'

ঃ 'কিন্তু আমি ভয় করি। মহামান্য সম্রাট ওদের সাথে সংঘর্ষে যাওয়াটা ভালো চোখে দেখবেন না। আমার মনে হয় রাণীও তেমনটি চাইবেন না। আপনি ভয় পান না, কারণ, সবকিছু আপনি একজন পাদ্রীর দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি একজন গভর্ণর। পাহাড়ী কবিলাগুলো বিদ্রোহ করলে তার সব দায় দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপবে। আগামী দিনগুলোতে গ্রানাডার অবস্থা কোনদিকে মোড় নেয় এখনো আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কিন্তু একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি, এরা বিদ্রোহ করলে আমার এ সেনাবাহিনী তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে না। মহামান্য সম্রাট সম্ভবত এখানে আর কোন সৈন্য পাঠাতে রাজি হবেন না।'

জেমস কতক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে গভর্ণরের দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর অবসন্ন দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দিল।

বিপদে বন্ধুর পরিচয়

কয়েক বছরের ব্যবধানে কাফ্রি গোলাম আবু ইয়াকুব এখন শক্তসামর্থ নওজোয়ান। একদিন ভোরে সে হাঁপাতে হাঁপাতে মাসয়াবের রুমে ঢুকে

বলল বললঃ 'মুনীব! নিচে কৃষকের পোশাকে দু'জন লোক আপনার সাথে দেখা করার জন্য বসে আছে। ওরা নাকি আবুল হাসানের বন্ধু। আপনাকেও চেনে।'

মাসয়াব চঞ্চল হয়ে বললেনঃ 'আবুল হাসান সম্পর্কে কি খবর এনেছ?'

ঃ 'আমি আবুল হাসানের নাম শুনেই ছুটে এসেছি।'

মাসয়াব দ্রুত নিচে নেমে এলেন। একজনের বয়স চল্লিশের উপরে, অন্যজন বাইশ তেইশ বছরের যুবক। বয়স্ক লোকটি মাসয়াবকে উদ্বিগ্ন দেখে বললঃ 'মাসয়াব! তোমাকে পেরেশান মনে হচ্ছে! আমি ইউসুফ। সম্ভবতঃ তোমার অপরিচিত নই।'

ঃ 'ইউসুফ?' মাসয়াব মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ঃ 'কিন্তু এ পোশাকে?'

ঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে এ পোশাকই নিরাপদ। আর ও হল ওসমান।'

মাসয়াব ওসমানের সাথে মোসাফেহা করে উৎকণ্ঠা মেশানো কণ্ঠে বললেনঃ 'আগে আবুল হাসানের খবর বলুন?'

ঃ 'আবুল হাসানের খবর?' ইউসুফের কণ্ঠে বিস্ময়।

ঃ 'আমরা তো জানি ও সুলতানকে জাহাজে তুলে দিয়ে এখানেই ফিরে এসেছিল।'

ঃ 'তাহলে ও কোথায় আপনারা জানেন না?'

ঃ 'বিলকুল জানি না। সুলতান আমাকে বলেছিলেন, আবুল হাসান আহত হয়ে তার কাছে এসেছিল। সে নাকি উজীর আবুল কাসেমের নিহত হবার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে। এসব শুনে সুলতান তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এরপর সুলতানের হিজরতের সময় সাগর পাড় পর্যন্ত গিয়ে ও আবার ফিরে এসেছে। রাণী আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, সে নাকি আপনার খান্দানের এক মেয়েকে বিয়ে করবে। রাণীর ধারণা ছিল, বিয়ের পর সস্ত্রীক ও মরক্কো যাবে। কিন্তু আপনি এত কি চিন্তা করছেন?'

ঃ 'মাফ করবেন। আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন তাও খেয়াল নেই। আসুন, আমরা বসে কথা বলি।'

ওরা দোতলার এক প্রশস্ত কক্ষে উঠে এল। মাসয়াব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন আবুল হাসানের কাহিনী। সাদিয়া ও তার খালাম্মা পাশের কামরায় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। মাসয়াবের বলা শেষ হলে ইউসুফ জিজ্ঞেস করলঃ 'আপনার কি বিশ্বাস ও এখনো বেঁচে আছে?'

ঃ 'নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু সাদিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ও ফিরে আসবে। এ জন্য শত বিপদের পরও সে দেশ ছাড়তে রাজি নয়।'

ঃ 'খৃস্টানরা ওকে কোথায় নিয়ে গেছে হারেছ আপনাকে বলেনি?'

ঃ 'না, ডন লুই ওকে ছেড়ে দেবে এ কথা বলে সে সব সময়ই এড়িয়ে যায়। আমিও বাড়াবাড়ি করি না। কারণ ও কোথায় আছে জানলেও তো আমি কিছু করতে পারব না। এমনকি হারেসের কেল্লার কোথাও থাকলেও আমাকে দিয়ে ওর কোন সাহায্য হবে না।'

ঃ 'আসার সময় পথে কেল্লাটা দেখেছি। আবুল হাসান এখানে থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে আপনারা সবাই মরক্কোগামী জাহাজে থাকবেন।'

ঃ 'ও আলফাজরায় নেই। হারেস কসম খেয়ে বলেছে, খৃস্টানরা ওকে কোথায় নিয়ে গেছে এর কিছুই সে জানে না।'

পাশের কক্ষের পর্দা দুলে উঠল। মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে এগিয়ে এল সাদিয়া। বললঃ 'হারেস আমাদের কাছে সত্য কথা প্রকাশ করবে এমনটি আশা না করাই ভাল। তাকে জিজ্ঞেস না করেও আবুল হাসানের খোঁজ নেয়া সম্ভব। ও সুলতানের এক গোলামকে খৃস্টানদের গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করত। নাম আবু আমের। হাসান সুলতানকে জাহাজে তুলে দিয়ে ফিরে আসার সময় সে তার সাথে ছিল। কেল্লায় কাজ করলেও পাশের গ্রামেই তার বাড়ি এবং সেখানেই সে থাকে। আবু ইয়াকুবের কাছে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমি একদিন তার স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। সে-ই আমায় বলল, আবুল হাসান বেঁচে আছে। কিন্তু ও কোথায় আছে আবু আমের স্ত্রীকেও তা বলতে রাজী হয়নি। আমার বিশ্বাস, হাসান সম্পর্কে সে অনেক কিছু জানে।

আবুল হাসান গ্রেফতার হবার পর কয়েক মাস সে নিখোঁজ ছিল। এ কয় মাস সে কোথায় ছিল তাও তার স্ত্রী জানে না। আমার ধারণা, তাকে ভালভাবে জিজ্ঞেস করা উচিত। কিন্তু খালুজান বলছেন, সে গোয়েন্দা হলে তো তার সাথে কথা বলাই ঠিক নয়।'

ঃ 'যদি সে-ই আবুল হাসানকে ধরিয়ে দিয়ে থাকে, তবে তার পিছু নিলে আমরাও তো ফেঁসে যাবো।' মাসয়াব বললেন, 'সাদিয়া তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে ঠিক করেনি।'

ঃ 'আবু ইয়াকুব কে?' ইউসুফ প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আমাদের এক বিশ্বস্ত চাকর।'

ইউসুফ সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'বসো বেটি! হারেস অথবা

তার কোন চাকর যদি হাসানের খবর জানে, আমরা সে খবর বের না করে যাচ্ছি না। হাসান কয়েদখানায় থাকলে বের করে আনব তাকে। কিন্তু এমন কোন জায়গায় যদি পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, যেখানে এ মুহূর্তে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে কয়েক দিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আশা করি তার মুক্তি খুব দূরে নয়।'

সাদিয়ার চোখ ফেটে বেরিয়ে এল কৃতজ্ঞতার অশ্রু। ইউসুফ মাসয়াবের দিকে ফিরে বললেনঃ 'এখানে এসে গ্রানাডার যেসব খবর শুনেছি, তাতে মনে হয় আলফাজরার মুসলমানগণ বেশী দিন স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। গ্রানাডা থেকে হাজার হাজার নতুন মুহাজির এখানে এসে পৌঁছেছে। আমার পরামর্শ হল, আপনারা আমাদের সাথে চলুন। দিন সাতেক পরই আমাদের জাহাজ এখানে এসে পৌঁছবে।'

ঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও এখানে ফিরে আসবেই।' চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে সাদিয়া বলল, 'জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এখানেই তার অপেক্ষা করব।'

ওসমান এতক্ষণ নিশ্চুপ বসেছিল, এবার মাসয়াবকে লক্ষ্য করে বললঃ 'আবু ইয়াকুবকে বলবেন ও যেন আমাদের কথা মতো কাজ করে। ইনশাআল্লাহ আমরা যাবার আগেই আবুল হাসানের খোঁজ পেয়ে যাব। আপনার সান্ত্বনার জন্য বলতে পারি, আবুল হাসানের এক বন্ধু তুর্কী নৌবাহিনীর কমাণ্ডার। স্পেনের সীমান্তবর্তী কোন এলাকাই আমাদের জঙ্গী জাহাজের আওতার বাইরে নয়।'

সাদিয়ার চোখে মুখে আশার ঝিলিক খেলে গেল। বললঃ 'আবু ইয়াকুবের ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ও আমাদের জন্য যে কোন কোরবানী দিতে প্রস্তুত।'

আকাশে হাসছে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক পর কাজ সেরে আবু আমের কেল্লা থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথ ধরল। মৃদুমন্দ বাতাসের পরশ পেয়ে গুন গুন করে একটা গানে টান দিল সে। ধীর পায়ে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। আধ ঘন্টা পর সে গ্রামে পা রাখল। বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়ল গেটের। ভেতর থেকে কেউ ছিটকিনি খুলতেই সে দরজা ফাঁক করে বললঃ 'সুখবর আম্মারা! হারেস আমাকে কথা দিয়েছে, মাসয়াব হিজরত করলে আবুল কাসেমের জমি থেকে আমাকেও ভাগ

দেবে।' অকস্মাৎ ইউসুফের লৌহ কঠিন হাত তার গলা টিপে ধরল। আম্মারার মেয়েলী কণ্ঠের পরিবর্তে শোনা গেল পুরুষালী গম্ভীর আওয়াজঃ 'মাসয়াব এখন হিজরত করবে না।'

ভয় এবং কঠিন হাতের চাপে তার গলা থেকে কোন শব্দ বেরুল না। তাকিয়ে দেখল এক দীর্ঘ দেহী সামনে দাঁড়িয়ে। ইউসুফ হাতের চাপ একটু ঢিলা করে বললেনঃ 'তুমি এখন আমাদের হাতে। চিৎকার করলে এ চিৎকারই হবে তোমার শেষ চিৎকার।'

আবু আমের মিন মিন করে বললঃ 'আমার বিবি বাচ্চারা কোথায়?'

ঃ 'ওরা গ্রামের বাইরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওদের বাঁচাতে চাইলে আমাদের সাথে চলো।'

ঃ 'আপনারা কে! কি চান?'

ইউসুফ তাকে ঝাঁকুনি দিলেন। কোমর থেকে খঞ্জর বের করে গর্দানে ধরে বললেনঃ 'বেকুব! আস্তে কথা বল। আমার খঞ্জরের ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নিজের জন্য না হলেও বিবি বাচ্চার জন্য আমাদের সাথে চলো। কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। তুমি কি পরিমাণ সত্য বল এর উপরই তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করবে। তোমার বিবি বাচ্চারা নিরাপদ আছে, ওরা তোমার অপরাধের শাস্তি পাবে না।'

আবু আমের নিরবে হাঁটা দিল। গাঁয়ের বাইরে এসে ইউসুফ এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেনঃ 'আবু আমের! বিয়ের রাতে যে যুবক গ্রেফতার হয়েছিল, তোমার বিবি বাচ্চারা এখন তার কাছে তার দীর্ঘ বন্দী জীবনের কাহিনী শুনছে। বন্দী জীবন তার মনে এতটা প্রভাব ফেলেছে যে, সে কোনও স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ সইতে পারছে না। নইলে এতাক্ষণ তুমি বেঁচে থাকতে পারতে না।'

ঃ 'আবুল হাসান!' চমকে উঠল আবু আমের, 'কিন্তু... কিন্তু সে তো..।'

ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ, থামলে কেন? হয়তো ও কিভাবে কয়েদ থেকে ছাড়া পেয়েছে একথা বলতেই এখানে এসেছে। কারো ভয়ে হয়তো তোমার বাড়িতে কথা বলার সাহস করেনি। আমরা মাসয়াবের বাড়ি না গিয়ে সোজা তোমার বাড়িতে এসেছি।'

ঃ 'মাসয়াবের বাড়ির পথ তো অন্যদিকে! আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ঃ 'বেকুব! বাড়ি যাবার পূর্বে আবার ধরিয়ে দেবে না আবুল হাসান এই নিরাপত্তা চাইছে। তোমায় এতসব এ জন্য বলছি যে, তুমি বুঝে সুঝে তার সাথে কথা বলো। নিজের অপরাধ স্বীকার করলে ও হয়তো তোমাকে আর তোমার সন্তানকে তোমার স্ত্রীর সামনে হত্যা করবে না।'

আবু আমের ধরা গলায় বললঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আমার ওপর রহম করুন। আমি আপনাকে সব খুলে বলছি।'

ঃ 'আমাকে বলে কি হবে? যা বলার ওকেই বলো।'

ঃ 'না, না, উনি আমাকে ক্ষমার যোগ্য ভাববেন না।'

ঃ 'আমার তো মনে হয়না তুমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ অপরাধী। বরং যতদূর বুঝতে পারছি, আসল অপরাধী হারেস, তুমি তার গুপ্তচর মাত্র।'

আবু আমের অনুনয়ের স্বরে বললঃ 'আমি একটা অন্যায় করে এখন পস্তাচ্ছি। ডন লুই আবুল হাসানকে বেলেনসিয়া না পাঠালে আমি অবশ্যই তার স্ত্রী ও মাসয়াবকে সব খুলে বলতাম। গ্রানাডার কেউ হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু বেলেনসিয়া পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ছিল না! আমি অবাক হচ্ছি, বেলেনসিয়ার কয়েদখানা থেকে ও কেমন করে বেরিয়ে এলো। ডন লুইয়ের গোলামরা যেখানে থাকে আমি তা দেখেছি। দেখেছি সাগর পাড়ে তার কেল্লার মতন মহল। তার কঠোর ব্যবস্থাপনাকে ফাঁকি দিয়ে কোন গোলাম পালিয়ে যাবে, তা কল্পনাও করা যায় না।'

ঃ 'তুমি আবুল হাসানের সাথে বেলেনসিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলে?'

ঃ 'এছাড়া উপায় ছিল না। হারেস তাকে গ্রানাডা পৌছানোর জন্য আমাকে তার সাথে দিয়েছিল। ডন লুইয়ের গোলামদেরকে তার জায়গীর পর্যন্ত পৌছে দিতে সিপাইরা আমায় বেলেনসিয়া যেতে বাধ্য করেছিল।'

ঃ 'তুমি কতদিন ছিলে ওখানে?'

ঃ 'ছয় মাস।'

ঃ 'ডন লুইয়ের কয়েদখানা কি খুব সুরক্ষিত?'

ঃ 'অবশ্যই। দিন রাত কয়েদখানার বন্ধ ফটকেও সিপাইরা পাহারায় থাকে। ওখান থেকে পালানোর প্রশ্নই আসে না। এর আগে আর কেউ সেখান থেকে পালাতে পারেনি। অতীতে যারা পালাবার চেষ্টা করেছিল সবাই ধরা পড়েছে। আমি দু'জনকে দুই পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা দেখেছি।'

ঃ 'সাগর ওখান থেকে কত দূরে?'

ঃ 'তার মহল ক্যানেলের প্রান্তে। ক্যানেলটা মাইল খানেক ভেতরে চলে

গেছে। বেলেনসিয়ার বন্দর ওখান থেকে তিন মাইল দূরে।'

ঃ 'গোলামরা কি তার ক্ষেতেও কাজ করে?'

ঃ 'হ্যাঁ। আবুল হাসান তো আপনাকে সবই বলেছে।'

ঃ 'আবুল হাসান আমায় কিছু বলেনি।'

আবু আমের সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'আমি সত্যিই বলছি। ওদিকে দেখো। ওই গাছের নিচে তোমার বিবি বাচ্চারা তোমার অপেক্ষা করছে। ওদেরকে বুঝিয়ে বল, তোমাকে বাঁচাতে চাইলে ওরা যেন নিরবে আমাদের অনুসরণ করে। সামনের গ্রাম থেকে ওদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা হবে।'

ঃ 'কিন্তু কথা দিয়েছিলেন সত্য কথা বললে আমাকে মারবেন না।'

ঃ 'আমি এখনো সে কথার উপরেই আছি।'

ঃ 'কথা দিন আবুল হাসানের হাত থেকে আমায় বাঁচাবেন। ওর সামনে যেতে আমার ভয় করছে।'

ঃ 'বেকুব! আবুল হাসানের সামনে গেলে তুমি থাকবে তার জিম্মায়, এখন আমার জিম্মায় আছ।'

ঃ 'তার মানে আবুল হাসান এখানে নেই?'

ঃ 'না।'

ঃ 'আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ঃ 'যেখানে তোমার সন্তানের ভবিষ্যত আলফাজরার চাইতে নিরাপদ হবে। ওখানে তুমি আমাদের কয়েদী থাকবে না। স্বেচ্ছায় পাপের প্রায়শ্চিত্য করার জন্য প্রস্তুত হলে তোমার বিবিবাচ্চা নিজদের ভাগ্যবান মনে করবে।'

ওরা গাছের কাছে এল। স্বামীকে দেখেই আম্মারা এগিয়ে এল। চোখে মুখে স্বস্তি। বললঃ 'আপনি কিছু ভাববেন না। এদের কাছে আমাদের কোন ভয় নেই।'

ছোট বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল আমের। বড়টাও ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ইউসুফ গোলামের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আবু ইয়াকুব, এবার তুমি যাও। ওদের বলবে, আমরা আবুল হাসানের ব্যাপারে সব তথ্য পেয়েছি। আবু আমের এখনই আমাদের সঙ্গী হতে রাজী হবে এতটা আশা করিনি, ও যখন রাজী হয়েছে এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আবুল হাসানের স্ত্রীকে আমার পক্ষ থেকে সব খবর বলে দিও।'

ওসমান বললঃ 'তার স্বামী আমাদের ভাই। তার জন্য যে কোন ঝুঁকি

নিতে আমরা পিছপা হব না।'

ঃ 'এবার যাও, বাড়ির বাইরে আর কারো কাছে এসব কথা বল না।'

ঃ 'জ্বী আচ্ছা! আমায় অতটা বোকা ভাববেন না। আমি আপনাদের আসার অপেক্ষায় থাকব।'

আবু ইয়াকুব হাঁটা দিল। ওসমান আবু আমেরকে বললেনঃ 'তুমি এবার আমাকে অনুসরণ কর। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমরা গ্রানাডা থেকে এসেছি। আমার কাছে দুটো পিস্তল আর একটা খঞ্জর আছে। সামান্য ভুল তোমার জীবন শেষ করে দিতে পারে।'

আবু আমের নিরবে তাদের সাথে হাঁটা দিল। কিছু দূর এগিয়ে ইউসুফ বললেনঃ 'আবু আমের! পথে তোমার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করব। এরপর আমরা নিশ্চিন্তে জাহাজে সফর করব।'

মাঝ রাতে ওরা এক গ্রামের পাশে এসে থামল। গাঁয়ের সরদার ইউসুফের পুরনো বন্ধু। তিনি ইউসুফকে থাকার জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করলেন। ইউসুফ বললঃ 'না দোস্ত, যত দ্রুত সম্ভব আমাকে গ্রানাডা পৌঁছতে হবে। যতদূর সম্ভব এগিয়ে বিশ্রাম করব, পথে আরো কয়েকজন বন্ধুর সাথেও দেখা করতে হবে। তুমি শুধু সামনের মঞ্জিল পর্যন্ত ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দাও।'

আবু আমের, তার স্ত্রী ও সন্তান খচ্চরের পিঠে, ইউসুফ ও ওসমান ঘোড়ায় চেপে বসলেন। ওদেরকে এগিয়ে দিতে সাথে চলল গাঁয়ের ক'জন তরুণ।

জাজিরার পথে

সাত দিন পর জাহাজে চাপল ওসমান। দেহে এখন কৃষকের পোশাকের পরিবর্তে নৌবাহিনীর অফিসারের ইউনিফর্ম। মাল্লাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিল সে। জাহাজে তুর্কী পতাকা শোভা পাচ্ছে। মুহাজির যাত্রীরা চলছে আফ্রিকার দিকে।

আবু আমেরের বউ-বাচ্চারা নিশ্চিন্তে অন্যদের সাথে কথা বলছিল।

বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ইউসুফ এবং ওসমানের মধুর ব্যবহার ওদের তা অনুভব করতে দেয়নি। প্রথম দিনেই আম্মারা কয়েকজনের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলল। মনে সামান্য যে শংকা ছিল তাও এখন আর নেই। কিন্তু ভবিষ্যত নিয়ে আবু আমেরের দুর্ভাবনা কাটেনি। তার আশংকা, ইউসুফ এবং ওসমানের এ মধুর ব্যবহার যে কোন সময় কঠোর হয়ে যেতে পারে। তবু স্ত্রী ও সন্তানরা তুর্কীদের আশ্রয়ে যাচ্ছে ভাবলেই সে খানিকটা স্বস্তি পেত।

সফরের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ইউসুফ ও ওসমান জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আবু আমের এগিয়ে এসে বিনীত কণ্ঠে বললঃ 'আমি আপনাদের কাছে কিছু বলতে চাই।'

ঃ 'বলো।' ইউসুফ বললেন।

ঃ 'আবুল হাসানের মুক্তির জন্য আমি জীবন বাজি রাখতে পারি। আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী ও সন্তানরা পথে বসেবে না, এর চেয়ে সান্ত্বনা আর কি হতে পারে! আমার বিশ্বাস, আপনারা আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করার সুযোগ দেবেন।'

ঃ 'আবুল হাসানের মুক্তির ব্যাপারে কি করতে পার তোমার স্ত্রী ও সন্তান জাজিরায় পৌঁছলে সে চিন্তা হবে।'

ঃ 'ভেবেছিলাম আপনারা মরক্কো যাচ্ছেন।'

ঃ 'জাহাজ মরক্কো হয়েই যাবে। আমি ওখানেই থাকি।'

ওসমান বললঃ, 'তোমার মনের শংকা দূর হলেই তোমার সাথে কথা বলা যায়। জাজিরায় অফিসারদের সাথে কথা বলার পর বলতে পারব কি করবে তুমি। রিয়ার এডমিরালকে যদি পথে পেয়ে যাই, তাহলে আগেও তোমাকে অভিযানে পাঠাতে পারব। সে ক্ষেত্রে তোমাকে বেলেনসিয়ার সাগর পাড়ে নামিয়ে দেয়া যেতে পারে। অবশ্য এর আগে তোমাকে কিছু ট্রেনিং নিতে হবে। তুমি স্পেনিশ ভাষা বলতে পার?'

ঃ 'জ্বী। মর্সিয়া থেকে পালানোর সময় আমি এক খৃস্টানের চাকর ছিলাম। তাছাড়া হারেসের ওখানেও খৃস্টানদের সাথে স্পেনীশ ভাষায়ই কথা বলতাম। আমার জন্য ভাষা কোন সমস্যাই নয়।'

ঃ 'তুমি বেলেনসিয়া কবে যাবে, গিয়ে কি করবে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক দিন লাগতে পারে।'

ঃ 'হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আপনার মধুর ব্যবহারে কখনো সাগরে

ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।' আবু আমের বলল। 'এখন মনে হয় আবুল হাসানকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমি স্বস্তি পাব না। এ জন্য জাজিরা পৌঁছে যত শীঘ্র সম্ভব আমায় পাঠিয়ে দিন। আমার আশংকা হচ্ছে, শুনেছি চাকরের পরিমাণ বেশী হলে ডন লুই তাদেরকে নতুন আবিষ্কৃত পশ্চিমা দুনিয়ার লোকদের কাছে বিক্রি করে দেয়। শুধু শক্ত সামর্থ লোকদের রেখে দেয় নিজের কাছে। সে নিজেও নাকি ওখানে চলে যেতে চাইছে। তার এক বিশ্বস্ত চাকরের কাছে আমি এসব কথা শুনেছি। অনেক দিন হল আবুল হাসান বেলেনসিয়ায়। ভয় হয়, তাকে না আবার ওখানে পাঠিয়ে দেয়।'

ঃ 'এ সময় দোয়া ছাড়া আমাদের আর করার কিছুই নেই।'

ঃ 'আমার আরও একটি আশংকা আছে।'

ঃ 'কি?' ওসমান প্রশ্ন করল।

ঃ 'বেলেনসিয়ার অবস্থা গ্রানাডার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে যে জুলুম হতো ইহুদীদের উপর, এখন তা মুসলমানদের উপর হচ্ছে। পাদ্রী এবং লর্ড বিশপ জোর করে মুসলমানদেরকে খৃস্টান বানাবার ব্যাপারে এক ধাপ এগিয়ে আছে। বেলেনসিয়ার জমিদাররা মুসলমানদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করতে চায় না। কারণ এরাই ওদের অর্থাগমের মূল উপায়। ওরা এদেরকে যথাসাধ্য আশ্রয় দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু গীর্জার গোয়েন্দা দল কারোর উপর খৃষ্টবাদ বিরোধী তৎরপরতার অভিযোগ আনলে জমিদাররাও তাদেরকে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়।

প্রথম শাস্তি বেত্রাঘাত। পরবর্তী অভিযোগের পর তাকে ইনকুইজিশনের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়। ইনকুইজিশনের হাতে শাস্তি ভোগ করার চাইতে অনেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে।

আমার সামনেই একদিন আবুল হাসানকে দশটি বেত মারা হয়েছিল। সে নামায পড়ছিল, পাদ্রীরা তা সইতে পারেনি। তাদের মতে যাদের গায়ে পবিত্র পানি ছিটিয়ে ব্যাপ্টাইজ করা হয়েছে ওরা সবাই দীক্ষা প্রাপ্ত। আবুল হাসানকে পাদ্রী ইনকুইজিশনের হাতে সোপর্দ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ডন লুই পাদ্রীকে কিছু দিয়ে হয়তো মিটমাট করে ফেলেছে। আমার কেবলই মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক খারাপ।

আবুল হাসান মরে গেলেও আপন ধর্ম ত্যাগ করবে না। ডন লুই তাকে পছন্দ করে। কারণ হাসান দুষ্ট ঘোড়াগুলো ঠিক করতে পারে। তাছাড়া সে ভাল একজন পশু চিকিৎসক। এরপরও আমার আশংকা হয়, লুই বেশী দিন

তাকে পাদ্রীর রোষ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।'

ঃ 'তোমার কথায় মনে হয় লুই ও হারেস দু'জনেই তোমাকে খুব বিশ্বাস করে?'

ঃ 'হ্যাঁ জনাব। আমি হারেসের অপরাধের অংশীদার। আর ডন লুই আমাকে খৃস্টানদের বন্ধু মনে করে।'

ঃ 'তুমি নিশ্চয়ই লুইয়ের কেল্লা, মহল, চাকরদের থাকার ঘর সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করতে?'

ঃ 'আমি তার বাড়িতে রান্নার কাজ করতাম। সর্বত্রই আমার অবাধ বিচরণ ছিল। আবুল হাসানকে বেলেনসিয়া পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যদের সাথে ছিলাম আমি। ডন লুই চাইছিলেন আমি গোয়েন্দাগিরি করি। ভাল বেতনও দিতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি অনেক কাকুতি মিনতি করে বাড়ি এসেছি। তাকে কথা দিয়েছি, কখনো আলফাজরা ত্যাগ করলে আপনার কাছেই আসব। আমাকে তিনি দশ ডুকট দিয়ে একটা জাহাজের করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

ঃ 'তার মানে ওখানকার সবকিছুই তোমার নখদর্পণে, আর ইচ্ছে করলেই হারেসের দূত হয়ে তার কাছে যেতে পার।'

ঃ 'জ্বী, জনাব। আমি গিয়ে যদি বলি, বাধ্য হয়ে আমায় আলফাজরা ছেড়ে আসতে হয়েছে এবং আলফাজরার আরো অনেকেই নতুন পৃথিবীতে আসতে আগ্রহী, কিছু লোককে জোর করেও নিয়ে আসা যাবে– আমাকে তিনি অবিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমার কেবলই ভয় হচ্ছে, আমাদের সাহায্য পৌঁছার পূর্বেই হাসানকে না নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়।'

ঃ 'খোদা কারো সাহায্য করতে চাইলে এমনিতেই সে পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়।' মাঝখানে কথা কেটে ইউসুফ বললেন, 'মরক্কোর সুলতান ও রাণীর সাথে কথা বলার সময় আবুল হাসানের প্রসঙ্গ এসেছিল। তখন থেকেই ওকে আমি খুঁজছি। নবাগত মুসাফিরদের কেউ তার খোঁজ দিতে পারেনি। এরপর পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্য গেলাম জাজিরা। সালমান এবং ওসমান ছাড়াও হাসানের কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে। ওরা ওর কথা খুব মনে করে। যখন বললাম, আলফাজরার অবস্থা জানতে কয়েক দিনের জন্য ওখানে যেতে চাই, ওরা বিশেষ করে হাসানের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য অনুরোধ করলো। স্পেনের সাগর তীরে পৌঁছার জন্য সালমান একটা জাহাজও পাঠিয়েছে। ওসমান সে জাহাজের সহকারী

ক্যাপ্টেন। আমার সাথে আলফাজরা পর্যন্ত আসার অনুমতিও ওকে দেয়া হয়েছে। এরপর কেল্লায় না থেকে গ্রামে থাকা, সূর্যাস্তের পর তোমার বিবি বাচ্চাকে গ্রাম থেকে বের করা, তোমাকে সহজে গ্রেফতার করা– এত তাড়াতাড়ি এসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কুদরতের কোন ইঙ্গিত রয়েছে। আমার মনে হয়, আল্লাহ সেই নিষ্পাপ মেয়েটির প্রার্থনা কবুল করেছেন আর তোমাকে সুযোগ দিতে চাইছেন পাপের প্রায়শ্চিত্য করার। তোমার বর্তমান মানসিক পরিবর্তনের জন্য তোমার স্ত্রীর দোয়াও হয়তো কাজ করেছে। মেয়েটাকে ভালই মনে হয়।'

ঃ 'আবু আবদুল্লাহ যখন দেশ ত্যাগ করল ও প্রায়ই দোয়া করত, 'আল্লাহ আমাদের জন্য হিজরতের সুযোগ করে দাও।' যে সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে গ্রেফতার করলেন, বাড়িতে এসে আমি ওকে এ সুসংবাদ শুনাতে চেয়েছিলাম যে, জমিন পেলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে। তখন তুমি কখনো হিজরতের কথা মুখেও আনবে না।'

ওসমান বললঃ 'আন্তরিকতার সাথে নিজের ভবিষ্যত মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত করলে আফ্রিকা অথবা পূর্ব ইউরোপে এর চেয়ে ভাল জমি পাবে। জাজিরায় এমন লোকদের কাছে থাকবে যারা গ্রানাডায় আবুল হাসানের মেহমানদারী দেখেছিল। তুমি যে বেকার এ অনুভূতিও ওখানে থাকবে না। তোমায় লাঠি খেলা ও কুস্তি শেখানো হবে। খৃষ্টবাদ সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ, যারা নির্দ্বিধায় গীর্জায় প্রবেশ করতে পারে, তাদের সাথে তোমায় পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। তোমাকে ওরা ট্রেনিং দেবে। বেলেনসিয়ায় লুইয়ের কেল্লা সম্পর্কে তোমাকে আরো কিছু প্রশ্ন করব। আমরা যখন সালমানের কাছে পৌছব, ডন লুইয়ের কেল্লায় আক্রমণ করার জন্য সাগর তীর এবং আশপাশ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে যাবে। এরপরও আমাদেরকে সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তিউনিসিয়ার জঙ্গী জাহাজগুলোর সাথে এ মুহূর্তে কোন সংঘর্ষে যেতে না হলে নৌবাহিনী প্রধান হয়তো বেলেনসিয়া অভিযানের অনুমিত দিতে পারেন। তা না হলে আমাদেরকে আরো অপেক্ষা করতে হবে।'

আসমা এখন ষোল বছরের এক যুবতী। তার আকর্ষণীয় দেহে কানায় কানায় যৌবনের মাদকতা। এক বিশাল বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল সে। আঙ্গিনায় স্বামী সালমানের সাথে বদরিয়া হেলান

চেয়ারে বসে। তাদের চার বছরের শিশু একটি খেলনা কামান টানছিল। উপসাগরের পাড়ে এক টিলার উপর বাড়িটি। সাগর থেকে উপসাগরে আসা জাহাজের দিকে ওর দৃষ্টি।

সালমানের কানের গোড়ায় কয়েক গাছি চুলে পাক ধরলেও দেহের বাঁধন এখনো মজবুত। বদরিয়াকে দেখে মনে হয় দিনকে দিন আরো তরুণী হচ্ছে। চার বছরের শিশু খালেদ হঠাৎ খেলনা ফেলে পিতার কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। মুখ ভার করে বললঃ 'আব্বু! আপু আমার সাথে খেলছে না।' বদরিয়া বললঃ 'তুমিও আপুমনির সাথে গিয়ে জাহাজ দেখ। দেখছ না কত নতুন নতুন জাহাজ আসছে।'

ঃ 'আপু প্রতিদিন বলেন, মনসুর ভাইয়া আসবেন। কিন্তু এখনো আসেন না কেন? আব্বু, আমায় কেল্লায় নিয়ে চল। আমি ওখানকার বড় বড় কামান দেখব। আম্মু বলেছে, জাহাজের কামানের চাইতে ওগুলো নাকি আরো অনেক বড়।'

সালমান তাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেনঃ 'যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমায় কেল্লায় নিয়ে যাব।'

একটু পরে তিনি আসমাকে ডেকে বললেনঃ 'এদিকে এস তো মা!'

পিতার ডাক শুনে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে আসমা তার মায়ের সামনে বসে পড়ল। ঃ 'বেটি!' সালমান বললেন, 'দু'দিনের ছুটি পেলেও মনসুর দুপুর নাগাদ পৌঁছে যেত। আমার মনে হয় নৌ প্রধান জাহাজ খোলা সমুদ্রে নোঙ্গর করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্য মনসুর ছুটি পাবে না। দু'একদিনের মধ্যে আমাদেরকেও যাওয়ার জন্য হুকুম দেয়া হবে। কালই আমি জাহাজে চলে যাব।'

গেটে কড়া নাড়ার শব্দ হল। সাথে সাথেই পাল্লা ফাঁক করে সালাম দিয়ে এগিয়ে এল ওসমান।

ঃ 'আরে ওসমান! এসো, এসো। আমরা তো তোমার কথাই ভাবছি। ইউসুফ কোথায়?'

ঃ 'তিনি মরক্কো থেকে গেছেন।'

ঃ 'বসো! তারপর বলো কি খবর'?'

ওসমান একটা খালি চেয়ারে বসতে বসতে বললঃ 'খোদার শোকর সময় মত পৌঁছেছিলাম। নয়তো এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশ না নেয়ার দুঃখ থাকত সারা জীবন। মনসুর কোথায়?'

ঃ 'নৌবাহিনী প্রধান তাকে নিজস্ব কর্মচারীর অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন। ও খুব ভাগ্যবান। তাড়াতাড়ি উন্নতি করবে। বেলেনসিয়া অভিযানের পর একটা জঙ্গী জাহাজের দায়িত্ব পেয়ে যেতে পারে।'

বদরিয়া ভ্রমণের ফলাফল শোনার জন্য আনচান করছিল।

ঃ 'আবুল হাসানের কোন সন্ধান পেয়েছ?'

ঃ 'জ্বী! সে হতভাগা বিয়ের দিনই বন্দী হয়েছে। এখন বেলেনসিয়ায় এক কাউন্টের জমিদারীতে গোলামী খাটছে। যে মেয়েটার সাথে ওর বিয়ে হয়েছে তার সাথে দেখা করেছি। যে লোকটা আবুল হাসানকে বন্দী করিয়ে বেলেনসিয়া পৌছে দিয়েছিল, ওকে তার বিবি বাচ্চাসহ ধরে নিয়ে এসেছি।'

সালমান ও বদরিয়ার প্রশ্নের জবাবে ওসমানকে গোটা কাহিনী বলতে হল। বলা শেষ হলে সালমান বললেনঃ 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমেরকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু বেলেনসিয়ায় কোন অভিযান পাঠাতে হলে অবশ্যই নৌবাহিনী প্রধানের অনুমতি নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, তিউনিসিয়া অভিযানের পর তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করবেন না। ওবায়দুল্লাহর ছেলের সাহায্যের জন্যে আমি নিজেই যেতে চাই। নদীর পাড় থেকে হাসানের কয়েদখানা কতটা দূরে তার উপরই আমাদের সফলতা নির্ভর করবে।'

ঃ 'ডন লুইয়ের কেল্লা, কয়েদখানা এবং গ্রামগুলো আমাদের তোপের মুখেই থাকবে।' ওসমান বলল, 'আমের ছ'মাস ওখানে ছিল। সফরে আমি ওকে এত প্রশ্ন করেছি যে, ওই এলাকার পথঘাট এখন আমার নখদর্পণে। আক্রমণকারী জাহাজের জন্য আমি একটা ম্যাপও তৈরী করেছি।'

ঃ 'সে গোয়েন্দাটা কোথায়?'

ঃ 'ক্যাপ্টেনের কাছে রেখে এসেছি।'

ঃ 'ওর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেরকে এখানে নিয়ে এস।' বদরিয়া বলল, 'চাকরদের দু'তিনটে কক্ষ খালি আছে। ওরা ওখানে থাকতে পারবে।'

ঃ 'তবে তো ভালই হয়। আমেরকে আমরা যে দায়িত্ব দিতে চাই তাতে হয়ত তাকে জীবন নিয়ে খেলতে হবে। এ জন্য সে যেন মনে না করে, তাকে আমরা ঘৃণা করছি অথবা ছোট মনে করছি।'

ঃ 'আমি ওর স্ত্রীর মন ভরাতে পারব। তার সন্তানেরা খালেদের সাথে খেলবে। চাকরদের বলে দেব আমেরের সাথে খারাপ ব্যবহার না করতে।'

ঃ 'এত কিছুর পরও আমাদেরকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। হুঁশিয়ার

কোন চাকরকে তার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব দিতে হবে। তা না হলে কেল্লা থেকে কোন লোককে পাঠাতে হবে।'

ঃ 'আমার মনে হয় তার দরকার হবে না।' সালমান বললেন, 'আমের যেন পাহাড়ের ওদিকে যেতে না পারে চাকরদের তা বলে দেব।'

পরদিন সকালে স্ত্রী সন্তানসহ আবু আমেরকে নিয়ে আসা হল। এর তিন দিন পর অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন সালমান।

চল্লিশ দিন পর এক সুন্দর সকালে তুর্কী নৌ অফিসারের ইউনিফর্ম পরা এক সুদর্শন যুবক টিলায় উঠে এল। দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ির সামনে এসে দরজার কড়া নেড়ে জবাবের অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে পড়ল। ডাকলঃ 'আসমা! আসমা।'

হাঁপাচ্ছিল যুবক। ডাক শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আসমা। যুবক বললঃ 'আমাদের অভিযানের খবর সর্বপ্রথম তোমাকেই শোনাতে এসেছি আসমা, আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন। আমরা ওদের সব ক'টি জাহাজ ধ্বংস করে দিয়েছি।'

পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল বদরিয়া। সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললঃ 'মোবারক হোক বেটা, বেঁচে থাক।'

ঃ 'ওসমানও ওখানে, এই এক্ষুণি এসে পড়লেন বলে।'

বদরিয়া ফিরে গিয়ে আবার কোরান শরীফ খুলে বসল।

মনসুর আসমার দিকে ফিরে চাপা কণ্ঠে বললঃ 'তোমাকে বলেছিলাম না, আমি এক বড় নাবিক হব। আমার জাহাজের নিক্ষিপ্ত গোলায় দুশমনের দু'টো জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। নৌ প্রধানও আমার উপর খুশী। উচ্চ প্রশিক্ষণ নিতে আমাকে এক বছরের জন্য ইস্তাম্বুলের নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হবে। নৌ প্রধানের কাছে থাকলে যা শিখব, ওখানে যে তারচে নতুন কিছু শেখা যাবে তা নয়, বরং তার মতে ওখানে সরকারের পদস্থ লোকদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতে এ পরিচিতি আমার কাজে আসবে।'

ঃ 'ভাল।' মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বলল আসমা, 'বড় বড় লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা তো ভাল, কিন্তু ......।'

ঃ 'কিন্তু কি?'

ঃ 'না, কিছু না।'

ঃ 'দেখো আসমা, কোন কথা পেটের ভেতর রাখা ঠিক না। তোমার চোখে মুখে চিন্তা আর ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।'

ঃ 'তোমার সাথে যে রাগ করতে পারি না, তা তুমি নিজেও জান।'

ঃ 'তাহলে তুমি চিন্তা করছ কেন?'

ঃ 'ইস্তাম্বুলে বড় বড় লোকদের সাথে তোমার সম্পর্ক সৃষ্টি হলে আমি বরং খুশীই হব। পৃথিবীর বিখ্যাত আর মনোরম শহরে থেকে আমাদের ভুলে গেছ এ অনুযোগ কখনো করব না।'

ঃ 'বলতে পার আসমা, পৃথিবীর কোন স্থানটি সবচে সুন্দর!'

ঃ 'প্রথম ছিল গ্রানাডা, এখন জানি না, তবে আব্বা বলেন ইস্তাম্বুল নাকি বড় সুন্দর শহর।'

ঃ 'আমি বলব?'

ঃ 'বল!'

ঃ 'আমার কথা বিশ্বাস করবে?' মনসুরের ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি।

ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন করব না।'

ঃ 'আসমা! এ মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ। পৃথিবীর যেখানেই তুমি থাকবে, সে স্থানটিই হবে সবচে সুন্দর। এমনকি হতে পারে না যে, আমাদের দু'জনের উপস্থিতিতে ইস্তাম্বুল হয়ে উঠবে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয়। ....আসমা, তোমাকে ছাড়া আমি জীবনের কোন কল্পনাও করতে পারি না।'

আসমার চেহারায় আনন্দ আর তৃপ্তির অনাবিল দ্যুতি ছড়িয়ে গেল। বদরিয়া বারান্দা ধরে এগিয়ে এল।

ঃ 'বাচাল মেয়ে, ওকে এখনো বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ। নাস্তা করেছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করোনি?'

ঃ 'আমি নাস্তা করে এসেছি খালাম্মা।'

ঃ 'তাহলে ভেতরে এসে বস।'

একটি প্রশস্ত কক্ষে এসে বসল ওরা। মনসুর বললঃ 'খালাম্মা! আবুল হাসানের ব্যাপারে ওসমানের কাছে আমি সব শুনেছি। অভিযানে আমিও যেতে চাই। মামার জন্য সে অনেক কিছু করেছে।'

ঃ 'হ্যাঁ বাবা! তিনি আমাদের সবারই উপকার করেছেন। অনুমতি পেলে আসমার আব্বা নিজেও এ অভিযানে শরীক হবেন। তিনি হয়ত তোমাকেও সাথে নিতে পারেন।'

গভীর রাত। চার মাল্লার একটি নৌকা খোলা সাগর থেকে খালে এসে পড়ল। কিছু দূর চলার পর হাঁটু পানিতে এসে নৌকা থামল। ওসমান পাড়ে নেমে বললঃ 'তোমরা এখানেই থাক। আমি জিনিসপত্র লুকানোর একটা ব্যবস্থা করে আসি।'

ঃ 'আমি আপনার সাথে যাব।' আবু আমের বলল।

ঃ 'ঠিক আছে। কিছু জিনিস হাতে নিয়ে নাও। কোদালটাও নিও।'

আমের বারুদ বোঝাই কাঠের বাক্স এবং কোদাল তুলে নিয়ে ওসমানের পেছনে হাঁটা দিল। ওসমান পাহাড়ের টিলার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললঃ 'আশপাশে তো কোন আবাদী জমি চোখে পড়ছে না। নকশা অনুযায়ী এ এলাকা সাগর থেকে ছ'সাত মাইল বেশী দূরে হওয়ার কথা নয়। ডন লুইয়ের কেল্লার পথ তো এদিকেই। ভোর হবার পূর্বেই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিচে নরম মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। সময় মতো এগুলো আমরা অন্যত্র নিয়ে যাব।'

আবু আমের টিলা থেকে নিচে নেমে এল। খানিক খোঁজাখুঁজির পর বললঃ 'মাটি খোঁড়ার দরকার নেই। এ গর্তটার মধ্যে ওগুলো রেখে পাথর বালি দিয়ে ঢেকে দিলেই চলবে।'

ওসমান গর্তটি দেখে বললঃ 'তুমি দাঁড়াও। আমি এক্ষুণি আসছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে মাল্লারা বারুদের আরো চারটি বাক্স, পিস্তল, বন্দুক এবং তলোয়ার নিয়ে এল। সবাই মিলে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ওগুলো গর্তে রেখে বালি এবং কাঁকর দিয়ে ঢেকে দিল। এরপর মাল্লারা ফিরে গেল নৌকা নিয়ে। ওসমান এবং আবু আমের টিলার উপর দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় জানাল। ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে গেল ওরা।

ঃ 'তোমার ঘুম এলে শুয়ে পড়ো আমের।' ওসমান বলল, 'ভোর হওয়ার পূর্বে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে কি কারো ঘুম আসতে পারে! ভয় হচ্ছে, আমরা আবার ভুল জায়গায় নামিনি তো! তবে তো এসব জিনিসপত্র অনেক দূরে ফেলে যেতে হবে।'

ঃ 'তোমার বর্ণনা যদি সঠিক হয়, তবে ভোর হওয়ার সাথে সাথে তুমি ডন লুইয়ের মহল দেখতে পাবে। মানচিত্রে সালমানের দেয়া চিহ্ন ভুল হতে

পারে না। ইনশাআল্লা সকালেই আমরা ওর গ্রামে থাকব। এরপর তোমার সতর্ক তৎপরতার উপর আমাদের বিজয় অথবা মৃত্যু নির্ভর করবে।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার জীবন আমার কাছে অনেক প্রিয়। আমি আবার বলছি, পাদ্রীদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন না, কোন মুসলমানকে গালমন্দ করে ক্ষেপিয়ে দিতে পারলে সহজেই আমরা কার্যোদ্ধার করতে পারব।'

ঃ 'এ কথা তো অনেক বার শুনেছি।'

ঃ 'আপনাকে আরও বলেছি ডন লুইয়ের চাকর বাকরদের মধ্যে ইহুদীও আছে। আমাদের উপর ওদের কারো সন্দেহ হলে সাথে সাথে ডন লুইকে বলে দেবে। সে চাকর বাকরদের ভাল খাওয়া পরার দিকে যেমন নজর রাখে তেমনি নির্দেশ অমান্যকারীকে কঠিন শাস্তি দেয়।'

ঃ 'আরে দোস্ত, এ কথা তো কয়েকবার বলা হয়ে গেছে।'

ঃ 'এ অভিযানে এ ছাড়া নতুন কিছুই আমার মাথায় আসছে না।' বিনয়ের সাথে বলল আমের।

ভোরের সোনালী আলোয় ওসমান এবং আমের টিলার ওপর উঠে এল। উত্তরে উঁচু টিলার ওপর দেখা যাচ্ছে ডন লুইয়ের কেল্লার মতন বিশাল বাড়ি। ডানে সাগর। বেলাভূমির পাহাড় শ্রেণী থেকে খানিক সরে এসে এক সবুজ শ্যামল উপত্যকা। পশ্চিমে মাইল খানেক দূরে বাগানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি গ্রাম।

ঃ 'খোদার কসম এখন আমরা ডন লুইয়ের জায়গীরের মধ্যে।' আবু আমের বলল, 'রাতের আঁধারে এত কাছে আসতে পারবেন আমি ভাবতেও পারিনি। অই ওদিকে দেখুন, ডন লুইয়ের মুসলমান কৃষকদের গ্রাম। মুসলমানরাই আগে এসবের মালিক ছিল। এখন খৃস্টান জমিদারের প্রজা। গ্রানাডা থেকে স্থলপথে এখানে আসার সময় অনেক স্থানে নারঙ্গী আর জয়তুনের বাগান দেখেছেন। বাগানের আশপাশের ভাঙ্গা বাড়িগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, এসব এলাকা মুসলমানরাই আবাদ করেছিল। স্পেনের অসংখ্য তুঁতগাছও মুসলিম সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। মুসলিম রমণীরা রেশম ঘুটির চাষ করতো। চলুন! আমরা আগে ওই গ্রামে যাব। খুব ক্ষুধা পেয়েছে। হয়তো ওখানে খাবারও পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওরা কারো সাথে কথা বলতে ভয় পায়। অপরিচিত লোকদের মনে

করে গীর্জার গুপ্তচর।'

পায়ে পায়ে গাঁয়ের কাছে চলে এল ওরা। যয়তুন বাগানের ফাঁকে একটি বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়তে লাগল। এক বৃদ্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। আমের সালাম দিল তাকে। বুড়ো কিছু বললেন না, চোখে মুখে প্রশ্ন নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ 'আমরা গ্রানাডা থেকে এসেছি। আপনি আরবী বলতে পারেন?' বলল আমের। বৃদ্ধ এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেনঃ 'না, একজন গোলামের কোন ভাষা বা দেশ থাকে না। তার মুনীবের পছন্দের ভাষাতেই তাকে কথা বলতে হয়। তোমরা বলছ গ্রানাডা থেকে এসেছ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দক্ষিণের কোন মুসাফির উত্তরে আসে না। পথে এমন কিছু স্থান পড়ে কোন পথিক ভুল করে আরবী বললেও গুপ্তচর তাকে ধরে খৃষ্টবাদের কোন বন্দীখানায় আটকে রাখে।'

ঃ 'মুনীব আমাদেরকে ডন লুইয়ের কাছে পাঠিয়েছেন।'

ঃ 'তোমরা তার কাছেই এসেছ, তবে আসল পথ থেকে কিছুটা দূরে।'

ঃ 'আমরা বার্সিলোনাগামী জাহাজে ভ্রমণ করছিলাম।' ওসমান বলল, 'ক্যাপ্টেন আমাদেরকে গত রাতে এক বিরাণ ভূমিতে নামিয়ে বলল, কাউন্ট ডন লুইয়ের গ্রাম বেশী দূরে নয়। আমার মনে হয় রাত বলে সে ভুল করেছিল। আমরা বেলাভূমি ধরে হাঁটছিলাম, ভোরের আলোয় সবুজ গ্রাম দেখে এদিকে এসেছি। ধারণা ছিল, এখানে হয়তো কোন মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে যেতে পারি।'

বৃদ্ধ ওসমানের হাত ধরে বললেনঃ 'তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এসো, খানিকটা বিশ্রাম কর।'

ওসমান ও আবু আমের বৃদ্ধের সাথে বারান্দা পেরিয়ে এক ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধ তাদেরকে একটি পুরনো কার্পেটে বসিয়ে বললেনঃ 'আমার নাম ইব্রাহিম।'

ঃ 'আমি আবু আমের। ইনি আমার ভাই ওসমান।'

ঃ 'জমিলা, আরে ও জমিলা, এদিকে এসো।'

তিরিশের কাছাকাছি বয়সের এক যুবতী ওড়না ঠিকঠাক করে এগিয়ে এল। বৃদ্ধ বললেনঃ 'মা! এদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা কর। এরা অনেক দূর থেকে এসেছেন।'

ঃ 'মাফ করবেন! আমরা আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না।'

ঃ 'মেহমান ঘর থেকে খালি মুখে ফিরে গেলেই বরং বেশী কষ্ট পাব। বিপদে আমরা হয়তো আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। অথবা বিপদ দেখলে আপনার সাথে পরিচয় হয়েছে হয়তো তাও অস্বীকার করব। কিন্তু আমার এক ভাইকে খাওয়াতে পারব না, খৃস্টানরা এখনো আমাদের কাছে এ দাবী করেনি। জমিলা, জলদি কর মা।'

ঃ 'কিন্তু আমাদেরকে দেখে আপনি ভয় পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল।'

ঃ 'এখন প্রতিটি মানুষই অপরিচিত কাউকে দেখলে ভয় পায়। দমন সংস্থা আমাদের এতটা ভয়ের মধ্যে রেখেছে যে, নিজের ছায়া দেখলেও আমরা চমকে উঠি।'

ঃ 'খোদার শোকর বেলেনসিয়ায় দমন সংস্থার নিয়মিত অফিস বসেনি। অন্য এলাকার ইহুদীদের মতো মুসলমানদের সাথে খারাপ ব্যবহার হবে না বলেও মুসলমানরা আশাবাদী।'

বৃদ্ধ সন্দেহের দৃষ্টিতে আমেরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আপনি বেলেনসিয়ার অবস্থা জানেন না অথবা ইচ্ছে করে লুকোচ্ছেন। আপনি কি জানেন, নিয়মিত দমন সংস্থার শাস্তির চাইতে অনিয়মিত দমন সংস্থার শাস্তি অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক।'

এক যুবক পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এসে বললঃ 'নানাজান, দমন সংস্থার শাস্তি কোনটা বেশী কষ্টকর আর কোনটা কম কষ্টের তা শাস্তিপ্রাপ্তদের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। স্বীকার করতে হবে, ইহুদীদের পরে স্পেনে মুসলমানরা দমন সংস্থার কুদৃষ্টিতে পড়েছে। একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে তার তৃষ্ণা কখনো মেটে না।'

ঃ 'ওবায়েদ! কথা বলার সময় সতর্ক থাকা উচিত।'

ঃ 'নানাজান! সারা রাত কাজ করে এসে শুয়েছিলাম মাত্র। মেহমানের কণ্ঠ শুনে ভাবলাম মরক্কো থেকে হয়তো আমাদের কোন প্রিয়জন এসেছেন।'

ঃ 'কাজ শেষ করেছ?'

ঃ 'হ্যাঁ! কাজ দেখে কাউন্ট নিশ্চয়ই খুশী হবে। প্রতিশ্রুতির চাইতে একদিন আগেই কাজ শেষ করেছি। খেয়েদেয়ে জিন নিয়ে রওনা হব। পারিশ্রমিক ছাড়াও আশা করি কিছু পুরস্কার পাব।'

বৃদ্ধ বললেনঃ 'আমার নাতি। ওর বাবা বেলেনসিয়া শহরে ঘোড়ার জিন

তৈরী করে। ওবায়েদ কাউন্টের জন্য একটি জিন তৈরী করেছিল। কাউন্ট পিতার চাইতে ছেলের কাজ বেশী পছন্দ করে তাকে নিজের জায়গীরে নিয়ে এসেছেন। ওর অন্য তিন ভাইয়ের একজন জুতার কারিগর, একজন থাকে বাপের সাথে, আর একজন পোশাক তৈরী করে।'

ঃ 'খুব ভাল কথা।' ওসমান বলল, 'ওবায়েদ এবং তার ভাইয়েরা যে কাজ শিখেছে সব সময়ই খৃষ্টানদের তার দরকার হবে। কিন্তু ডন লুইয়ের সাথে আপনার কি সম্পর্ক তা তো বললেন না।'

ঃ 'আমি তার চাকর এবং কৃষক প্রজা। এ বাড়ির আশপাশের সব বাগান আমার। জায়গীরদার হিসাবে ডন লুই বাৎসরিক খাজনা উসুল করে। আমার তিন ছেলে তার বিশাল এলাকায় জয়তুন এবং নারঙ্গীর গাছ লাগাচ্ছে। মজুরী ছাড়াও আমরা কিছু সুবিধা পাচ্ছি। জয়তুন এবং নারঙ্গীর চারাগাছের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তার বাগানে কোন সমস্যা দেখা দিলেই সে আমায় ডেকে পাঠায়। খৃস্টানদের মধ্যে আমাদের মতো কৃষক এবং শিল্পী তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজন থাকবে। কিন্তু ইনকুইজিশনের ক্ষুধার্ত নেকড়ে খুব বেশী দেরী করবে না। আমরা অধিক পরিশ্রম করি এবং অধিক আয় করি খুব শীঘ্র এটিও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।'

বৃদ্ধ ইব্রাহীম চঞ্চল হয়ে অতিথিদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'এই ছেলে কবে যে মুসবিতে ফেঁসে যাবে! তখন কাউন্ট অথবা তার স্ত্রীও কোন সাহায্য করতে পারবে না। শহর থেকে এখানে এসে ওর বাপ ভীষণ খুশী। কিন্তু আমি বলেছি, বেঁচে থাকতে হলে এখন আমাদের জবান সংযত রাখতে হবে। কমপক্ষে ইনকুইজিশনের ব্যাপারে মুখ খোলাই উচিত নয়। এসব বোকারা গ্রেফতার হয়ে ইনকুইজিশনের হাতে পড়লে আরো অনেক নিরপরাধ লোকের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য হবে। ফলে অসংখ্য খান্দান ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়াবে। ও জানে, ডন লুইয়ের গ্রামে গীর্জার পাদ্রীর হুকুমে কয়েকজন গোলামকে কি কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। বেলেনসিয়ার বিশপের নির্দেশ ছিল, সব অপরাধীকেই যেন ওখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ডন লুইয়ের চেষ্টায় তা করা হয়নি। বিশপকে খুশী করার জন্য গীর্জার কাছেই একটি কয়েদখানা নির্মাণ করা হয়েছে। গীর্জার প্রাদ্রীও ইনকুইজিশনের জন্য কাজ করে, কয়েদখানায় এখনো সাত আটজন লোক আছে। গীর্জার পাদ্রী ডন লুইয়ের সেসব গোলামকে জোর করে খৃস্টান

বানিয়েছে। ওখানে তাদের রাখা হয়েছে। 'আমি মুসলমান' এ কথা বলায় এক নওজোয়ান কয়েকবার বেত খেয়েছে। সে বলে, 'আমি ব্যাপ্টাইজ করিনি।' এরপর কিছুদিন চুপচাপ। কোনও এক গুপ্তচর পাদ্রীকে বলেছে, ও গোপনে নামায পড়ে। আর কাউকে না হলেও ওই যুবককে দমন সংস্থার হাতে তুলে দেয়া হবে এ কথা এখন গাঁয়ের সকলের মুখে মুখে।

সে একজন ভাল অশ্বারোহী এবং ঘোড়ার রোগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে বলে এখনও বেঁচে আছে। মালিক ঘোড়া কেনাবেচার জন্যও তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তার এখানে আসার কয়েক মাস পর আমি প্রথম তাকে দেখেছিলাম। তখন সে একটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছিল।

আমার মনে হয়েছিল ও নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরের নয়নের মণি। ইনকুইজিশনের হাতে গ্রেফতার হলে যে কি নিদারুণ যন্ত্রণা দেয়া হয় খোদার দিকে চেয়ে ওবায়েদকে তা বুঝিয়ে বলুন। ওই যুবককে যে কত শাস্তি দেয়া হয়েছে তা আল্লাহই জানেন। ওবায়েদ বলেছে, ও যে বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্য। গুপ্তচররা ওবায়েদের কোন কথা শুনে ফেললে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব।'

ঃ 'নানাজান! আমরা নিজের ঘরে কথা বলছি। মেহমানদের সন্দেহ করা হচ্ছে তারা যেন তা মনে না করেন।'

ঃ 'বেটা! আমি যা বলেছি তাতেই আমাকে গ্রেফতার করা যায়। আমার কাজ তো শেষ। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত।'

নিরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ। নিরবতা ভেঙ্গে ওসমান বললঃ 'আপনি কি ওই যুবকের নাম জানেন?'

ঃ 'কার নাম! কয়েদখানার ছেলেটির?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'ওকে জন নামে ডাকা হয়। আসল নাম হয়তো অন্য কিছু ছিল।'

ঃ 'ওর আসল নাম আবুল হাসান।' ওবায়েদ বলল, 'বড় মামা ওকে ভাল করে চেনে।'

ঃ 'ঘরে বসেই যেন এ বেআক্কেলটা সব কিছু বলতে পারে।'

ঃ 'নানাজান! আমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। ঘরের বাইরে নিজের ছায়াকেও ভয় পাই আমি। কিন্তু পাশের কামরায় বসে মেহমানদের কথা শুনে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে, এরা আরব এবং মুসলমান। ওদের সাথে দুটো কথা বলা এবং নিকট থেকে দেখার আগ্রহ আমাকে এখানে

টেনে এনেছে।’

ঃ ‘এখন তুমি কি করতে চাও।’

ঃ ‘কিছুই না। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত দোয়া বলছে, হায়! এরা যদি গ্রানাডা থেকে না এসে আফ্রিকার কোন শহর থেকে এসে বলত, তোমাদের স্বপ্ন পূরণের সময় এসে গেছে। সাগরে জাহাজ অপেক্ষা করছে, তোমরাও সাথে যাবে।’

আবু আমেরের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ওসমানের মুখ থেকেও কোন কথা সরল না। নিজেকে কিছুটা সংযত করে ওসমান বললঃ ‘ওবায়েদ, এখান থেকে হিজরত করতে চাইলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। কথা দিচ্ছি, আমার সাধ্যে কুলালে অবশ্যই তোমার স্বপ্ন পূরণ করব।’ ওবায়েদ ওসমানের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা।

ঃ ‘আমরা মনে মনে স্বপ্ন দেখি, খৃষ্টানদের পরিবর্তে তুর্কী মুজাহিদদের জন্য জিন তৈরী করব। শুনেছি মরক্কোর জাহাজ দক্ষিণের বন্দরগুলো থেকে মুজাহিদদের তুলে নেয়। এ জন্য অনেক ভাড়া দিতে হয়। ভাড়ার জন্য চিন্তা করি না। আমি বেশ কিছু টাকা জমা করেছি। আব্বাজানের কাছ থেকেও অনুমতি নিয়ে রেখেছি, সুযোগ পেলেই হিজরত করব। আমি ইনকুইজিশনকে ভীষণ ভয় করি। আপনি কি দক্ষিণের বন্দর থেকে আমার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারবেন? আপনাকে বেশ অভিজ্ঞ মনে হয়।’

ওসমান গভীর চোখে প্রথমে ওবায়েদ পরে বুড়োর দিকে তাকাল, তার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

ঃ ‘ওবায়েদ! এখানে জাহাজের ব্যবস্থা করা কি খোদার জন্য অসম্ভব?’

ঃ ‘ওবায়েদ! খাবার নিয়ে যাও।’ দরজার আড়াল থেকে রমণী কণ্ঠ ভেসে এল। বেরিয়ে গেল ওবায়েদ।

খেতে বসেছে সবাই। আরবীয় ঐতিহ্যে ভরা একটি স্বচ্ছল পরিবারের চিহ্ন। কয়েক গ্রাস মুখে পুরে আমের বৃদ্ধকে বললঃ ‘ডন লুই এখন কোথায় বলতে পারেন?’

বৃদ্ধ ওবায়েদের দিকে তাকাল। সে বললঃ ‘গত পরশু বাড়ি ফিরেছে। কাল মামা তাকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেখেছে।’

ঃ ‘তুমি বারনিগুোকে চেন?’

ঃ ‘সেও এখানে। আপনি তাকে কবে থেকে চেনেন?’

ঃ 'কয়েক বছর পূর্বে আমি মাস কয়েক ডন লুইয়ের কাজ করেছি। এসব এলাকা আমি চিনি। আপনার ছেলেদের কেউ হয়তো আমায় চিনতেও পারে।'

ঃ 'মামা সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়বেন। কোন সমস্যা না থাকলে আমাদের এখানে কয়েকদিন বেরিয়ে যাবেন। ডন লুইয়ের গ্রামের খবর এখানে বসেই পাবেন।'

ঃ 'গীর্জায় কি পাদ্রী ফ্রান্সিসই আছেন না নতুন কেউ এসেছেন।'

ঃ 'না, ফ্রান্সিস এখনো আছেন।'

খাবার শেষে আমের বললঃ 'এবার আমাদের উঠতে হয়।'

ঃ 'বেশী জরুরী হলে আপনাদের আটকাব না। তবে থাকলে খুশী হব।'

ঃ 'বারনিগ্তোর সাথে দেখা করে লুইয়ের জন্য আনা সংবাদ তাকে দিতে হবে। এরপর আমরা স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের সাথে এ সাক্ষাৎ আমাদের শেষ দেখা নয়।'

ওবায়েদ বললঃ 'আপনাদের যখন ইচ্ছে হবে আসবেন। আমি আপনাদের আসার অপেক্ষায় থাকব।'

ঃ 'ওবায়েদ, তুমি এদের সাথে যাও। সোজা পথটা দেখিয়ে দিও। কাউন্টের জিন না হয় পরে দিয়ে এস।'

বাগানের দীর্ঘপথ ঘুরে দু'ঘন্টা পর ওরা ডন লুইয়ের গ্রামের পথে এসে পড়ল। কেল্লা ও মহল ওখান থেকে মাইল তিনেক দূরে।

ঃ 'আপনারা নদী পথে এসেছেন একথা কাউকে বলবেন না।'

ঃ 'কেন?'

ঃ 'কোন মুসলমানকে সাগর পাড়ে নামিয়ে দিলে পাহাড়ীরা আগে পুলিশে খবর দেয়। খোঁজ খবর না নিয়ে পুলিশ কাউকে গ্রামে ঢুকতে দেয় না। আপনি বার্সিলোনার জাহাজের কথা বলতেই নানাজানের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, আপনি বাইরে থেকে এসেছেন। এ কথা তিনি আপনাকে বলেননি। আপনি ডন লুইয়ের কেল্লায় যাবেন জেনেও ক্যাপ্টেন আপনাকে অচেনা বিরান স্থানে নামিয়ে দেবেন এ হতে পারে না। এখন বারনিগ্তো আপনাদেরকে সন্দেহ করলে গ্রেফতারী নিশ্চিত।'

ওসমান স্নেহ ভরে ওবায়েদের কাঁধে হাত রেখে বললঃ 'ওবায়েদ! তোমার নানা, মামা এবং ভাই যদি তোমার মতো ভাবে, তবে তাদের কানে কানে বলো– যে কোন সময় উপকূলে একটি জাহাজ এসে ভিড়বে।

সেটাতে চড়ে বিনে পয়সায় চার-পাঁচশত লোক সফর করতে পারবে।'

আবেগের আতিশয্যে ওবায়েদ ওসমানকে জড়িয়ে ধরে অতি কষ্টে কান্না রোধ করে বললঃ 'আপনার ইশারায় সবাই জীবন দিতেও প্রস্তুত।'

ওসমান কি ভেবে বললঃ 'কাউন্টের জিন দিতে আজ না গিয়ে কাল গেলে হয় না?'

ঃ 'কোন কাজ থাকলে না হয় দু'দিন পরেই গেলাম।'

ঃ 'না, তুমি কাল এস। অবস্থা ভাল হলে আমি অথবা আমরা দু'জনই তোমার সাথে চলে আসব। রাতের আঁধারে কিছু জিনিস নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে হবে। এ জন্য তোমার মামার সহযোগিতার দরকার হতে পারে। আমাদের অনুপস্থিতিতে তাকে বুঝানোর দায়িত্ব তোমার।'

ঃ 'তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। মালপত্র কোথায় বললে আমি ওখানে পাহারা দেব।'

ঃ 'তোমার এতটা উতলা হওয়ার দরকার নেই। তুমি শুধু তোমার বাড়ির আশপাশে কোন নিরাপদ জায়গা দেখে রাখবে। এবার যাও। দেখো, বাড়ির বড় ছোট কারো সাথে এসব আলাপ করো না। খোদা হাফেজ।'

ঃ 'খোদা হাফেজ।'

দু'জনের সাথে মোসাফেহা করে ওবায়েদ বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

মরিসকো

গাঁয়ে পৌঁছেই আমের এক লোকের কাছে বারনিডোর কথা জিজ্ঞেস করে জানল সে একটু আগে গোলামদের দেখাশোনার জন্য ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ওসমানকে বললঃ 'সে হয়তো সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। তার অনুপস্থিতিতে কাউন্টের সাথে দেখা হলেই ভাল হয়। কাউন্ট বিকেলে ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে যাবে। আমি আস্তাবলের সামনেই তার অপেক্ষা করব।'

ঃ 'কাউন্টের অপেক্ষায় না থেকে আমি বরং এলাকাটা একটু ঘুরে দেখি। সে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলো আমার ভাই কখনো আলফাজরার

বাইরে যায়নি। ও সাগর আর নৌকা দেখতে গেছে।'

ঃ 'আপনি আমার স্ত্রীর ভাই এ কথা যেন মনে থাকে। দেখাশোনা শেষে আস্তাবলের সামনে আসবেন। কাউন্ট বের না হলে বারনিগোর সাথে আস্তাবলের সামনেই দেখা হবে। সে সোজা এদিকেই আসবে। আস্তাবল কোথায় জানেন তো?'

ঃ 'ওই সামনে দেয়ালের ওপাশে।'

ঃ 'ওদিকে তো গোলামরাও থাকে। গোলামদের ঘর পেরিয়ে ডানের পথ ধরে সামনে এগিয়ে গেলে সড়কের বাম পাশে আস্তাবল। ডানে শুকনো ঘাসের স্তূপ। আস্তাবল পেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলেই কাউন্টের কেল্লার দরজা। আপনি কিন্তু ওদিকটায় যাবেন না।'

ঃ 'আজ আমি শুধু নদীটাই দেখব।'

ঃ 'নদী কেল্লার পূর্ব পাঁচিলের খুব কাছে। আরেকটু এগোলে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সাগর দেখা যায়। আপনি কেল্লার দরজা থেকে দূরে থাকবেন। নতুন লোক দেখলে পাহারাদাররা নানান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে।'

ঃ 'তুমি ভেবো না, আমি ওদের দৃষ্টি থেকে দূরেই থাকব।' বলেই ওসমান হাঁটা দিল।

কেল্লা থেকে মাইলখানেক দূরে নদী। নদীর দু'পাশে আট দশটি নৌকা বাঁধা। বাঁয়ে কেল্লার পাঁচিলের কাছে একটি ছোট্ট জাহাজ নোঙ্গর করা। দেখলেই বুঝা যায় এর মালিক যথেষ্ট বিত্তশালী। নৌকাগুলো জেলেদের। নদীর পাড়ে ভেজা জাল শুকোতে দেয়া হয়েছে। এক যুবক টুকরী হাতে নৌকায় উঠছে। ওসমান এগিয়ে স্পেনিশ ভাষায় প্রশ্ন করলঃ 'তুমি কি একাই মাছ ধরতে যাচ্ছ?'

ঃ 'মাছ ধরা শেষ হয়েছে।' ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্পেনিশ ভাষায় বলল যুবক, 'এখন নদীর ওপারে মাছ বিক্রি করতে যাচ্ছি।'

ওসমান আরবীতে জিজ্ঞেস করলঃ 'তুমি কি আরব?'

ঃ 'না আমি বারবারী।' আরবীতেই বলল যুবক, 'এখন আমাদের মরিসকো বলে। আরবদের ওরা এ নামেই ডাকে।'

ঃ 'ওরা কারা?'

ঃ 'পাদ্রী ফ্রান্সিস, যারা আমাদের জোর করে খৃস্টান বানিয়েছে। তাদের নির্দেশ দীক্ষা প্রাপ্ত মুসলমানদেরকে 'মরিসকো' ছাড়া অন্য কোন নামে ডাকা যাবে না।'

ঃ 'আমার ধারণা ছিল, নতুন খৃষ্টানদের সাথে ওরা ভাল ব্যবহার করে।'

ঃ 'আমরা কখনো মুসলমান ছিলাম, পাদ্রী ফ্রান্সিস এবং অন্যরা এ কথা ভুলতে নারাজ। আপনি কি মরিসকো নন?'

ঃ 'না, আমি আলফাজরা থেকে এসেছি। এ গজব থেকে এখনও আমরা মুক্ত।'

বৈঠা হাতে নিতে নিতে যুবক বললঃ 'আরো সতর্ক হয়ে কথা বলবেন। মরিসকোদের কেউ কেউ ফ্রান্সিসের গুপ্তচরও হতে পারে।'

ঃ 'এর আগে আমি কখনো সাগর দেখিনি।'

ঃ 'আরে এতো ছোট্ট একটা নদী। সাগরের কোন কুল কিনারা থাকে না। ওখানে বিশাল বিশাল ঢেউ উঠে।'

ঃ 'ওখানে মাছ খুব বড়?'

ঃ 'অনেক বড়। মানুষ খেকো মাছেরা আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলে।'

ঃ 'এখানে যদি মানুষ খেকো মাছ না থাকে আর এ নৌকা দু'জনের ভার বইতে পারে, আমায় একটু ওপারে নামিয়ে দাও। ওখানে একটু ঘুরে আবার ফিরে আসব।'

ঃ 'বসে পড়ুন। এ নৌকা সাত আটজন লোক বহন করতে পারে।'

ওসমান নৌকায় উঠে বসল। যুবক বৈঠা চালাতে চালাতে বললঃ 'আপনি কোথায় থাকেন?'

ঃ 'আমি এবং আমার ভগ্নিপতি আজই এখানে এসেছি। কাউন্ট আমাদেরকে কোথায় রাখবে জানি না, এটা তার ব্যাপার। তবে আমার ভগ্নিপতির সাথে তার বেশ ভাল সম্পর্ক। মনে হয় ভাল জায়গায়ই রাখবে। ভাবছি, চাকরী পেলে বাড়ির সবাইকে এখানে নিয়ে আসব।'

ঃ 'চাকরীর জন্য এত দূর এলে। আমার কাছে কেমন আশ্চর্য লাগছে।

ঃ 'ডন লুই আমার ভগ্নিপতিকে আসতে বলেছিল। এখানে থাকব কি থাকব না, অবস্থা দেখে সে সিদ্ধান্ত নেব।'

ঃ 'কাজ জানলে ডন লুই আপনাকে যেতে দেবে না। যে কোন ছুতায় হোক এখানে রেখে দেবে।'

ঃ 'তাতে কি। যে মুনিব আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন তিনি ডন লুইয়ের বন্ধু। তা ছাড়া আমার ভগ্নিপতি আগেও এখানে ছ'মাস থেকে গেছে।'

ঃ 'দোয়া করি যেন ভালয় ভালয় বাড়ি যেতে পারেন। কারণ এখানে

মুসলমানদের কোন ভবিষ্যত নেই।'

ঃ 'তোমার নাম কি?'

ঃ 'ডন কারলু। তবে আসল নাম বলতে পারছি না। আপনি হয়তো জানেন না, মরিসকোর দু'টো নাম থাকে। একটা খৃস্টান অপরটি মুসলিম। এক নামে তাকে ডাকা হয়, অন্য নাম খোদিত থাকে তার হৃদয়ে।'

ঃ 'পাদ্রী ফ্রান্সিসের মতো লোকদের ভয়ে?'

ঃ 'হ্যাঁ?'

ঃ 'পাদ্রীর বাড়ি বেশী দূরে না হলে আমিও তোমার সাথে যাব।'

ঃ 'গীর্জার পাশেই তার বাড়ি। গীর্জাটিও গ্রামের শুরুতেই। কিন্তু কোন মুসলমানের তার কাছে যাওয়া মানে বিপদ। সে চায় মুসলমানরা হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে চুমো খাক।'

ঃ 'আমি তা পারব। তাকে বলব, ডন লুইয়ের মুখে আপনার গুণের কথা শুনে কদমবুসি করার জন্য এসেছি।'

ঃ 'কিন্তু যদি জানতে পারে আপনি মুসলমান, তবে ব্যাপ্টাইজ না করে ছাড়বে না।'

ঃ 'কাউন্টের জায়গীরে তো আরো কতো মুসলমান প্রজা আছে?'

ঃ 'ওরা পাদ্রীর কাছ থেকে দূরে থাকে। পাদ্রী নিজেও গ্রামে যেতে ভয় পায়।'

ঃ 'পাদ্রীর কয়েদখানা কোথায়?'

ঃ 'পাদ্রীর বাড়ির সাথে। ওখানে আমাদের গ্রামের এক পাহারাদার আছে। পাদ্রীর সাথে সাক্ষাতের পর গ্রেফতার না হলে আপনাকে আমি সাথে নিয়ে আসব। কালারা মাছ খুব ভাল রান্না করে।'

ঃ 'কালারা কে?'

ঃ 'আমার স্ত্রী।'

ঃ 'সন্ধ্যার পূর্বেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। সময় সুযোগ হলে তোমার বাড়িতে অবশ্যই যাব। তোমাদের গ্রামে ইহুদী আছে?'

ঃ 'না, আমরা সবাই মরিসকো। এমরিয়া বিজয়ের পর খৃস্টানরা আমাদের ধরে স্পেনের আমীর ওমরাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল। জীবন বাঁচানোর জন্য জেলেদের কেউ কেউ খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এখানে এসে বসবাস শুরু করে। আমরাও মর্সিয়া ছেড়ে বেলেনসিয়ার এ বন্দরের কাছে বসবাস শুরু করি।'

নৌকা তীরে এসে ভিড়ল। প্রায় দু'শ কদম হেঁটে ওরা একটা গাঁয়ে প্রবেশ করল। কারলু ঝাঁপি থেকে ছোট ছোট মাছ বের করে তিনটি ঘরে পৌছে দিয়ে গীর্জার দিকে হাঁটা দিল। চলতে চলতে ওসমান বললঃ 'তুমি যে বললে কয়েদখানার একজন পাহারাদার তোমার গাঁয়ের লোক।'

ঃ 'হ্যাঁ, সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাহারায় থাকে।'

ঃ 'তুমি তাকে ভালোভাবে চেন?'

ডন কারলু মুচকি হেসে বললঃ 'সে আমাদেরই বংশের লোক। খোদা না করুন আপনি বন্দী হলে অবশ্যই আপনাকে মাছ পাঠাব। ওখানে আমার পরিচিত আরো দু'জন আছে। একজন কয়েদখানা পরিষ্কার করে, অন্যজন কয়েদীদের বাবুর্চি, এ দু'জনও আমাদের গ্রামের। ওরা এখানে বেগার খাটে, পাদ্রী ফ্রান্সিস নিজেই নিজের রান্না করে। এ মাছ দেখলে তো খুশীতে আটখানা হয়ে যাবে।'

ওরা পাদ্রীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ডন কারলু ঝাঁকা নামিয়ে এক হাতে প্রায় ৩ সের ওজনের একটি মাছ তুলে অন্য হাতে দরজার কড়া নাড়ল। একজন রাশভারী লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মুখে বসন্তের কালচে দাগ। এক ঝটকায় কারলুর হাত থেকে মাছ তুলে নিয়ে বললঃ 'সাব্বাস বেটা। এ মাছ তো এখন পাওয়াই যায় না।'

ঃ 'এই একটাই পড়েছিল। আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম, এটা আপনাকেই দেব।'

ঃ 'শুকরিয়া। দোয়া করি ঈশ্বর তোমার শিকারে বরকত দিন।'

লোভাতুর দৃষ্টিতে মাছের দিকে চাইতে চাইতে পাদ্রী ভিতরে চলে গেলেন। কারলু খালি ঝাঁকা তুলতে তুলতে বললঃ 'পাদ্রী ফ্রান্সিস ভাল মাছ দেখলে সব কিছু ভুলে যায়। মোরগ এবং ডিমও তার খুব প্রিয়। মাশাআল্লাহ খেতেও পারে। আসুন এবার যাওয়া যাক।'

ঃ 'তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করবে না?'

ঃ 'কোন বন্ধু।'

ঃ 'ওই যে কয়েদখানা পাহারা দেয়? আসলে আমি কয়েদখানা একটু দেখতে চাই।'

ঃ 'ওটা কি দেখার জায়গা হল। ঠিক আছে চলুন। কিন্তু ওখানে কোন কথা বলতে পারবেন না। স্পেনিশ পাহারাদাররা আশপাশের কোথাও থাকতে পারে।'

আরো শ'দুয়েক গজ হেঁটে কয়েদখানার ফটকে পৌঁছল ওরা। দরজা বন্ধ। এক গাট্টাগোট্টা লোক নেজা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারলু তাকে হাতের ইশারায় সালাম করল। মাথা ঝাঁকিয়ে সালামের জবাব দিয়ে সে বললঃ 'আরে, তুমি এখানে কি করছ।'

ঃ 'পাদ্রীকে মাছ দিতে এসেছিলাম। তোমার সাথে তিন চারদিন তো দেখা হয়নি। ভাবলাম, একটু দেখা করে যাই।'

ঃ 'পাদ্রী আমাকে একদিন পর পর বাড়ি যাবার অনুমতি দিয়েছেন। তার জন্য সজি চাষ করতে কিছু সময় ব্যয় করতে হয়। আমায় বেগার খাটতে আর মাত্র ২০ দিন বাকী। পাদ্রী বলেছেন, এরপর শহর থেকে দু'জন লোক আসবে। আচ্ছা, শিকারের অবস্থা কি?'

ঃ 'খুব ভাল। গত মাসে কখনো এত মাছ পড়েনি। তোমার অংশ ঠিক মতই পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।'

ঃ 'ইনি কে?' পাহারাদার ওসমানকে দেখিয়ে বলল।

ঃ 'কাউন্টের কাছে কাজের খোঁজে এসেছে। ঠিক আছে, আজ চলি, তোমার সাথে বাড়িতে দেখা হবে।'

ওরা ওখান থেকে হাঁটা দিল। কিছু দূর এগিয়ে ওসমান বললঃ 'কারলু, কেল্লার আধ মাইল দূরে নদী পারে সামনা সামনি দুটো বুরুজ দেখেছি। ওখানে সম্ভবত সেন্ট্রিও থাকে?'

ঃ 'ভালভাবে দেখলে দেখতেন, দুটো বুরুজের ওপরই কামান রয়েছে। প্রতিটি বুরুজেই রয়েছে তিন থেকে চারজন পাহারাদার।'

ওরা নদী পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করল। ওসমানকে একটি কাঁচা বাড়িতে নিয়ে গেল কারলু। বাড়িতে সংকীর্ণ বারান্দা পেরিয়ে ছোট ছোট দুটি ঘর। ঘরের লাগোয়া ছাপরায় রান্না বান্নার কাজ চলে। এক তরুণী আটা মাখছিল, ওদের দেখে তাড়াতাড়ি বাটিতে রাখা পানিতে হাত ধুয়ে দাঁড়াল। বিস্ময় ভরা চোখে চাইল ওসমানের দিকে। তরুণীর ভরাট ফর্সা চেহারায় এমন এক আকর্ষণ ছিল যা অনুভব করা যায়, বলা যায় না। প্রথম দৃষ্টির পর ওসমান চোখ সরিয়ে নিল।

ঃ 'কালারা, এ আমার বন্ধু।' কারলু বলল, 'ও এখন থাকতে পারছে না। কথা দিয়েছে পরে এসে তোমার রান্না করা মাছ খেয়ে যাবে। আমি শুধু বাড়ির পথ চিনাতে ওকে নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'ঘরে অনেক মাছ আছে। একটু অপেক্ষা করলে অল্প সময়ের মধ্যেই

আমি রান্না করে দিতে পারব।'

ঃ 'এখন নয়।' ওসমান বলল, 'ইনশাআল্লাহ অন্য দিন আসব। কারলু, এবার আমায় অনুমতি দাও।'

ঃ 'চলুন। আমিও আপনার সাথে একটু যাব।'

গ্রামের বাইরে এসে কারলু বললঃ 'আমি সাহায্য করতে পারি এমন কোন ব্যাপার থাকলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার মনে হয় আপনি কোন প্রিয়জনকে খুঁজছেন। আপনি বলেছিলেন, সাগর দেখেননি। কিন্তু নৌকায় উঠার পর আমি বুঝেছি, সাগর এবং নৌকা আপনার জন্য নতুন নয়। তা ছাড়া আপনার নির্ভীক কথাবার্তা থেকে আমি বুঝেছি আপনি যথেষ্ট সাহসী। সাঁতার না জানা লোক নৌকায় উঠলেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়। দেখুন! আমি প্রথমেই বলেছি, আমাদেরকে জোর করে খৃস্টান বানানো হয়েছে। আমরা মনেপ্রাণে এখনো মুসলমান। ঘরে আমরা গোপনে কোরান শরীফ পড়ি। কালারা তো নিয়মিত কোরান তেলাওয়াত করে। ও যদি জানে আপনি মুসলমান, তাহলে দারুণ খুশী হবে। আমার এতসব বলার কারণ, আমায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।'

ঃ 'তোমাকে বিশ্বাস না করলে আমি যে মুসলমান তাও তোমায় বলতাম না। তোমার কাছে অনেক কথা গোপন রেখেছি, কারণ তোমাকে আমি সেই সব বিপদে জড়াতে চাই না, গোপন তথ্য জানার কারণে অনেক সময় যে বিপদ আসে। আমি যখন বুঝব বিপদের আশঙ্কা ছাড়াই তুমি সব কথা শুনতে পারবে, তখন তোমার এ অভিযোগ থাকবে না। এবার আমায় বল, তোমার কয়েদখানার পাহারাদার বন্ধুকে কদ্দুর বিশ্বাস করতে পারি।'

ঃ 'ও আমার বন্ধু। মরিসকো হলেও মুসলমানদের সাথে ওর হৃদয়ের সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। কোন কয়েদী সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি সে দায়িত্ব নিতে পারি।'

কিছুক্ষণ ভেবে ওসমান বললঃ 'একজন কয়েদীর নাম আবুল হাসান। তোমার বন্ধুর মাধ্যমে ওকে শুধু বলবে, সরাইখানার যে কর্মচারী এক আহত ব্যক্তিকে ঘাসের গাড়িতে লুকিয়ে তোমাদের বাড়িতে পৌছে দিয়েছিল, ও তোমাকে সালাম পাঠিয়েছে। তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে এ পয়গাম নিয়ে সে এসেছে। এ কথা কি তোমার মনে থাকবে?'

ঃ 'অবশ্যই থাকবে।'

ঃ 'এ মুহূর্তে পাহারাদারকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি কে, কয়েদী নিজেই বুঝতে পারবে।'

ঃ 'ইনশাআল্লাহ আগামীকালই কয়েদী আপনার পয়গাম পেয়ে যাবে।'

ঃ 'ধন্যবাদ। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাল হয়তো দেখা হবে না। এর পর থেকে আমাকে প্রায়ই নদী এবং সাগর পারে ঘুরতে দেখবে। আবার প্রয়োজন হলে তোমার ছোট্ট নৌকায় করে বেড়ানোর অনুমতি চাইছি।'

ঃ 'গ্রামের সবাই নৌকার মালিক। সাধারণতঃ নৌকা ঘাটেই বাঁধা থাকে। আপনার যখন ইচ্ছে বেড়াতে পারেন, আমার নিজের একটা নৌকা আছে। তবে অনেক বড়। আবার এলে দেখাব।'

ঃ 'কেল্লার পাশে ওই ছোট্ট জাহাজটি কার?'

ঃ 'কাউন্টের স্ত্রী ও অতিথিদের নিয়ে কাউন্ট এতে নৌবিহার করেন।'

নদীর তীরবর্তী যে পথ ধরে এসেছিল ওই পথেই ফিরে যাচ্ছিল ওসমান। একটা ছোট্ট টিলা পার হওয়ার সময় হঠাৎ আবু আমেরকে দেখা গেল। দ্রুত এদিকে আসছে। ওসমানের ওপর দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়াল। তারপর ওখানেই একটা পাথরের ওপর বসে নদীর দৃশ্য দেখতে লাগল।

ঃ 'আমের!' ওসমান কাছে গিয়ে বলল, 'সব ভাল তো? তোমায় কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।'

ঃ 'আপনি এভাবে আমায় পেরেশান করলে পাগল হয়ে যাব। বিকালে ফেরার কথা। এখন সূর্য ডুবতে বসেছে। আমার ভয় হচ্ছিল, ওবায়েদুল্লাহর মতো আর কাউকে আবার সব বলতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন।'

ঃ 'শৈশবে এক সরাইখানায় চাকরী করার সুবাদে এখন ভালমন্দ পার্থক্য করতে পারি। ওবায়েদের চেহারায় লেখা ছিল যে, তাকে বিশ্বাস করা যায়। ঘটনাচক্রে আজো বিশ্বাস করার মতো একজন লোক পেয়ে গেছি। আমি সময় নষ্ট করিনি। অস্ত্রশস্ত্র লুকানোর মতো একটা ভাল জায়গা পাওয়া গেছে। প্রয়োজনের সময় অবস্থান করার মতো বাড়িও খুঁজে পেয়েছি। নদীর ওপারে পাদ্রীর ঘর এবং আবুল হাসানের কয়েদখানাও দেখে এসেছি। আবুল হাসানকে আমার আসার সংবাদ পৌছানোর ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। আমি বুঝেছি, তুমি অপেক্ষা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছ। কিন্তু আসলেই আমি ব্যস্ত ছিলাম।'

ঃ 'আমিও আপনার চেয়ে কম ব্যস্ত ছিলাম না। আপনি চলে আসার পরই বারনিগ্রো এসেছিলেন। তিনি আমাকে কাউন্টের কাছে নিয়ে গেলেন।

তার সাথে অনেক কথা হল।'

ঃ 'তাকে আমার ব্যাপারে কিছু বলেছ?'

ঃ 'আপনার কথা মতোই বলেছি যে আমার স্ত্রীর ভাই। কখনো সাগর দেখেনি, এ জন্য এখানে এসেই বেরিয়ে গেছে। যাক এসব পরে বলব। এবার আপনার কাহিনী বলুন।'

ওসমান তাকে সব ঘটনা শুনিয়ে বললঃ 'বলতে পার আমি অনেক কাজ শেষ করেছি। নদীর দুই পার্শ্বে সামনাসামনি দু'টো কামান রয়েছে। আমাদের জাহাজ আসার আগেই ওগুলো নষ্ট করে দেয়া তেমন কষ্টকর হবে না। আমার মনে হয়, কুদরত প্রতি পায়ে আমাদের সাহায্য করছেন। তোমার মনে আছে তো, খড়ের পালান হঠাৎ জ্বলে উঠলে আমাদের সঙ্গীরা অনেক দূর থেকে এর আলো দেখতে পাবে। প্রস্তুতির জন্য এগারো দিন সময় নিয়েছি বলে এখন দুঃখ হচ্ছে। পাঁচ ছ'দিন পর জাহাজের অপেক্ষা করা ছাড়া এখানে আমাদের কোন কাজ থাকবে না।'

ঃ 'খোদা করুন আমাদের জাহাজ আসার পূর্বে যেন ডন লুইয়ের জাহাজ না আসে।'

ঃ 'ডন লুইয়ের জাহাজ?'

ঃ 'জাহাজ কবে এবং কোত্থেকে আসছে তা তিনি আমায় বলেননি। তবে তার কথাবার্তায় বুঝেছি, অল্প ক'দিনের মধ্যেই জাহাজ পৌঁছে যাবে।'

ঃ 'তার মানে সাগরে ওরা যুদ্ধ জাহাজ জড়ো করছে!'

ঃ 'তিনি তার চাকর বাকরদের নতুন দুনিয়ায় পাঠাতে চাইছেন। ওখানে নাকি অনেক জমি পেয়েছেন। তার কথা শুনে আমার তো মনে হল, তিনি নিজেও সেখানে যাচ্ছেন। আপনার কথা বলতে গিয়ে যখন বললাম, সে সাগর দেখেনি, তিনি বললেন, তাকে সাগরে এমন ভ্রমণ করাব যে, তার মন ভরে যাবে। বারনিগ্তো এবং কাউন্ট আমাকে দেখে ভীষণ খুশী। তারা ভেবেছে, আমরা চাকরীর জন্য যখন এখানে এসেছি, তখন নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিতে পারবেন।'

ঃ 'তুমি বলতে চাইছ, তার জাহাজ তাড়াতাড়ি পৌঁছলে আমাদেরকে জোর করে সাত সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দেবে?'

ঃ 'হ্যাঁ, সম্ভবতঃ এটাই তার ইচ্ছে। আপনার প্রশংসা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, আপনি চমৎকার ঘোড়াগাড়ি তৈরী করতে পারেন। তিনি বললেন, 'আমেরিকায় এমন লোকই আমাদের প্রয়োজন।' আমি এই বলে

তাকে লোভ দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, আলফাজরার কিছু মুসলমান নতুন দুনিয়ায় যাবার জন্য তৈরী। হারেস আমায় এ সংবাদ দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। গ্রানাডার মুসলমানদের মধ্যে শিল্প এবং কৃষির কাজে অনেক অভিজ্ঞ লোক রয়েছে, সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারাও আপনার সাথে যেতে চাইবে।'

তিনি জবাব দিলেনঃ 'এমনটি পূর্বে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। গ্রানাডার মুসলমানরা এখন আমাদের পুকুরের মাছ। আলফাজরার অবস্থাও দিন দিন বদলে যাচ্ছে। এখন কোন লোকের প্রয়োজন হলে রাতের পরিবের্ত দিনেই ধরে নিয়ে আসতে পারব। আমি কাউন্টকে আবুল হাসানের কথাও বলেছিলাম। তিনি বললেন, এ যোগ্য লোক শুধু বোকামীর কারণে শেষ হয়ে যাবে। পরে আমি বারনিণ্ডোর সাথে কথা বলেছি। তিনি বললেন, জাহাজ বোঝাই করতেই কয়দিন লেগে যেতে পারে।'

ঃ 'তাহলে হঠাৎ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এমন কোন আশঙ্কা নেই। তবুও আমাদের সঙ্গীরা আগে ভাগে এসে পৌছলে ভালো হতো।'

ঃ 'খৃস্টানদের জাহাজ আরও আগে এলে ঘাঁটি ওদের দখলে চলে যাবে। তখন কাউন্টের মহলে কামান দাগা আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'

ঃ 'দোয়া কর, আমাদের জাহাজ আসার দু'চারদিন আগেই যেন ওদের জাহাজ পৌছে যায়। এ সুযোগে আমি যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করব, তখন এমন খেলা দেখবে, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমার চলাফেরায় তো কোন বিধিনিষেধ নেই।'

ঃ 'না, আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। কাউন্ট তিন চারশ চাকর বাকরের মধ্যে আপনাকে খুঁজবে না। তবে বারনিণ্ডো যেন দৈনিক দু' একবার আপনাকে দেখে। তার বাড়ির পাশেই আমাদের থাকার জায়গা করা হয়েছে।'

ঃ 'তুমি কিছু ভেবো না। আমি কি করছি বারনিণ্ডো জানতে পারবে না।'

আবু আমের হতাশ কণ্ঠে বললঃ 'স্ত্রী সন্তানদের দেখার পূর্বে যদি আমাকেই নতুন দুনিয়ায় পাঠানো হয় তাহলে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। ডন লুই তার গোলামদের সাথে আমাদের নতুন দুনিয়ায় পাঠাতে পারবে না।'

রমেণ্ডো আবু আমের এবং ওসমানকে নিজের বাড়ির কাছে একটি খালি ঘরে থাকতে দিয়েছিল। পাশে প্রশস্ত চার দেয়ালের ভেতরে চাকর বাকররা থাকে। চাকররা কাজে গেলে আবু আমেরও তাদের সাথে বেরিয়ে যেত। ওসমানও সাথে যেত মাঝে মাঝে। কিন্তু অধিকাংশ সময় সে অসুস্থতার ভান করে দিনের বেলা শুয়ে থাকত। রাতে তৎপর হয়ে উঠত গোপন কাজে।

আট দিন পর। ঘরের দরজা বন্ধ করে ফজর নামায পড়ল ওসমান। নামায শেষে বললঃ 'আমের, সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরে না এলে মনে করো জেলে পাড়ায় রাত কাটাব।'

ঃ 'আপনি আমাকে কোন কাজে লাগাননি।'

ঃ 'তোমার বড় কাজ হল এখানে থেকে আমাকে সন্দেহমুক্ত রাখবে। দু'জন বিশ্বস্ত চাকর যোগাড় করবে যারা আমাদের সঙ্গ দিতে পারে। এ দায়িত্ব পালন করতে নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হবে না। তুমি যেহেতু সাঁতারও জান না, নৌকাও চালাতে পার না, তাই কোন অভিযানে তুমি যেতে পারবে না।'

ঃ 'আল্লার শোকর! নতুন পৃথিবীতে নেয়ার জাহাজ এখনো এসে পৌঁছোয়নি। এখন আমি নিশ্চিন্ত, আমাদের সঙ্গীরা আসার পূর্বে আমাদের নতুন দুনিয়ায় পাঠানো হবে না। গত রাতে আপনাকে আবুল হাসানের কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম কিন্তু কথা বলতে বলতে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।'

ঃ 'আবুল হাসান শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে আমার সংবাদ তার দেহ মনে ভাল প্রভাব ফেলেছে।'

ঃ 'আপনি কি তাকে দেখেছেন?'

ঃ 'না। একজন সেন্ট্রি যখন সংবাদ আদান প্রদানের কাজ করছে তখন আমি ঝুঁকি নিতে যাব কেন। কি করতে হবে আবুল হাসান তা জানে।'

ওসমান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পর জেলে পাড়ায় পৌঁছে তাকাল সাগরের দিকে। দূর দিগন্তে ভেসে উঠল তিনটি জাহাজ। ধীরে ধীরে নদীর দিকে এগিয়ে আসছে। কারলু, তার স্ত্রী এবং জনপঞ্চাশেক

লোক নদীর পাড়ে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ওসমান পায়ে পায়ে টিলার ওপর উঠে এল। লোকগুলোর চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। কারো চোখে পানি, কতক মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কারলু এগিয়ে ওসমানের সাথে মোসাফেহা করে বললঃ 'সারা জীবন মরিসকোর অভিশাপ বয়ে বেড়ানোই বোধ হয় আমাদের ভাগ্যলিপি। ওই দেখুন খৃস্টানদের জাহাজ আসছে। প্রতিটি জাহাজেই ক্রস আঁকা পতাকা। জানি না এর পেছনে আরো কত জাহাজ আসবে। তবে একথা ঠিক, স্প্যানিশ জাহাজের উপস্থিতিতে বাইরের অন্য কোন জাহাজ তীরে ঘেঁষতে পারবে না।'

ঃ 'যদি এই তোমাদের পেরেশানীর কারণ হয়ে থাকে তবে শোন, আগামী তিন চারদিনের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ আমরা রওনা করব। কোন শত্রু জাহাজ আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে না। কিন্তু তোমাদেরকে আরো অনেক কাজ করতে হবে। আগামী দু'দিন যাত্রার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবে। এবার বাড়ি গিয়ে আমার হুকুমের অপেক্ষা করো।'

নিশ্চিন্ত মনে যে যার পথে ফিরে গেল। দাঁড়িয়ে রইল কারলু এবং আরো আটজন যুবক। ওসমান বললঃ 'সাগরের দিকে যাবার দরকার নেই। এখানে এবং নদীর ওপারে সব সময় দুটো ডিঙ্গি নৌকা বেঁধে রাখবে।'

ঃ 'আপনার কথামত আমরা বারুদের দুটো বাক্স নদীর ওপারে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। অস্ত্রগুলো সবার হাতে পৌছে দিয়েছি। আবুল হাসানকেও কয়েদখানার ভেতর একটা খঞ্জর পৌছে দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। গ্রামের কোন নিভৃত স্থানে বসে কথা বলব। জাহাজগুলো কোথায় নোঙ্গর করে দেখতে হবে। এর পরই তোমাদেরকে দায়িত্ব ভাগ করে দেব। জাহাজ তোপখানা থেকে দূরে নোঙ্গর করলে হয়ত আগুন লাগিয়ে দিতে হবে, আর না হয় ডুবিয়ে দিতে হবে। কেল্লার দিকে নোঙ্গর করলে কামানগুলো অকেজো করে দিতে হবে। আশা করি এতে তেমন সমস্যা হবে না। এর পর আমাদের জাহাজ এলে এগুলোর ব্যবস্থা করবে।'

ডন লুই দোতলার এক কক্ষে বসে আছে। পাশে তার স্ত্রী। খোলা জানালা পথে ওদের দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। জাহাজে তোলা হচ্ছিল ঘোড়া, গরু, ভেড়া এবং খাদ্য শস্য। জাহাজ তীরে ভিড়তে পারেনি। নোঙ্গর করেছে তীর থেকে খানিক দূরে গভীর পানিতে। পশু এবং মালামাল নৌকায় করে রশি দিয়ে জাহাজে তোলা ছিল কষ্টকর। শ্রমিক এবং মাল্লারা

পশুর ছটফটানি দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল।

বেগম বললঃ 'পাদ্রী ফ্রান্সিস বলছিল অনেক চাকর এবং পশু সফরের সময় মরে যাবে।' ক্ষোভের সাথে ডন লুই বললঃ 'তার সব কথাই অলক্ষুণে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সব চাকর-বাকর এবং পশু নিরাপদেই পৌঁছতে পারবে। বারনিগোকে বলেছি, দুর্বল এবং রোগা পশু ও চাকরদের যেন জাহাজে তোলা না হয়। অবশ্য পাদ্রীর কয়েদখানায় শাস্তি ভোগ করে যারা আধমরা হয়ে গেছে ওদের নিয়ে আমার যত দুশ্চিন্তা। পথে তাদের দু'একজন হয়ত মরে যেতেও পারে।'

ঃ 'কিন্তু বারনিগো যে বলল পাদ্রী অধিকাংশ বন্দীকে বেলেনসিয়ার দমন সংস্থার হাতে তুলে দিতে চায়। ওখানে ওদের পাপের স্বীকৃতি নিয়ে শাস্তি নির্ধারণ করা হবে।'

ঃ 'কয়েদীদের জাহাজে না তুললেই সে এমনটি করতে পারবে।'

ঃ 'গীর্জার অপরাধীদের আপনি জাহাজে তুলবেন, পাদ্রী কি তা মেনে নেবে? বারনিগো বলেছে সে নাকি এখানে দমন সংস্থার হয়ে কাজ করছে।'

ঃ 'তা আমি জানি। তবে পাদ্রীকে কোন না কোন ভাবে রাজী করিয়ে নেব। চাকর-বাকরদের সাথে তাকেও জাহাজে তুলে নেব। এরপর দমন সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে খবর পাঠাবো যে, পাদ্রী ফ্রান্সিস সাত সাগরের ওপারে বসবাসকারী আত্মাগুলোকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা করতে দারুণ উৎকণ্ঠিত ছিল।'

ডন লুইয়ের স্ত্রী হেসে উঠল।

একজন চাকর কক্ষে প্রবেশ করে ডন লুইকে বেলেনসিয়ার বিশপ এবং পাদ্রীর আগমন সংবাদ শোনাল।

ঃ 'বেলেনসিয়ার বিশপ!' বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল ডন লুই, 'তিনি কখন এসেছেন?'

ঃ 'এইমাত্র। আমি তাদেরকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখেছি।'

ঃ 'পাদ্রী ফ্রান্সিসও তার সাথে এসেছে?'

ঃ 'জ্বী। বিশপের সাথে একই টাঙ্গায় করে এসেছেন ওরা।'

ঃ 'আমি আসছি।'

চাকর ফিরে গেলে ডন লুই স্ত্রীকে বললঃ 'এর অর্থ হচ্ছে, পাদ্রী বিশপকে বেলেনসিয়া থেকে সাথে করে আনেনি। পথে কোথাও নিশ্চয়ই তার অপেক্ষায় ছিল। সে বিশপের আসার খবর জানত, কিন্তু ইচ্ছে করেই

আমায় বলেনি। ওদের খাবার আয়োজন কর, আমি তার কাছে যাচ্ছি।'

বৈঠকখানায় প্রবেশ করল ডন লুই। হাঁটু গেড়ে বসে বিশপের হাতে চুমু খেয়ে তার পাশে বসতে বসতে বললঃ 'পবিত্র পিতা, আপনাকে দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। আপনার আসার সংবাদ পেলে চাকর-বাকরদের নিয়ে কেল্লার বাইরে আপনাকে স্বাগত জানাতাম।'

ঃ 'পাদ্রী ফ্রান্সিস আমায় খবর পাঠিয়ে বলল, আপনি নতুন পৃথিবীতে যাচ্ছেন। আপনাকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে ছুটে এসেছি।'

ঃ 'আপাততঃ ক'জন চাকর-বাকর যাচ্ছে। জমি আবাদ হলে এবং থাকার কোন সুব্যবস্থা হলে আমিও যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করব।'

পাদ্রী ফ্রান্সিস বললঃ 'সরকার আপনাকে সে এলাকার গভর্ণর করেও পাঠাতে পারে।'

ঃ 'হয়তো বা।' জবাব দিলেন ডন লুই।

বিশপ বললঃ 'আমার আসার উদ্দেশ্য হল, দমন সংস্থার প্রধান আমাকে হুকুম পাঠিয়েছেন যে, খৃস্টান হওয়ার পর যারা আবার আগের ধর্মে ফিরে গেছে অথবা তাদের কোন কাজ যদি দমন সংস্থার আওতায় পড়ে তবে এমন চাকরদের নতুন পৃথিবীতে পাঠানো যাবে না। পাদ্রী ফ্রান্সিসের অভিযোগ, আপনার গোলামদের কেউ কেউ মনেপ্রাণে খৃস্টান হয়নি। আমরা চাই, ওদের আপনি আমেরিকা নেবেন না, যেন পবিত্র দমন সংস্থা তার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়।'

ডন লুই রাগ সামলে ফ্রান্সিসকে বললঃ 'আপনার সন্দেহ মতে ওদের সংখ্যা কত ?'

ঃ 'আপাততঃ সাত জন।'

ঃ 'ওদের মনের খবর কিভাবে পেলেন? আপনি কি ওদের সাথে মিশেছেন?'

ঃ 'মনের অবস্থা জানার জন্য কারো সাথে মেলামেশার দরকার হয় না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পবিত্র দমন সংস্থার গুপ্তচর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ঃ 'কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার এলাকায় দমন সংস্থার অফিস স্থাপিত হয়নি।'

ঃ 'না হলেও গীর্জার দুশমন কোথাও নিরাপদ নয়। বেলেনসিয়ায় দমন সংস্থার কয়েদখানাগুলো দ্রুত ভরে যাচ্ছে। প্রয়োজনে নতুন কয়েদখানা তৈরী করব। তা না হয় মুসলমানদের পুরনো কেল্লাগুলো দিয়ে কয়েদখানার

কাজ চালাব। এখান থেকে আট-দশ মাইল দক্ষিণে একটি পুরনো কেল্লা আমি দেখেছি। একটু সংস্কার করলে আপনার এলাকার প্রয়োজন মেটানো যাবে। এরপর দমন সংস্থা আপনার চাকর-বাকরদের খালি ব্যারাকও ব্যবহার করতে পারবে।'

ঃ 'আপনি বলতে চাইছেন এখানকার কৃষক, রাখাল এবং জেলেদের অনেককেই সংস্থার জেলে যেতে হবে!'

ঃ 'এতে আমি যে খুশী তা নয়, বরং আমি যা শুনেছি, মরিসকোরা এখনো মনেপ্রাণে খৃস্টান হয়নি। সুযোগ পেলেই ওরা গীর্জার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে।'

ঃ 'যারা এখনো মুসলমান এবং মুসলমান হিসেবেই থাকতে চায় তাদের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?'

জবাব না দিয়ে পাদ্রী বিশপের দিকে তাকাল। বিশপ বললঃ 'স্পেনে কোনও অ-খৃস্টান থাকবে না, এ সিদ্ধান্ত তো হয়েই গেছে। ভাল লাগুক বা না লাগুক ইহুদীদের মতো মুসলমানও হয় দেশ ছেড়ে যাবে নয়তো পবিত্র যিশুর দীক্ষা নেবে। তাদেরকে আমরা খৃস্টানই মনে করব। কিন্তু তাদের মনের অবস্থা যাচাই করবে দমন সংস্থা। সংস্থা যদি মনে করে সাবেক ধর্মের সাথে কারো গোপন সম্পর্ক আছে, তবে তাদের অস্তিত্ব থেকে স্পেনের মাটিকে পবিত্র করা হবে।'

ঃ 'দমন সংস্থার এই তাড়াহুড়ায় বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে আপনারা কি এ আশংকা করছেন না?'

ঃ 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, দমন সংস্থার কোন কাজের সমালোচনা করা মহাপাপ। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য বলছি, দমন সংস্থা সঠিক সময়ে তার কাজ শুরু করবে। রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয় আপাততঃ এমন কোন পদক্ষেপ নেবে না।'

ঃ 'আমি যদ্দুর জানি, গ্রানাডায় গীর্জার বাড়াবাড়ির ফলে পার্বত্য এলাকাগুলোতে যে কোন সময় বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। এর ফলে রোম সাগরে তুর্কীদের জঙ্গী জাহাজের আনাগোনা আমাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

ঃ 'খুব শীঘ্রই এ আগুন নিভে যাবে। তখন সমগ্র স্পেনে মুসলমানরা মরিসকো নামেই পরিচিত হবে।'

ডন লুই আলোচনার মোড় পাল্টানোর জন্য বললঃ 'পবিত্র পিতা!

আপনার সামনে একটা প্রস্তাব পেশ করতে চাই।'

ঃ 'বলুন।'

ঃ 'আমার লোকদের সাথে পাদ্রী ফান্সিসও নতুন পৃথিবীতে যাবেন, যাতে কেউ পথভ্রষ্ট না হতে পারে।'

ঃ 'স্থানীয় জংলীদেরকে জোর করে খৃস্টান ধর্মের দীক্ষা দেয়ার অনুমতি থাকলে আমি অবশ্যই যাব। এর সাথে পবিত্র দমন সংস্থার পক্ষ থেকে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি দেয়ার অধিকারও থাকতে হবে।'

ঃ 'নতুন পৃথিবীতে আমাদের এ স্বপ্ন পূরণে আরো কিছু সময় প্রয়োজন।' বিশপ বললেনঃ 'দমন সংস্থার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে অ-খৃস্টান, ধর্মত্যাগী এবং যাদুকরদের অস্তিত্ব থেকে এ মাটিকে পবিত্র করা। আমার বিশ্বাস, ছিল ডন লুই এবং তার চাকর-বাকররা আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। তারা আমাকে বিশপের মর্যাদা দিয়েছে বলে আমি কৃতজ্ঞ। এখন থেকে আপনি এদের অকারণে বিভক্ত করবেন না। কেবলমাত্র সন্দেহের বশে তার কোন গোলামকে আমেরিকা যেতে বাঁধা দেবেন না। নতুন দুনিয়ায় এরা আমাদের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না।'

ঃ 'কাউন্টকে অকারণে পেরেশান করা অথবা তার ক্ষতি করা আমার উদ্দেশ্য নয়।' বলল পাদ্রী। আরো বলল, 'দমন সংস্থার লোকজন আসার পূর্বে কেউ যদি নতুন পৃথিবীতে যেতে চায়, যাক। কিন্তু কয়েদখানার বন্দী আটজনের মধ্যে বড় জোর ছয় জনকে ছেড়ে দেয়া যাবে। বাকী দু'জন অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেখানে যাবে সেখানেই ওরা খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াবে। এদের একজনকে তিনবার বেত মেরেছি, এরপরও সে কয়েদখানায় প্রকাশ্যে আযান দিয়ে নামায পড়ে।'

ঃ 'তার নাম কি আবুল হাসান?'

ঃ 'হ্যাঁ, গত পাঁচ দিন থেকে হঠাৎ তার মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এখন আর সে আযান দেয় না। পাহারাদারদের রিপোর্ট অনুযায়ী কারো সামনে নামাযও পড়ে না।'

ঃ 'আপনি তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলে তাকে কি নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া যায় না। তিন দিনের মধ্যেই জাহাজ রওনা করবে। আমি নিজেও শুনেছি ও খৃস্টান হয়নি। আপনি তো কেবল তার গায়ে পানি ছিটিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তুমি এখন থেকে খৃস্টান।'

ঃ 'আমাদের গোলামদের আত্মাগুলোকে নরকের আগুন থেকে বাঁচানোর

চেষ্টা করা আমাদের অধিকার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পবিত্র দমন সংস্থার অফিসে পৌঁছে গেছে। যে কোন ভাবেই হোক, তাকে বেলেনসিয়ায় দমন সংস্থার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। ও ভীষণ বিপজ্জনক। আপনি বরং আমাকে দু'জন সশস্ত্র লোক দিন, আমি নিজেই ওকে বেলেনসিয়ার কয়েদখানায় রেখে আসব।' ডন লুই হতাশ কণ্ঠে বললঃ 'আমার লোকেরা আপনার নির্দেশ অমান্য করতে পারে না।'

টেবিলে হরেক রকমের সুস্বাদু খাবার সাজানো হয়েছে। ঘন্টা খানেক পর বিশপ, পাদ্রী এবং ডন লুই টেবিলে এসে বসল। পাদ্রী এমনভাবে খাচ্ছিল, যেন সাত দিনের অভুক্ত।

খাওয়া শেষে পুরনো দিনের দামী শরাব পরিবেশন করল কাউন্ট। মদের বেলায়ও পাদ্রী দ্বিগুণ উৎসাহ দেখাল। মদ্যপানের পর আলাপ চলল কিছুক্ষণ। ফ্রান্সিসের চোখ লাল হয়ে এলে বিশপকে বললঃ 'সারাদিন আপনার উপর যথেষ্ট ধকল গেছে। আমার মনে হয় এখন বিশ্রাম করা উচিত।'

ঃ 'চলুন।' কাউন্ট লুই বলল, 'আপনাকে শোবার ঘরে রেখে আসি। পাদ্রী ফ্রান্সিস, আপনিও এখানে শুয়ে পড়ুন।'

ঃ 'ধন্যবাদ, রাতে কয়েদখানা থেকে দূরে কোথাও থাকি না আমি। তা ছাড়া যা খেয়েছি, খোলা বাতাসে একটু হাঁটাহাঁটি করাও দরকার।'

বিশপের সাথে মোসাফেহা করে পাদ্রী বেরিয়ে গেলেন।

পাদ্রী চলে যেতেই বিশপ কাউন্ট ডন লুইকে বললেনঃ 'এ লোকটা থেকে আপনি একটু সাবধান থাকবেন। এ মুহূর্তে সে হয়ত আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন স্পেনের প্রতিটি লোক কণ্ঠনালীতে দমন সংস্থার কঠোর হাতের চাপ অনুভব করবে। তুরকমেণ্ডা গীর্জার মধ্যে এমন এক শক্তির জন্ম দিয়েছেন যার ভয়াবহতায় কেবল স্পেনের সাধারণ এবং আমীর ওমরারাই নয় বরং গীর্জায় অধিপতিরাও কেঁপে উঠবে। পাদ্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থা প্রধান আমাকে এখানে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে সংস্থায় তার প্রভাব অনুভব করতে পারেন। আপনি কোন কয়েদীকে জোর করে নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন না।'

ঃ 'আপনি না এলে আমি হয়ত এ ভুল করে বসতাম। আমাকে হুঁশিয়ার করায় আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ । আসুন।' বিশপ উঠে কাউন্টের সাথে

হাঁটা দিল।

পাহারাদাররা পাদ্রীকে সদর দরজার পরিবর্তে উত্তরের ছোট ফাঁক দিয়ে বের করে দিল। পাদ্রী নদীর পাড় ঘেঁষে দ্রুত হাঁটতে লাগল। নদীতে অপেক্ষা করছে আমেরিকাগামী তিনটি জাহাজ। পাদ্রীর মনে আনন্দের ফুলঝুরি। লুই তার কয়েদীদের এখন আর জাহাজে তুলতে পারবে না।

দামী এবং সুস্বাদু খাবার দেখে সে একটু বেশীই খেয়েছিল। মদও গিলেছিল পরিমাণের চেয়ে বেশী। বাইরের সতেজ বায়ু গায়ে লাগতেই শরীর কেমন নিস্তেজ হয়ে এল। তবুও কাউন্টকে নিজের শক্তি দেখাতে পেরেছে বলে সে মনে মনে ভীষণ খুশী।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে কতক্ষণ পানিতে চাঁদের দৃশ্য দেখল। এরপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বিনয়ের সাথে বললঃ 'আকাশের পিতা! খৃষ্টধর্মের প্রকাশ্য এবং গোপন দুশমনদের ধ্বংস করার জন্য আমায় হিম্মত দাও। যেসব মরিসকো দিনে গীর্জায় আসে, রাতে খৃস্টধর্মের কুৎসা রটনা করে তাদের যেন জ্বলন্ত আগুনে জ্বলতে দেখি। পবিত্র পিতা, ওদের জন্য আমার হৃদয়কে পাথরের মত কঠিন করে দাও। তুরকমেণ্ডা এবং জেমসের পদচিহ্ন ধরে চলার শক্তি দাও আমায়।'

পেছন থেকে শব্দ এলঃ 'তুমি তাদের চেয়ে অভিশপ্ত!'

পাদ্রী পেছন ফিরে চাইল। চারজন লোক তাকে ঘিরে ফেলেছে। পাদ্রীর ঘাড় ছুঁয়ে আছে ওসমানের তরবারী।

ঃ 'তোমরা কারা?' অনেক কষ্টে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল পাদ্রী।

ঃ 'এখনি জানতে পারবে। ভাল করে দেখো আমার সঙ্গীদের কাছে তরবারী এবং খঞ্জর ছাড়াও দু'টি পিস্তল রয়েছে। চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করলে এ চিৎকারই হবে তোমার শেষ চিৎকার।'

পাদ্রী কাঁপতে কাঁপতে বললঃ 'দেখুন, আমি একজন পাদ্রী। আপনারা বোধ হয় ভুল করেছেন।'

ঃ 'না ভুল করিনি। তোমরা একে বেঁধে নৌকায় নিয়ে যাও।'

পাদ্রীকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল ওসমানের সঙ্গীরা। তার জামা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে এক অংশ মুখে পুরে অন্য অংশ দিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল। ওসমান একজনকে বললঃ 'আমাদের হাতে সময় কম। একে নিয়ে যাও। বাঁধন যেন ঢিলা না হয়। পথে গণ্ডগোল করলে গুলি করে নদীতে ফেলে দিও। যাও, ওকে নদীর ওপারে নিয়ে যাও।'

ফ্রান্সিস কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কণ্ঠ থেকে শব্দ বের হল না। পাদ্রী কয়েক কদম এগিয়ে সাহায্যের আশায় অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকালো। ওসমানের লোকটি পিস্তল দেখিয়ে বললঃ 'তাড়াতাড়ি হাঁটো। মূল্যবান কার্তুজ নষ্ট করতে চাই না।'

ফ্রান্সিস দ্রুত হাঁটতে লাগল। ওসমানের সঙ্গী তাকে ধাক্কা দিয়ে বললঃ 'বেকুব! জানটার জন্য মায়া থাকলে আরো জোরে চলো।'

ফ্রান্সিস এবার দৌড়াতে লাগল। কিছু দূর গিয়েই হাঁপাতে লাগল ঘোড়ার মতো, তবুও মৃত্যুর ভয়ে দৌড়াতেই থাকল। মাইল দু'য়েক পর দেখা গেল তিনটি নৌকা। ওদের দেখে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন। একজন বললঃ 'মন্টিনো, এত জলদি ফিরে এলে!'

ঃ 'সময়ের পূর্বেই শিকার পেয়ে গেছি।'

ঃ 'আরে, এ তো পাদ্রী ফ্রান্সিস!'

ঃ 'হ্যাঁ, একে নদীর ওপারে পৌঁছে দাও। তবে খুব সতর্ক থেকো।'

ঃ 'তোমাদের সঙ্গী কোথায়?'

ঃ 'কয়েদখানার দিকে গেছে। এতক্ষণে হয়ত কয়েদীদের ও মুক্ত করে নিয়েছে।'

ঃ 'পাদ্রীকে এত তাড়াতাড়ি কোত্থেকে নিয়ে এলে?'

ঃ 'নদীর পাড়ে হাঁটাহাঁটি করছিল। এবার ওর মুখ খুলে নিশ্চিন্তে কথা বলতে পার। কোন ঝামেলা করলে শেষ করে দিও। সাগরে কি কোন আলো দেখা গেছে?'

ঃ 'আলো দেখা গেলে তো আমরা মশাল জ্বালাতাম। তুমি নিশ্চিন্তে কাজ করো। কি করতে হবে আমরা জানি।'

মন্টিনো ওখান থেকে হাঁটা দিল।

নদীর ওপারে নারী পুরুষের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল পাদ্রী ফ্রান্সিস। লোকগুলো নিরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের চোখের তারায় ঘৃণার সমুদ্র। সবাই নির্বাক। ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা সইতে পারল না পাদ্রী। বললঃ 'আমাকে বন্দী করে এখানে নিয়ে এসেছ কেন? কোন কয়েদীকে ছাড়িয়ে নিতে চাও এই তো। শপথ করছি, ফিরে গিয়েই তাকে মুক্ত করে দেব। একজন নয় আমি সকলকে...'

এক বৃদ্ধ মুখ খুললেন, 'আমরাও তোমার আত্মাকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য এখানে নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'আসলে তোমাদের হলো কি বল তো? গীর্জার খাদেমের সাথে এমন ব্যবহার! এ তো কেউ কল্পনাও করতে পারে না।'

ঃ 'আমরা মরিসকো। মরিসকোরা কেমন হয় তা তুমি ভালই জান।'

ঃ 'যিশুর কসম, গীর্জাওয়ালাদের বলব, তোমাদের যেন আর মরিসকো না বলা হয়।'

ঃ 'আর গীর্জা সাথে সাথে তোমার কথা মেনে নেবে?'

ঃ 'গীর্জাওয়ালাদের বোঝাব, মরিসকো শব্দে ওরা অসন্তুষ্ট হয়। যে কোন সময় একটা বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে পারে। তখন নিশ্চয়ই ওরা আমার কথা শুনবে।'

ঃ 'তুমি মিথ্যুক, দমন সংস্থার গুপ্তচর। নিরপরাধ মানুষদের তুমি দমন সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাও।'

ঃ 'কথা দিচ্ছি, ফিরে গিয়ে ওদের ছেড়ে দেব। আমি লিখে দেব ওরা নিষ্পাপ। আমায় ফেরত নিয়ে চল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে আমাকে মেরে ফেলো। আমি আমার পদ থেকেও ইস্তফা দিতে প্রস্তুত।'

ঃ 'তুমি আর ফিরে যাবে না।'

ঃ 'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? কি করবে আমাকে!'

ঃ 'তুমি যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, আমাদের সঙ্গীরা তোমাকে ধরে এখানে নিয়ে আসবে, তখন কি তুমি এ কথা কল্পনাও করেছিলে?'

ঃ 'কয়েক বছর থেকে যাদের ঈমানের হেফাজত করছি, যাদের আত্মাগুলোকে নরকের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছি, তাদের কেউ আমার দুশমন হতে পারে, এ তো কল্পনাও করিনি। নিশ্চয়ই কাউন্টের মুসলমান প্রজারা তোমাদের উসকানি দিয়েছে।'

ঃ 'খবরদার!' এক যুবক এগিয়ে এল। 'চুপ কর, নয়তো কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলব। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা কথাও যেন না শুনি।'

ঃ 'আমাকে হত্যা করতে চাও?' পাদ্রীর কণ্ঠে ভয়।

ঃ 'না, যে কয়েদীকে তুমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছ সে-ই তোমার ফয়সালা করবে।'

পাদ্রী হতাশ প্রাণে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাদ্রীর উপর্যুপরি শাস্তি প্রদানে আবুল হাসান জীবন মৃত্যু সম্পর্কে নির্লীপ্ত হয়ে পড়েছিল। মরিসকো পাহারাদারের মাধ্যমে ওসমানের প্রথম সংবাদ পাওয়ার পর তার মনে হয়েছিল সে স্বপ্ন দেখছে। হৃদপিণ্ডের গতি

বেড়ে যাচ্ছিল কখনো, কখনো আবার তা শ্লথ হয়ে আসছিল। আচম্বিত তার চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা। ও পাহারাদারকে প্রশ্ন করতে চাইল, কিন্তু পাহারাদার ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে তাকে নীরব থাকতে ইশারা করল।

গতকাল ও ওসমানের দ্বিতীয় সংবাদ পেয়েছেঃ 'আগামী রাতে তুমি মুক্ত হবে।'

সকাল থেকেই ওর মনে হচ্ছিল এ দীর্ঘ দিনের যেন শেষ নেই। এক সময় সূর্য ডুবে গেল। ওর হৃদয়ে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। কতক্ষণ কক্ষময় পায়চারী করে ও সিজদায় পড়ে বলতে লাগলঃ 'আমার আল্লাহ, আমায় দয়া কর। মৃত্যুর পূর্বে একটি বার সাদিয়াকে দেখতে চাই। তাকে বলতে চাই, সাদিয়া! এক মুহূর্তের জন্য তোমায় ভুলিনি। প্রভু আমার, বন্দী জীবনে মৃত্যুই যদি আমার অদৃষ্টে থাকে, তাহলে দ্বীনের ওপর অটল থাকার শক্তি দাও। শক্তি দাও যেন অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়েও কালেমা পড়তে পারি। তোমার করুণা ভিক্ষা করছি প্রভু। দুর্বল ও অসহায়ের শেষ ভরসা তো তুমিই।' একথাগুলো বার বার উচ্চারণ করছিল হাসান। হঠাৎ কয়েদখানার দরজার বাইরে থেকে হালকা চিৎকারের শব্দ ভেসে এল, এর সাথে সাথে গোঙানির শব্দ। ওর মনে হলো কারো কণ্ঠনালী চেপে ধরা হয়েছে। একটু পর মনে হলো কে যেন মূল ফটক খুলছে। পায়ের শব্দগুলো এগিয়ে এল তার কক্ষের দরজার পাশে। ও দরজা খোলার শব্দ শুনল, তবু সিজদা থেকে মাথা না তুলেই বলে যাচ্ছিলঃ 'মালিক আমার, তুমি দয়ালু, তুমি মেহেরবান।'

ঃ 'আবুল হাসান, আবুল হাসান, জলদি বেরিয়ে এসো। আমি ওসমান।'

আবুল হাসান উঠে দাঁড়াল। কম্পিত পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। দরজায় দুই পাহারাদারের লাশ পড়ে আছে। চাঁদের আলোয় ও গভীরভাবে ওসমানের দিকে তাকিয়ে রইল। ওসমান এসে জড়িয়ে ধরল তাকে।

ঃ 'যে ওসমান হামিদ বিন জোহরার ছেলেকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল, তুমি সে-ই হলে, তোমার এখানে আসা এক অলৌকিক ঘটনা।'

ঃ 'তুমি সেই আবুল হাসান হলে অবশ্যই আমি সেই ওসমান। তোমাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি যে, খুব শীঘ্রই তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে।'

ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত যে, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব?'

ঃ 'অস্থির হয়ো না হাসান। ইনশাল্লাহ একটু পরই নদী থাকবে

আমাদের দখলে। তুমি সফর করবে জাহাজে চড়ে। সালমানের নাম ভুলে না গিয়ে থাকলে বলতে পারি, তিনি তোমার জন্য জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।'

ঃ 'সালমান? মনে হয় আমি স্বপ্ন দেখছি। তিনি কিভাবে জানলেন যে আমি....'

আবুল হাসান বাক্য শেষ করতে পারল না। তার শব্দরা ডুবে গেল অন্তহীন বেদনার গভীরে। কেঁপে উঠল পা দুটো। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল হাসান। তার অবস্থা হল সেই ক্লান্ত শ্রান্ত মুসাফিরের মতো, মসজিদের কাছে এসে যার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, রণক্ষেত্র থেকে যে বীর নিজের বাড়ির আঙিনায় এসে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারায়।

ততোক্ষণে অন্য কয়েদীদেরও বের করে আনা হয়েছে।

ঃ'অদ্রিগো!' ওসমান বলল, 'ওকে তুলে নৌকায় করে ওপারে পৌছে দাও। যেসব কয়েদী আমাদের আশ্রয় চায় তাদেরকেও নিয়ে যাও।'

আবুল হাসান উঠতে উঠতে বললঃ 'আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কাল থেকে একটুও ঘুমাইনি, আমি সুস্থ। নিজেই হেঁটে যেতে পারব।'

ঃ 'ঠিক আছে। তুমি অদ্রিগোর সাথে গিয়ে জাহাজের অপেক্ষায় থাক।'

ঃ 'আমার সংবাদ কিভাবে পেলেন?'

ঃ 'আল্লাহ্ কারো সাহায্য করতে চাইলে আপনা হতেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। এখন নদীর ওপারে গিয়ে বিশ্রাম কর।'

ঃ 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ঃ 'এখানে এখনো আমার কিছু কাজ বাকী আছে। ইনশাল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের কাছে পৌছে যাব। এখন থেকে তুমি কিছু অবিশ্বাস্য কাণ্ড কারখানা দেখবে।'

ঃ 'কোন যুদ্ধ হলে আমি আপনার সাথেই থাকব।'

ঃ 'না, কোন যুদ্ধ নয়। ওপারে গিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর। এখন থেকে তুমি মুক্ত।'

ঃ 'আমি যদি মুক্ত হয়ে থাকি, যুদ্ধে যাবারও প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার প্রথম ইচ্ছে গোসল করে শরীরের এই ময়লা ধুয়ে ফেলব।'

ঃ 'অদ্রিগো! ওর দায়িত্ব তোমার ওপর। কারলুর কাছ থেকে আপাততঃ দুটো কাপড়ের ব্যবস্থা করো। জাহাজ না এলে ভাল কাপড় দিতে পারছি না। একজন নাপিতও ডেকে দিও।'

দুজন সঙ্গীসহ ওসমান বুরুজের দিকে এগিয়ে চলল। ওখানে দু'টি কামান রয়েছে। ওবায়েদ পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললঃ 'এ পাশের তিনজন শত্রুর দু'জনকেই হত্যা করা হয়েছে। আরেক জনকে বেঁধে রেখেছি। দ্বিতীয় কামানটিও আমাদের দখলে। জাহাজের মাঝি মাল্লারা ঘুমিয়ে আছে। ইস্! কামানগুলো এত ভারী না হলে এর মুখ দুশমনের জাহাজের দিকে ফিরিয়ে দিতাম।'

ওবায়েদের চারজন সঙ্গী তিনজন কয়েদী এবং নিহত শত্রুর পিস্তল, ঢাল, তলোয়ার হাতিয়ে নিয়েছিল। তাদের একজন এগিয়ে বললঃ 'আমি সাগরের দিকে আলো দেখেছি। কিন্তু আমার সাথীরা বলছে এ দৃষ্টিভ্রম।'

ওসমান বুরুজে উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললঃ 'তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ। আমাদের সংগীরা আসছে। তোমরা তাড়াহুড়া না করে অপেক্ষা করতে থাক। ওপারে গোলার শব্দ শুনলেই মাটিতে বিছানো বারুদে আগুন লাগাবে।'

মুক্তির সোনালী প্রহর

কাউন্ট ডন লুই এবং তার স্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পর পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ডন লুইয়ের স্ত্রীর। স্বামীকে ঝাঁকুনি দিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললঃ 'এই, এই ওঠো না, দেখো না কি হয়েছে!'

ঃ 'কি হয়েছে?' বিড় বিড় করলো কাউন্ট।

ঃ 'বাইরে গোলাগুলি হচ্ছে। মনে হয় গোটা মহলটাই দুলছে।'

ঃ 'তুমি সবসময় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখ।' কাউন্ট পাশ ফিরে শুল।

ঃ 'পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে আপনি ছাড়া আর সবাই জেগ উঠেছে।'

দরজায় কড়া নাড়ার সাথে সাথে কারো কণ্ঠ ভেসে এলঃ 'জনাব, বিশপ আপনাকে স্মরণ করেছেন। আমি বলেছি তাকে ঘুম থেকে জাগাতে পারব না। কিন্তু বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দে সবাই ভয় পেয়েছে। আমাদের কামান যেখানে, ওখানে আগুন দেখা গেছে বলে এক চাকর তাকে ভড়কে দিয়েছে।'

ঃ 'বেকুব! কামান চললে আগুনও দেখা যায় এ কথা বিশপকে বলনি?'

ঃ 'জনাব, পাহারাদার বলেছে, আগুনের গতি ছিল আকাশের দিকে। কেল্লার মুহাফিজ সংবাদ আনতে গেছে। সদর দরজার বুরুজ থেকে দু'জন পাহারাদার চিৎকার করছে। বিশপ আপনাকে ডাকতে বলে ওদিকে গেছেন।'

ঃ 'যাও, আমি আসছি।'

কাউন্ট দ্রুত জুতা পরে রাতের পোশাকেই বেরিয়ে এল। খানিক পর বুরুজে দাঁড়িয়ে দেখছিল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। নদীর দুই পাড়ে আগুন জ্বলছে। আগুন দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

কাউন্ট বললঃ 'জাহাজটি মনে হয় আমেরিকা যাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গ দেবে। কিন্তু এর জন্য আগুন জ্বালানোর কি প্রয়োজন? কোন কাপ্তানের এখানকার পথঘাট না জানার কথা নয়!'

এক সিপাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললঃ 'জনাব, ওপাশের দেয়াল ধ্বংস হয়ে গেছে। ভাঙ্গা স্তুপের মধ্যে কামান দেখা যাচ্ছে না। অন্য পাশের অবস্থাও অনুরূপ।'

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবাক। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারছে না। নদীর দু'পাশে আলোই বা কে জ্বাললো। এক পাহারাদার দক্ষিণ দিকে ইশারা করে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ওই ওদিকে দেখুন।'

বিশপ ও কাউন্ট রুদ্ধশ্বাসে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের মনে হলো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অগ্নিশিখা খড়ের গাদার দিকে ছুটে চলছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ২০/২৫ ফুট উঁচু শুকনো খড়ের গাদা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। ওরা হতবাক হয়ে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। আশপাশের সকল এলাকা তখন ছাই হয়ে গেছে।

বিশপ কাউন্টকে বললঃ 'আগুনের সাপ কিভাবে ছুটে গেল দেখলেন?'

ঃ 'পবিত্র পিতা! এ সাপ নয়। কাছ থেকে খড়ের গাদায় আগুন না দিয়ে কেউ বিস্ফোরক বিছিয়ে দিয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেয়ালও বিস্ফোরক দিয়েই উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

বারনেগো হাঁপাতে হাঁপাতে বুরুজে উঠে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'জনাব, আমি সকল চাকর বাকরকে আগুন নেভানোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি! কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, ওরা হয়তো নেভাতে পারবে না। তবে কিছু শুকনো ঘাস হয়তো বাঁচাতে পারবে।'

কাউন্ট রাগের সাথে বললঃ 'বেকুব! বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আগুন নেভানোর পরিবর্তে ওদের ধরে আনার জন্য ছুটে যেতে পারলে না? গর্দভ, আমরা যে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখী এখনও তা বুঝতে পারছ না?'

একজন পাহারাদার চিৎকার দিয়ে বললঃ 'জাহাজ সোজা এদিকেই আসছে। জাহাজে এখনো পাল তোলা। আমাদের জাহাজগুলোর কাছে চলে এসেছে প্রায়। এত আলোর মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছো না। এ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন না করলে আমাদের জাহাজ সামনে থেকে সরে যেতে পারবে না। ওরা এখন পালও খুলতে পারবে না। নোঙ্গরও ফেলতে পারবে না।'

কাউন্ট জাহাজের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। জাহাজ হঠাৎ গতি পরিবর্তন করলে কাউন্ট বললঃ 'শেষ মুহূর্তে গাধাগুলো বুঝতে পেরেছে। আমি কাপ্তানের চামড়া তুলে ফেলব। এখনো পাল খোলেনি। আমাদের জাহাজের কাপ্তানদেরও কঠোর শাস্তি দেব।'

ঃ 'ধাক্কা খেলে তো দু'টো জাহাজই নষ্ট হবে।' বিশপ বলল, 'এতে ক্ষতি তো স্পেনেরই।'

ঃ 'এ জাহাজের ব্যাপারে কিছুই বলা যাচ্ছে না। ওই দেখুন, জাহাজ একটি নয় পেছনে আরো একটি। না না, দুটো জাহাজ আসছে। জাহাজ আরো বেশীও হতে পারে। পতাকাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পবিত্র পিতা! আপনি কি কখনো তুর্কীদের পতাকা দেখেছেন?'

ঃ 'না! কিন্তু আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

ঃ 'আমি, আমাদের জাহাজ, কেল্লা, সম্ভবতঃ আপনিও এখন তুর্কীদের আওতায়। আপনি বোধ হয় জঙ্গী জাহাজ থেকে তোপ ছুঁড়তে দেখেননি।'

বিশপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় প্রথম জাহাজটি কামানের গোলা নিক্ষেপ করল। এরপর জাহাজগুলো একের পর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখল। গোলার আঘাতে নতুন দুনিয়াগামী জাহাজসহ কাউন্টের ব্যক্তিগত জাহাজটিও ডুবে গেল। নদীর বুক থেকে ভেসে আসতে লাগল আহত পশু আর মাল্লাদের চিৎকার। ধুলোয় মিশে গেছে কেল্লা আর মহলের সামনের অংশ। কাউন্ট যাদুগ্রস্ত মানুষের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল।

সহসা বুরুজের ওপর নিক্ষিপ্ত গোলায় পাঁচিলের একাংশ উড়ে গেল। কাউন্ট দ্রুত নিচে নামতে নামতে বললঃ 'পবিত্র পিতা! নিচে চলুন। পাঁচিলের কোন অংশই এখন নিরাপদ নয়।'

বিশপ সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। অকস্মাৎ গোলার আঘাতে বুরুজের

ছাদের একাংশ উড়ে গেল। মারাত্মকভাবে আহত হলো তিন ব্যক্তি। একটা ইট ছুটে এসে বিশপের মাথায় পড়তেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরলে বিশপ দেখলেন মহলের এক কক্ষে শুয়ে আছেন। বাইরে থেকে আলো আসছে খোলা জানালা দিয়ে। ধীরে ধীরে গত রাতের ঘটনা তার মনে পড়তে লাগল। উঠে বসতে চাইলেন তিনি। কিন্তু দু'হাতে মাথা চেপে ধরে আবার শুয়ে পড়লেন। হাত বোলাতে লাগলেন মাথার ব্যাণ্ডেজে। তিনি মনে মনে বললেনঃ 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি বেঁচে আছি। পাদ্রী ফ্রান্সিসকে আমি কখনো ক্ষমা করবো না। সে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, এখানে এসে আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার জোগাড় হলো।'

ডন লুই কক্ষে প্রবেশ করতেই তিনি বললেনঃ 'আপনি সুস্থ আছেন এ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখন কোথায় বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'নদীর দিকের অংশ নিরাপদ ছিল না বলে আমরা আপনাকে মহলের অন্য পাশে সরিয়ে এনেছিলাম।'

ঃ 'আপনার স্ত্রী, সন্তান?'

ঃ 'ওরা সবাই ভাল আছে। আমরাও এদিকে সরে এসেছিলাম। আর কয়েক মিনিট দেরী হলেই আমার বেগম ধ্বংস স্তুপে হারিয়ে যেত।'

ঃ 'মহলের পূর্ব অংশের কি খুব ক্ষতি হয়েছে?'

ঃ 'কিছুই নাই। আপনি যে কক্ষে ছিলেন সে কক্ষের ছাদও উড়ে গেছে। অজ্ঞান না হলে নিজের চোখেই সব দেখতেন, যা কখনো ভুলার নয়।'

ঃ 'আশ্চর্য! তুর্কীদের জাহাজ এখানে এসে আপনার কেল্লার ওপর হামলা করার সাহস কোথায় পেল!'

ঃ 'পবিত্র পিতা! ওরা এখানে এসে আমাদের কেল্লা এবং জাহাজই ধ্বংস করেনি বরং চারঘন্টা এলাকা দখল করে রেখেছিল। নতুন দুনিয়ায় যাদের পাঠাতে চেয়েছি তাদেরও সাথে করে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে আমার কৃষকদের।'

খৃস্টানদের নতুন গ্রাম– যাদের আপনারা ঘৃণার সাথে মরিসকো বলেন, ওরাও নেই। আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন, ওরা কিভাবে এখানে এল? আর আমি আশ্চর্য হচ্ছি, মহল কব্জা করে আমার খোঁজ করেনি বলে। এখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছিলাম। আপনার টাংগা নষ্ট না হলে অজ্ঞান অবস্থায়ই আপনাকে রওনা করিয়ে দিতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ওরা লুটপাট করতে আসেনি। নয়তো আপনার অবস্থাও হতো পাদ্রী

ফ্রান্সিসের মতো।'

ঃ 'কেন, ফ্রান্সিসের কি হয়েছে?'

ঃ 'এখন পর্যন্ত তিনি নিখোঁজ। কয়েদখানার কাছে দু'জন পাহারাদারের লাশ ছাড়া আর কোন লাশ পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ ওরা হামলাকারীদের সাথে চলে গেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, ফ্রান্সিসকেও ওরা সাথে নিয়ে গেছে। কোথাও লুকিয়ে থাকলে এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল।'

ঃ 'সবগুলো জাহাজ ডুবে গেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, নৌবিহারের জন্য আমি যে ছোট জাহাজটি কিনেছিলাম তাও ডুবে গেছে।'

ঃ 'আমার মনে হয় তিন চারটে জাহাজ নিয়ে ওরা এসেছিল।'

ঃ 'আটটি জাহাজ এসেছিল পবিত্র পিতা। আপনি অজ্ঞান না হলে দেখতেন, একের পর এক ওরা কিভাবে গোলাবর্ষণ করেছে।'

ঃ 'এদের বড় ধরণের আক্রমণ তো আরো মারাত্মক হতে পারে।'

ঃ 'বড় ধরণের আক্রমণ তো এমন বন্দরে হবে, যেখানে আমাদের জাহাজগুলোর অজ্ঞাতসারেই ওগুলো ধ্বংস করতে পারে। এখানে তো আমার চাকর-বাকর এবং গীর্জার কয়েদীদেরকে মুক্ত করার জন্য আক্রমণ করা হয়েছে। ওদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। চাকর-বাকর ছাড়াও আরো অনেক লোক নিয়ে গেছে।'

ঃ 'মাঝি মাল্লাদের খবর কি?'

ঃ 'ওদের বেশীর ভাগ সাঁতরে নদীর কূলে উঠেছে। অন্য মাল্লাদের লাশ খোঁজা হচ্ছে। মূল্যবান ঘোড়াগুলোর জন্য বেশী দুঃখ হচ্ছে আমার। আমাদের জাহাজ থেকে কোন পাল্টা আঘাত করা হয়নি।'

ঃ 'তুর্কীদের জঙ্গী জাহাজ এখানে আসবে আমাদের লোকেরা তা কল্পনাও করেনি। দু'একদিনের মধ্যে যদি শুনি কয়েকটি জাহাজ এসে পুবের বন্দর ধ্বংস করে দিয়েছে, আমি আশ্চর্য হব না। গ্রানাডার অবস্থার প্রেক্ষিতে বাইরের মুসলমানদের তৎপরতা এর চেয়ে ভিন্ন হতে পারে না।'

গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল আবুল হাসান। ছোটখাট কামরার ঝকঝকে বিছানায় শুয়ে আছে ও।

ঃ 'আমি কোথায়?' মনে মনে বলল ও। বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল ছাদের দিকে। ধীরে ধীরে গত রাতের ঘটনা মনে পড়তে লাগল।

ওসমান তাকে কয়েদখানা থেকে বের করেছিল। গোসল সেরেছিল

নদীর পারে এসে। নতুন কাপড় পরানো হয়েছিল। মরিসকো জেলেরা অত্যন্ত সম্মান দেখিয়েছিল তাকে। এক যুবক প্লেটে করে মাছ এনে বলেছিলঃ 'আমার স্ত্রী রান্না করেছে। সমগ্র স্পেনে কেউ এর চেয়ে ভাল রান্না করতে পারবে না। এর সবটুকু খেয়ে ফেলুন।'

এক কৃষক নিজের পুটলী খুলে পনীর এবং শুকনো ডুমুর দিয়েছিল। এক বৃদ্ধ বলেছিলেনঃ 'তুমি বড় ভাগ্যবান বেটা! তোমার কারণে হাজার হাজার লোক খৃস্টানদের গোলামী থেকে মুক্তি পাচ্ছে।'

সে রাতে অনেকদিন পর তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেয়ে দু'রাকাত শোকরানা নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। এর পর ওসমান তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলঃ 'উঠো আবুল হাসান! ভোর হলো প্রায়। আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।'

জাহাজে উঠার পর সালমানের সাথে দেখা হয়েছিল, তিনি স্নেহভরে তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেনঃ 'আবুল হাসান! তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে।'

এরপর এক তরুণ অফিসার আবেগ ভরে তার সাথে মোসাফেহা করে বলেছিলঃ 'আমি মনসুর! আপনার সাথে অনেক কথা আছে। পরে বলব। এখন আমি নিজের জাহাজে যাচ্ছি।'

এ সব আবুল হাসানের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল।

এক ব্যক্তি দরজার ফাঁকে উঁকি মেরে আবার ফিরে গেল। আবুল হাসানের মনে হলো ওকে যেন কোথাও দেখেছে। ভাবল, কৃষকদের মধ্যে যারা কাউন্টের চাকর ছিল তাদের কেউ হবে হয়ত।

ওসমান কেবিনে প্রবেশ করে বিছানার এক পাশে কিছু কাপড় রেখে বললঃ 'নিন, কাপড়গুলো পরে নিন। ওই কাপড়ে আপনাকে মানাচ্ছে না। আমার চেয়ে তো আপনি লম্বা, আমারগুলো লাগবে না। রিয়ার এডমিরাল নিজের নতুন পোশাক দিতে চেয়েছিলেন, তাও আপনার গায়ে ঢিলা হবে। এ জন্য এক অফিসারের অতিরিক্ত কাপড় নিয়ে এসেছি। আপনাকে বোধ হয় বলিনি, সালমান এখন রিয়ার এডমিরাল।'

ঃ 'তাকে দেখেই আমি চিনে ফেলেছি। কিন্তু একটা লোক দরজায় উঁকি দিয়ে চলে গেল, চেনা চেনা লাগল তাকে, সেকি জাহাজের কর্মচারী?'

ঃ 'তুমি জেগে আছ জানলে ও তোমার সামনে আসার নামও নিত না।'

ঃ 'কিন্তু কে, ও?'

ঃ 'তোমার দোস্ত, আবার দুশমনও। আগে শত্রু পক্ষের গুপ্তচর ছিল। এখন পাপের প্রায়শ্চিত্য করার জন্য তোমার খোঁজে এসেছে।'

আবুল হাসানের উপর্যুপরি প্রশ্নের জবাবে ওসমান আবু আমেরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বলল।

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে ওকে ডাকুন।' আবুল হাসানের কণ্ঠে উদ্বেগ, 'আমার মুসীবতের জন্য ও একা দায়ী নয়। তাছাড়া এখন ও আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করে এনেছে।'

ঃ 'আবু আমের! এদিকে এস।'

কেবিনে ঢুকে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল আবু আমের। আবুল হাসান দাঁড়িয়ে বললঃ 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আবু আমের!'

আবু আমেরের চোখ ফেটে বেরিয়ে এল আনন্দাশ্রু। বললঃ 'আপনার ক্ষমা আমার ওপর সবচে বড় অনুগ্রহ।'

ঃ 'রিয়ার এডমিরাল তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তুমি তখন ঘুমিয়েছিলে। কাপড় পরে তৈরী হয়ে নাও। তোমার খাবার আসছে।'

আবুল হাসান খাচ্ছিল। আবু আমের শুনিয়ে যাচ্ছিল তার অতীত কাহিনী। নৌ হামলার বিবরণ শোনার পর আবুল হাসান বললঃ 'তুমি কি মনে কর, সব মরিসকো এখন মুসলমান হয়ে যাবে?'

ঃ 'ওরা কখনো খৃষ্টান ছিল না। আপনার কয়েদখানার মরিসকোরা এখন আমাদের সাথে সফর করছে, এ থেকেই ওদের মানসিকতা বুঝতে পারেন।'

ঃ 'প্রথম দিন যে গ্রামে উঠেছিলে তাদের অবস্থা কি?'

ঃ 'তারা এবং গ্রামের অন্য লোকসহ দুটো জাহাজ আগেই রওনা হয়ে গেছে। আপনার সাথে রিয়ার এডমিরালের জাহাজে সফর করতে পারবো এতটা কল্পনাও করিনি। ওসমান বলছিলেন, তিনি নাকি আপনাদের বাড়িতে মেহমান হিসেবে থেকেছিলেন।'

ঃ 'তিনি কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন এ আমাদের সৌভাগ্য।'

ঃ 'ওসমান বলেছে, মোহাজেরদের গ্রীসের উপকূলে নামিয়ে দেয়া হবে। এরপর ওদেরকে পূর্ব ইউরোপের বিজিত দেশ সমূহে ছড়িয়ে দেয়া হবে।'

ঃ 'তার মানে জাহাজ গ্রীসের দিকে যাচ্ছে?'

ঃ 'তা জানি না।'

আবুল হাসান উঠে বেরিয়ে যেতে যেতে বললঃ 'তুমি এখানেই বস।

'আমি এডমিরালের সাথে দেখা করে আসছি।'

সালমান এক সুবিশাল কক্ষে বসে আছেন। কক্ষের দেয়ালে বিভিন্ন স্থানের মানচিত্র ঝুলানো। আবুল হাসান সালমানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঃ 'বসো হাসান।' সালমান বলল।

আবুল হাসান বসতে বসতে বললঃ 'জাহাজ নাকি গ্রীসের দিকে যাচ্ছে?'

ঃ 'আপাততঃ জাহাজের গতি আফ্রিকার দিকে। মোহাজেরদেরকে গ্রীসে পৌছানোর জন্য ওখান থেকে অন্য ব্যবস্থা করা হবে।'

ঃ 'একটা দরখাস্ত করতে চাই।'

ঃ 'বলো, তুমি উদ্বিগ্ন কেন?'

ঃ 'যদি আবার স্পেনের উপকূলে যাবার ঝুঁকি নিতে পারেন তবে অনুগ্রহ করে আমাকে আলমিরিয়ার ধারে-কাছে কোথাও নামিয়ে দিন। ওখান থেকে আমি হেঁটেই সামনে যেতে পারবো।'

সালমান স্নেহভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'হাসান! এডমিরালকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করে এ অভিযানে আসার অনুমতি পেয়েছি। যেদিন বুঝতে পারব তুমি নিঃশঙ্ক পৃথিবীতে পা দিয়েছ, এ অভিযান সে দিন শেষ হবে। তোমার সব কথা আমি শুনেছি। কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের জঙ্গী জাহাজ সে এলাকায় নোঙ্গর ফেলবে, যেখানে তোমার স্ত্রী তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

ঃ 'রওনা করার সময় আলফাজরা এবং অন্যান্য পাহাড়ী এলাকা সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর শুনেছি। ইউসুফকে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছি। ও হয়ত মরক্কোর উপকূলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তার সাথে দেখা হওয়ার পরই ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব।

তোমার প্রিয় মানুষটি উপকূলের কোথাও লুকিয়ে আমাদের অপেক্ষা করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। নয়তো স্থলপথের অভিযানে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। হামিদ বিন জোহরা আর আতেকার ব্যাপারে যে ভুল করেছিলাম এবার তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি চাই না তোমার স্ত্রী নিজকে নিঃসঙ্গ অথবা অসহায় মনে করুক।'

ঃ 'অভিযান তার দুয়ার পর্যন্ত যাবে আর আমি সঙ্গে থাকবো না, এ কেমন করে হয়!'

ঃ 'এ সময় কোন অভিযানে অংশ নেয়ার মতো অবস্থা তোমার নেই।'

ঃ 'মরক্কো পৌঁছা পর্যন্ত আমি সুস্থ হয়ে যাব। অনেক দিন পর প্রাণ ভরে ঘুমিয়েছি।'

ঃ 'তুমি অভিযানের সঙ্গী হতে পারলে তো আমি বরং খুশীই হবো। দোয়া কর, আমরা পৌঁছার পূর্বে আলফাজরার অবস্থা যেন বিপজ্জনক না হয়ে পড়ে। ওসমান নিশ্চয় তোমাকে বলেছে, আমার ঘরে বদরিয়া উদ্বেগের সাথে তোমার আর তোমার স্ত্রীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।'

ঃ 'তিনি আমাকে ভুলে যাননি এ আমার সৌভাগ্য। এ যুগে ভাই নিজের ভাইকে মনে রাখে না। কত বন্ধু ছিল, চকিতে মনের কোণে তাদের ছবি ভেসে উঠে আবার ধোঁয়ার মতোই মিলিয়ে যায়। আলফাজরা এসে মনে হতো গ্রানাডা ছিল এক স্বপ্ন, আবার ডন লুইয়ের কয়েদখানায় গিয়ে আলফাজরাকেও স্বপ্নের মতো মনে হতো।

কী দুর্ভাগ্য আমাদের! জাঁকজমকপূর্ণ অতীতকে আমরা স্বপ্নে রূপান্তরিত করেছি। আমি প্রায়ই ভাবি, বিগত শতকগুলোতে কত আবু আবদুল্লাহ আর আবুল কাসেম জন্ম নিয়েছিল, যাদের গাদ্দারী আমাদের ভবিষ্যতের আলোগুলো নিভিয়ে দিয়েছে। আমাদের ঠেলে দিয়েছে চিরস্থায়ী জিল্লতি আর অপমানের গহীনে।'

শাহী দরবারে ডন লুই

কয়েক মাস পূর্বে ইউসুফ এবং ওসমান আলফাজরা এসে সাদিয়ার জন্য জেলে গিয়েছিল আশার টিমটিমে প্রদীপ।

সাদিয়ার চাকর আবু ইয়াকুব অসংখ্য বার তাকে আবু আমেরের গ্রেফতারীর কাহিনী শুনিয়েছিল, শুনিয়েছিল সাদিয়ার জন্য রেখে যাওয়া ইউসুফ ও ওসমানের আশার বাণী। কিন্তু ওর কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মানসিক তৃপ্তির জন্য ওর খালা এক কৃষকের স্ত্রীকে আবু আমেরের গ্রামে পাঠিয়েছিলেন। ও ফিরে এসে বলেছিল আবু আমেরের বাড়ীতে কেউ নেই।

নীলিমার অসীম শূন্যে তাকিয়ে ছিল সাদিয়া। ওর মন বলছিলঃ 'আবুল হাসান মরেনি। ওর জন্য তাকেও বেঁচে থাকতে হবে।'

ও হাসানের বন্ধুদের সফলতার জন্য দোয়া করত। কতদিন পর ওর

ঠোঁটে ভেসে উঠেছিল মৃদু হাসি। চোখে মুখে আশার দীপ্তি।

কিন্তু যখন দিন গড়িয়ে সপ্তাহ গেল, সপ্তাহ গড়িয়ে এল মাস, তারপর মাসও বদলে যেতে লাগল, তখন ওর হৃদয়মথিত করে বেরিয়ে আসত তোলপাড় করা হতাশা আর হাহুতাশ। কখনো তার মনে হত, ইউসুফ ও ওসমানের আগমনও ছিল এক মধুর স্বপ্ন। ওরা তার মন ভোলানোর জন্য দু'চারটে আশার কথা শুনিয়েছে। আবু আমের প্রতারণা করে আবার হয়ত আবুল হাসানকে ধরিয়ে দিয়েছে। ওর সাহায্যে গিয়ে ইউসুফরা নিজেরাই ফেঁসে গেছে। কিন্তু অসহায়ত্বের বিপন্ন অনুভূতি নিয়ে ও যখন সিজদায় পড়ে দোয়া করত, মনে হতো, আবুল হাসান দূর থেকে ডেকে বলছেঃ 'সাদিয়া, আমি বেঁচে আছি সাদিয়া। আমি এখন মুক্ত। সাদিয়া আমি আসছি।' এরপর প্রতিটি প্রভাত আসতো আশার বর্ণিল সাহসে ভর করে আর অপেক্ষার অসহ্য অনুভূতিতে ছুটে আসত এক একটি সন্ধ্যা।

গ্রানাডার চলতি ঘটনা প্রবাহ ছিল আশংকাজনক। পাহাড়ী কবিলাগুলো নিজেদের ভবিষ্যতের আকাশে দেখছিল জুলুম ও বর্বরতার ঘনঘটা। ক্যাথলিক খৃস্টান সম্রাট ফার্ডিনেণ্ড এবং রাণী ইসাবেলা গ্রানাডার মুসলমানদের উপর বিদ্রোহের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সকল চুক্তি বাতিল করে গীর্জাকে জোর করে খৃস্টান বানানোর অনুমতি দিয়েছেন, প্রথমদিকে আলফাজরার মুসলমানদের একথা বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন ওদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, সম্মানের মৃত্যু অথবা হিজরত ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই গ্রানাডাবাসীর। তাদেরকে ময়দানে হাজির করার জন্য এক বিপ্লবী কণ্ঠের প্রয়োজন ছিল। আলফাজরায় এমন লোকও ছিল যার কণ্ঠ আগুন ঝরাতে পারে। প্রথম দিকে উত্তরের পার্বত্য এলাকার কয়েকটি চৌকি থেকে খৃস্টান ফৌজকে মেরে তাড়িয়েও দিল কয়েকটি স্বাধীনতা প্রিয় কবিলা।

সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির জন্য ফার্ডিনেণ্ড নেপলস আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। জেমস গ্রানাডায় যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল এবং আলফাজরার যে সব খবর তার কাছে আসছিল তাতে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। নেপলস অভিযানের পূর্বে তিনি ঘরোয়া ব্যাপারে জড়াতে চাচ্ছিলেন না। কবিলার সর্দারদের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, স্থানীয় অথবা কোন মোহাজেরকে জোর করে খৃস্টান বানানো হবে না।

খৃস্টানদের সাথে ভবিষ্যত জড়িয়ে ফেলা গাদ্দারদের মধ্য থেকেই দূত

নির্বাচন করা হত। ওরা গাঁয়ের সরদারদের গিয়ে বলত, গ্রানাডায় যা ঘটেছে তার জন্য এক পাগল পাদ্রীই দায়ী। পোপ জেমসের কারণে রাষ্ট্র যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা বাতিল করা সম্ভব নয়। কিন্তু ফার্ডিনেণ্ড কথা দিয়েছেন, আগামীতে কোন এলাকায় এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন, নতুন খৃষ্টানদের অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। গ্রানাডায় ফেরার পর নতুন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। গাদ্দাররা মুসলমানদের আরো বুঝাত যে, নেপলস আক্রমণ করার জন্য ফার্ডিনেণ্ড গীর্জার কাছে বাঁধা। এ জন্য তিনি জেমসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। যুদ্ধ শেষ হলেই গ্রানাডার সাথে করা চুক্তির শর্তের দিকে মন দিতে পারবেন। মুসলমানদের স্বার্থে ভেংগে ফেলা চুক্তিগুলো আবার চাঙ্গা করবেন। কিন্তু কবিলাগুলো ফার্ডিনেণ্ডের এ প্রতিশ্রুতির অর্থ বুঝতেন। গ্রানাডার বর্তমান অবস্থার আলোকে কেউ আর প্রতারিত হতে চাইতেন না।

কবিলাগুলোর বিদ্রোহ দমন করার জন্য ফার্ডিনেণ্ডকে রিজার্ভ সৈন্য পাঠাতে হল। এ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন 'এলন জুডি এগিউ'র নামের একজন অভিজ্ঞ জেনারেল। খ্রীস্টান সেনাবাহিনী কোন এলাকা আক্রমণ করলে পুরুষরা যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যেতেন। বন্দী করা হত শিশু এবং নারীদের। ১৫০০ শতাব্দীর গ্রীষ্ম পর্যন্ত এ অবস্থা চলল। কোন দিন গীর্জার পাদ্রী জেনারেলের বিজয়ের উৎসব করত, কয়েক দিন পর শোনা যেত অন্য এলাকায় জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন।

আলহামরার প্রশস্ত কক্ষে বসে আছেন রাণী ও ফার্ডিনেণ্ড। ভেতরে প্রবেশ করল একজন তরুণ অফিসার। কুর্নিশ করে এগিয়ে এল সম্রাটের কাছে। তার হাতে ছিল একটি চিরকুট। চিরকুট পড়ে রাণীর দিকে এগিয়ে দিলেন ফার্ডিনেণ্ড। অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'ফাদার জেমসকে পাঠিয়ে দাও।'

অফিসার আবার কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল। খানিক পর কক্ষে ঢুকলেন জেমস। কোন ভূমিকা না করেই বললেনঃ 'মাননীয় সম্রাট এবং সম্মানিতা রাণী, আমি অনুভব করছি কোন বিজয়ের সংবাদ এলে গীর্জার এক নগন্য খাদেম হিসাবে আমার উচিত আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানানো। আলফাজরার বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করার পর বেলফিক, নাজ্জার এবং গোয়েভারও জয় করেছি, এ আমাদের জন্য কত বড় সুসংবাদ।'

ফার্ডিনেণ্ডের ঠোঁটে ফুটে উঠল এক চিলতে বিদ্রুপের হাসি। রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'পবিত্র পিতা! এ বিজয় একজন শাসকের বিজয় নয়। আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে অনেক গ্রাম ধ্বংস করেছি। বেলফিক দখল করার পর আমাদের সৈন্যরা সকল পুরুষকে হত্যা করেছে, মহিলাদের করেছে দাসী। এণ্ড্রোসের বড় মসজিদে আশ্রয়গ্রহণকারী নারী ও শিশুদের বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আপনি চেয়েছিলেন, দখলকৃত এলাকা থেকে ১১ বছরের কম বয়সের শিশুদের পিতামাতার কোল থেকে ছিনিয়ে খৃস্টানদের হাতে তুলে দিই। তাহলে আপনারা তাদেরকে নরকের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবেন। আমরা হাজার হাজার শিশুদেরকে পিতামাতার কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছি। এখন পূণ্যবান খৃস্টানদের খুঁজে বের করা আপনার কাজ। আমার আশংকা হচ্ছে, মুসলমান শিশুদেরকে নরক থেকে বাঁচানোর ইচ্ছের কারণে স্পেনের প্রতিটি শহর লাওয়ারিশ শিশুতে ভরে যাবে।'

ঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না।' ফাদার বললেন, 'এসব শিশু নিয়মিত খৃস্টানদের শিক্ষা গ্রহণ করবে। ওরা ভুলে যাবে আরবী ভাষা, ভুলে যাবে মুসলমানদের কৃষ্টি ও সভ্যতা। তখন এরাই হবে গীর্জার দূর্লভ সম্পদ। আলফাজরায় গিয়ে নিজের কাজ করার জন্য কবে আপনার অনুমতি পাব সে প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি।'

ঃ 'এ জন্য আমার অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি তো আরবী জানেন না, ওরাও আপনার ভাষা বুঝবে না।'

ঃ 'আরবী জানা কয়েকজন পাদ্রীকে ২০ দিন পূর্বেই ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি গিয়ে শুধু মুসলমানদেরকে দীক্ষা দেব।'

ঃ 'যত সহজ ভেবেছেন কাজটা তত সহজ নয়। আপনি আরবী জানা যেসব পাদ্রীদের ওখানে পাঠিয়েছেন, সেনা প্রহরার মধ্যেও ওদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে সেনা প্রহরা আরো কঠোর করা হয়েছে। ফৌজের কাজ যুদ্ধ করা, পাদ্রীদেরকে পাহারা দেয়া নয়। আপনার সুখ-চিন্তা দূর করার জন্য বলছি, এখনো আমরা বড় ধরণের কোন সফলতা লাভ করতে পারিনি। সিপাহসালারের পাঠানো নতুন সংবাদ হল, সিরমিজা, এবং সিরারোন্দায় বিদ্রোহের আশংকা দেখা দিয়েছে। পূর্বাঞ্চলেও যে কোন সময় এ আগুন জ্বলে উঠতে পারে। আলফাজরায় গেলে অন্য কোন ক্ষেত্র থেকে সৈন্য সরিয়ে আপনার হেফাজতের জন্য নিয়োগ করতে হবে।'

ঃ 'আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না।'

ঃ 'পবিত্র পিতা!' রাণী বললেন, 'আপনার জীবন অনেক মূল্যবান। আপনাকে কোন ঝুঁকি নিতে দেব না। এক এক করে সকল পার্বত্য এলাকাগুলো আমাদের কব্জা করতে হবে। যখন আমরা বুঝব, গ্রানাডার মত ওদের কেউ আর মাথা তুলবে না, তখন প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে দীক্ষা দিতে পারবেন। ইস! আমি নিজে ওখানে গিয়ে যদি আপনাকে স্বাগত জানাতে পারতাম!'

ঃ 'রাণী!' ফার্ডিনেণ্ড বললেন, 'ফৌজকে তাদের কাজ শেষ করতে দাও। ফাদারকে বুঝিয়ে বল যেন আলফাজরা যাবার ইচ্ছে ত্যাগ করেন। আমাদের কাছে তার জীবন অনেক মূল্যবান। তার ইচ্ছে অনুযায়ী নেপলস আক্রমণ না করে আভ্যন্তরীণ সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি। ঈশ্বর জানেন এ বিদ্রোহ এখন কোথায় গিয়ে গড়ায়। কতদিন আমাদের ফৌজকে ময়দানে থাকতে হয়।'

এক ফৌজি অফিসার কক্ষে ঢুকে কুর্নিশ করে বললঃ 'আলীজাহ! কাউন্ট ডন লুই আপনার কদমবুসির জন্য অনুমতি চাইছেন।'

ঃ 'সে তো নতুন পৃথিবীতে যাবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করতে গেছে। এখানে এলো কিভাবে? ডাক তাকে।'

অফিসার বেরিয়ে গেল।

জেমস উঠতে উঠতে বললেনঃ 'এবার আমায় অনুমতি দিন।'

ঃ 'না আপনিও বসুন। ডন লুইয়ের সাথে কথা শেষ করে আপনার সাথে আরো কিছু কথা বলতে চাই।'

ঃ 'পবিত্র পিতা! আপনি বসুন, ডনলুইকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেব।'

ফাদার বসলেন। কয়েক মিনিট পর কক্ষে প্রবেশ করল ডন লুই। রাণী এবং সম্রাটকে কুর্নিশ করে ঝুঁকে ফাদারের হাতে চুমো খেলো। এরপর রাণীর ইশারায় বসে পড়ল ফাদারের কাছে।

ঃ 'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' ফার্ডিনেণ্ড বললেন।

ঃ 'আলীজাহ! আমি পথে কমই বিশ্রাম করেছি।'

ঃ 'মনে হয় ভাল সংবাদ নিয়ে আসনি। কোন জাহাজ কি ডুবে গেছে?'

ঃ 'মহামান্য সম্রাট, শুধু জাহাজের কথা হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না।'

ঃ 'বাড়ীতে সবাই ভাল আছে তো?' রাণী প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'পারিবারিক দুর্ঘটনা হলে এদ্দুর আসার সাহস করতাম না।'

ঃ 'তাহলে কি দুর্ঘটনা?' চমকে প্রশ্ন করলেন ফার্ডিনেণ্ড।

ঃ 'আলীজাহ! নতুন পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য যে তিনটি জাহাজের ব্যবস্থা করেছিলাম, তিনটেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তার সাথে ডুবে গেছে আমার নিজের জাহাজটাও।'

ঃ 'চাকর-বাকর সহ ডুবেছে?'

ঃ 'না, চাকর-বাকরদেরকে জাহাজে তোলার আগেই ডুবে গেছে। অল্প ক'জন মাঝিমাল্লা আহত হয়েছে। গরু, ছাগল, ঘোড়া, ভেড়া এবং অন্যান্য পশুগুলো জাহাজে তোলা হয়েছিল। ওগুলো সব গেছে। আমার মহলের এক অংশ ধ্বংস হয়েছে। আমি নিজের ক্ষতির কথা বলতে এখানে আসিনি। তুর্কীদের যুদ্ধ জাহাজগুলো প্রায় চার ঘন্টা উপসাগর কব্জা করে রেখেছিল। ওরা সকল চাকর-বাকর, মরিসকো জেলে এবং কৃষকদেরকে সাথে নিয়ে গেছে। আমাদের পাদ্রী এবং আটজন কয়েদীকেও নিয়ে গেছে। পাদ্রী এদেরকে ইনকুইজিশনের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছিলেন।'

ঃ 'কি বললে, পাদ্রীকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে! তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?'

ঃ 'ওরা পাদ্রী ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে গেছে। আমরা তাকে কোথাও খুঁজে পাইনি। নদীতে লাশও খুঁজেছি, নেই। বেলেনসিয়ার বিশপের ভাগ্য ভাল, খাওয়ার পর পাদ্রীর সাথে যাননি। নয়তো তিনিও তুর্কীদের হাতে বন্দী হতেন।'

ঃ 'তোমার কি ধারণা, তুর্কীরা তাকে হত্যা করেনি?' ফাদার বললেন।

ঃ 'আমার বিশ্বাস, কয়েদীরা তাকে হত্যা না করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।'

ঃ 'এই না বললে পাদ্রী ওদেরকে ইনকুইজিশনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। ওরাই তার জীবন বাঁচাবে, এ কেমন করে হয়?'

ঃ 'ওদের সাধ্যে থাকলে কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য পাদ্রীকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবে।'

ঃ 'দীক্ষাপ্রাপ্তরা তার জন্য কোন হামদর্দী দেখায়নি?' রাণী প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'দীক্ষা প্রাপ্তরা জানে পাদ্রী ওখানে ইনকুইজিশনের অফিস খোলার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তুর্কীরা তাকে দয়া দেখালেও কোন মরিসকো তাকে ক্ষমা করবে না।'

ফাদার রাগে লাল হয়ে বললেনঃ 'ওখানে ইনকুইজিশনের পক্ষ থেকে ৮/১০ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলে কোন মরিসকো অথবা মুসলমান মাথা তোলার সাহস করত না।'

ঃ 'পবিত্র পিতা, ওরা কিছুই করেনি। এর সবই তুর্কীদের কাজ। ঈশ্বরের কৃপা, শক্তি প্রদর্শনের জন্য ওরা আমার কেল্লা নির্বাচন করেছে। তা নয়তো বড় কোন বন্দরেও এ হামলা করতে পারত। আপনি সবখানে ইনকুইজিশনের অফিস স্থাপন করতে পারেন, কিন্তু সাগর পাড়ের বন্দরে তুর্কী জাহাজের ধ্বংসযজ্ঞ রুখতে পারেন না।'

ঃ 'তুমি কি বলতে চাও এ জন্য ইনকুইজিশন তার পবিত্র কর্তব্য থেকে বিরত থাকবে?' ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল জেমসের চেহারা।

ঃ 'আমি তো তা বলিনি।'

ঃ 'তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন'। রাণী প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আমি বলতে চাই, সারা দেশ গোয়েন্দায় ভরে গেছে। তুর্কীরা তাদের কাছ থেকে সকল সংবাদ পায়। আমার কেল্লার কাছে কয়টা জাহাজ আছে ওরা জানত। কেল্লার অদূরে কামান রাখার জন্য দু'টি বুরুজ তৈরী করেছিলাম, এ খবরও তাদের ছিল। মূল হামলার পূর্বে বুরুজ দু'টি উড়িয়ে দেয়। ওরা জানত শুকনো খড়ের গাঁদা কোথায়। আক্রমণের পূর্বেই ওখানে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ফ্রান্সিসের ক্ষুদ্র কয়েদখানা কোথায় তাও তাদের জানার বাইরে ছিল না।'

ঃ 'স্পেনের সব মুসলমান শেষ হলেই কেবল বাইরের হামলা এবং গোয়েন্দাদের তৎপরতা বন্ধ হতে পারে। ইনকুইজিশন ছাড়া এ কাজ আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

ঃ 'পবিত্র পিতা! ফার্ডিনেণ্ড বললেন, 'তুর্কীদের দৃষ্টি দক্ষিণ-পশ্চিমের দেশগুলোকে বশে রাখার জন্য রোম উপসাগরে ওদের যুদ্ধ জাহাজের দু'একটা বিজয়কেই যথেষ্ট মনে করছে। ওরা স্থলপথে স্পেনের রোখ করলে আমরা এখানে থাকতাম না।'

রাণী বললেনঃ 'গ্রানাডায় মুসলিম হুকুমত থাকলেই এমনটি হতে পারত। ইশ্বরের কৃপায় আলফাজরায় আবু আব্দুল্লাহর ক্ষুদ্র সালতানাতও এখন আর নেই।'

ঃ 'যেদিন স্পেন মুসলমান মুক্ত হবে, আর যারা আন্তরিকতার সাথে খৃষ্টবাদ গ্রহণ করবে না তাদেরকে জীবিত পুড়িয়ে মারতে পারব, সেদিন

আসবে আমাদের পরিপূর্ণ সফলতা।' বলল জেমস।

ঃ 'তা আপনি কি এলাকার হেফাজতের জন্য ফৌজ বা যুদ্ধ জাহাজ চাচ্ছেন?'

ঃ 'না জাহাঁপনা! ওরা যে উদ্দেশ্যে আমার এলাকায় এসেছিল তা পূরণ হয়েছে। আমার মনে হয়, দ্বিতীয়বার আর ওরা আক্রমণ করবে না। আমার আবেদন হচ্ছে, আলফাজরায় আমাদের সেনাপতি যদি আমায় খানিক সহযোগিতা করেন তাহলে সে গোয়েন্দাদের নেতাকেও পাকড়াও করতে পারব। তাকে ধরতে পারলে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে।'

ঃ 'আশা করি রাণী এবং সম্রাট এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা করবেন।' জেমস বলল, 'একটা গোয়েন্দাকে ধরতে পারলে ইনকুইজিশন তার কাছ থেকে হাজারো গাদ্দারের তথ্য বের করবে।'

ফার্ডিনেণ্ড বললেনঃ 'আলফাজরা পর্যন্ত ইনকুইজিশনের আগুন ছড়িয়ে দিতে আরো কিছুদিন ধৈর্য্য ধরতে হবে। তবে শত্রুর কোন গোয়েন্দা ধরা পড়লে ইনকুইজিশনের হাতে না দিয়েই অনেক কিছু বের করা যাবে। তার পরিবর্তে তুর্কীদের কাছ থেকে পাদ্রী ফ্রান্সিস অথবা অন্য কোন কয়েদীকে মুক্ত করতে পারব। ডন লুই, আলফাজরা থেকে কোন লোককে গ্রেফতার করতে তোমার আর কোন সমস্যা হবে না। ওখানকার কয়েকটি কবিলা অস্ত্রসমর্পণ করেছে। অন্যান্য কবিলার সর্দারদের সাথে সন্ধির ব্যাপারে আমাদের কথা হচ্ছে।'

ঃ 'আলীজাহ! আমি পালিয়ে যাওয়া শিকারকে ধাওয়া করছি। একটু দেরী হলেই ফসকে যাবে। ওখানে শ'খানেক সৈন্য পেলেই আমার চলবে।'

ঃ 'তুমি যথেষ্ট ক্লান্ত। কিছুক্ষণ পর রাত নামবে। রাতে সফর করা ঠিক নয়। যাও, এখন বিশ্রাম কর, সকালে এলেন্‌জুর নামে চিঠি পাবে। পথের চৌকিগুলোতে তোমার প্রতি খেয়াল রাখার জন্য সংবাদ পাঠানো হবে। একজন দায়িত্বশীল অফিসারও তোমার সাথে যাবে। কিন্তু......' ফার্ডিনেণ্ড কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সেনাপতি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন শান্তিপূর্ণ এলাকায় হয়ত ঝমেলায় জড়াতে চাইবে না।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আলীজাহ! যে এলাকায় গোয়েন্দাকে পাকড়াও করতে যাচ্ছি, ওখানে কোন সমস্যাই সৃষ্টি হবে না। ওখানে বিদ্রোহীদের তুলনায় আপনার সমর্থক সংখ্যা অনেক বেশী।'

মাসয়াবের বাড়ী। দু'শ সশস্ত্র অশ্বারোহী দরজায় এসে থামল। নেতৃস্থানীয় পাঁচ ব্যক্তি ঘোড়া থেকে নেমে ভেতরে প্রবেশ করলেন। চাকররা তাদেরকে বৈঠক ঘরে বসিয়ে মাসয়াবকে সংবাদ দিতে চলে গেল। খানিক পর কক্ষে প্রবেশ করলেন মাসয়াব। সকলের সাথে মোসাফেহা করে মুখোমুখী বসলেন। পাঁচ জনের দু'জন আরব, তিন জন বারবারী কবিলার সর্দার। বয়সে প্রবীণ একজন আরব সর্দার বললেনঃ 'আমরা জানি হারেস আপনার এক বিপজ্জনক প্রতিবেশী। খ্রীস্টানদের সন্দেহমুক্ত থাকতে আপনাকে যথেষ্ট হুঁশিয়ার থাকতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এ পথ মাড়াতাম না। কিন্তু পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। যে আগুন নাজ্জার, গোয়েভার, এণ্ড্রোস এবং বেলফিকে দেখেছি, তার শিখা থেকে আলফাজরার কোন একটি ঘরও নিরাপদ নয়। যেসব নেতারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবেন বলে আশা ছিল, তারাও হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের যৎসামান্য প্রতিরোধ শক্তিও নিঃশেষ করে দেয়া হবে। ফার্ডিনেণ্ডের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী বাঁচতে হলে আমাদেরকে খ্রীস্টান হয়ে যেতে হবে। কিন্তু এমন বাঁচার চাইতে শাহাদাতের জীবন অনেক ভাল। আলফাজরায় খ্রীস্টান ফৌজের চাপ দিন-কে-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাপ কমাবার একটাই পথ, গোটা পার্বত্য এলাকায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা এক স্থানে পিছু হটলে যেন কয়েক জায়গা থেকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সিরারোন্দা এবং মিজার বাহাদুর কবিলাগুলোর কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা কয়েকটা চৌকি থেকে খ্রীস্টান ফৌজকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের আহ্বান করেছে ওদের সংগী হওয়ার জন্য। আমরা ওখানেই যাচ্ছি। ইতোমধ্যে সাত হাজার স্বেচ্ছাকর্মী ওখানে চলে গেছে।

আমাদের এখানে আসার কারণ সাদিয়ার পিতা ছিলেন একজন মুজাহিদ এবং আমাদের বন্ধু। আপনার জন্য পরামর্শ হল, নিজের জন্য না হলেও ওই মেয়েটার জন্য দেরী না করেই এ এলাকা ছেড়ে দিন। সমুদ্রপথ এখনো মুক্ত। ওখানে কোন জাহাজও পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। ফার্ডিনেণ্ড যখন বুঝবেন, পাহাড়ী কবিলাগুলো এখন আর মাথা তুলতে পারবে না, তখন স্পেন হবে আমদের জন্য এক

বন্দীশালা। হারেসের সাথে বন্ধুত্বের খাতিরে ওরা আপনাকে রেয়াত করবে, এমনটি কখনো ভাববেন না।'

ঃ 'না, আমি কোন ভুল ধারণা পোষণ করি না।' মাসয়াব বললেন 'হারেসের কারণে বিয়ের দিনই সাদিয়ার স্বামী গ্রেফতার হয়েছিল। সাদিয়াকে ভাল জানে আশপাশের এমন সবাই হারেসের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সাদিয়ার আশংকা ছিল, হারেসের কিছু হলে বা কেল্লায় হামলা হলে মুহূর্তের জন্যও আমরা এখানে থাকতে পারব না।'

ঃ 'হারেসের জন্য সাদিয়ার এ দরদের কারণ কি? '

ঃ 'ওই গাদ্দারের জন্য সাদিয়ার কোন আন্তরিকতা নেই। সে যে আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন সাদিয়া আমাদের চাইতে তা ভাল বোঝে। আলফাজরায় সে খ্রীস্টানদের বিশ্বস্ত সংগী। কিন্তু সাদিয়ার ধারণা, আবুল হাসান কোন না কোন দিন তাকে খুঁজতে এখানে ছুটে আসবে। এ জন্য এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না।'

ঃ 'বর্তমানে ওর এখানে থাকা যে বিপজ্জনক তা কি আপনি বোঝেন?'

ঃ 'হাজার বার ওকে এ কথা বুঝিয়েছি। আপনারা আসার পূর্বেও বোঝাচ্ছিলাম। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ও আমার চাইতেও ভাল ধারনা রাখে। কিন্তু আবুল হাসান এখানে আসবে তাকে এ বিশ্বাস থেকে টলাতে পারিনি।'

ঃ 'হয়তো ওর মনের অবস্থা ভাল নেই।'

ঃ 'ওর সাথে কথা বললেই বুঝতে পারবেন, ও মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ। ওকে হয়ত আফ্রিকা যাবার জন্য রাজী করাতে পারতাম। কিন্তু ওর খালারও ধারণা, আবুল হাসানের জন্য এখানেই অপেক্ষা করা উচিত। চাকর-বাকরদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ওর কথা অবিশ্বাস করে। ওরা সবাই হাসানের পথ চেয়ে আছে। ও আগে বিষন্ন থাকত। কিন্তু বর্তমানে এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতেও ও কেমন নির্বিকার। প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যা ও আবুল হাসানের পথ চেয়ে কাটায়। তার খালারও একই অবস্থা। গ্রামের মেয়েরা ওকে দারুণ শ্রদ্ধা করে। সন্তানের অসুখ বিসুখ হলে ঝাড়ফুঁকের জন্য নিয়ে আসে ওর কাছে। ওর দোয়া কবুল হয়, এ কথা গাঁয়ের সবার মুখে মুখে।'

ঃ 'স্বামী ফিরে আসার ব্যাপারে ওর বিশ্বাস এত গভীর হলে এ নিয়ে কথা বলব না। বুঝতে পারছি, এ অবস্থায় আপনাকেও এখানেই থাকতে

হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করব আপনার জন্য যেন হারেসের বাড়িতে কোন আক্রমণ না হয়। আল্লাহ এ নিষ্পাপ মেয়েটার আশা পূরণ করুন। এবার যাবার অনুমতি দিন, আমাদের সংগীরা বাইরে অপেক্ষা করছে।'

বৃদ্ধ সর্দার উঠে দাঁড়ালেন। মাসয়াব ওদের দরজার বাইরে এগিয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন দিগন্তের ধূলো মেঘের দিকে।

এক সোনালী ভোরে সাদিয়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। চাকরাণী এসে বললঃ 'এক মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। আমি ওকে খালাম্মার কাছে নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও নাকি আপনার সাথেই কথা বলবে।'

ঃ 'কোথায় সে?'

সাদিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় নেমে এল। এক অপরিচিত মহিলাকে দেখে বললঃ 'আমি সাদিয়া। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

পেছনে চাকরাণীকে দেখে মহিলাটি বললঃ 'আমি একান্তে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।'

সাদিয়া হাত ধরে তাকে রুমে নিয়ে এল।

ঃ 'বল, কি ব্যাপার? কি সংবাদ নিয়ে এসেছ? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

ঃ 'আমাকে আম্মারা পাঠিয়েছে।'

সাদিয়া বললঃ 'আবু আমেরের স্ত্রী?'

ঃ 'জ্বী।'

ঃ 'তুমি আবু আমেরকে দেখেছ?'

ঃ 'জ্বী না।'

ঃ 'আম্মারাদের বাড়ীতে আর কেউ ছিল?'

ঃ 'জ্বী, আমি সে বাড়ী যাইনি। সে অনেক দিন থেকে বাড়ী নেই। আজ ভোরে ও আমাদের বাড়ী এসে বলল, আমি যেন আপনার কাছে এসে বলি, কোন সুসংবাদ শুনতে চাইলে একা আমাদের বাড়ীতে চলে আসুন। তার কথায় মনে হল, সে গত রাতে বাড়ী ফিরেছে এবং আমাদের বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও যায়নি। সে আমাকে আরো হুঁশিয়ার করে বলল, তার আসার খবর যেন গাঁয়ের আর কাউকে না বলি। তাকে কেমন ভীতা মনে হচ্ছিল। আমি তাকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে তাড়াহুড়া

করে ফিরে যেতে যেতে বলল, গ্রামের কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হবে। ও আমার পূরনো প্রতিবেশী। তাকে দেখে মনে হল, কোন বিপদে পড়েছে। এ জন্য ঘরের কাজ শেষ করেই চলে এসেছি। আপনি যদি যেতে না চান আমি তাকে সংবাদ পাঠিয়ে দেব।'

সাদিয়া ছুটে পাশের কামরায় গিয়ে ফিরে এসে মহিলার হাতে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বললঃ 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার নাম যেন কি?'

ঃ 'আমার নাম সুমাইয়া। আপনার যাওয়াটা ঠিক মনে না করলে আম্মারাকে বললে সে নিজেও এখানে চলে আসতে পারে।'

ঃ 'তার দরকার নেই। সে নিশ্চয়ই কোন কারণে এখানে আসেনি। আমি নিজেই ওখানে যাব।'

ঃ 'কবে যাবেন?'

ঃ 'তোমার পৌঁছার আগেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারি।'

গ্রামের মহিলাটি সালাম করে বেরিয়ে গেল। সাদিয়া চাকরাণীকে ডেকে বললঃ 'আবু ইয়াকুবকে দু'টো ঘোড়া তৈরী করতে বল।'

চাকরাণী চলে গেল। সাদিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে খালার কাছে গিয়ে বললঃ 'খালাম্মা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আবু আমেরের স্ত্রী খবর পাঠিয়েছে। কোন সমস্যার কারণে ও হয়ত এখানে আসতে পারেনি। আমি নিজেই তার বাড়ী যাচ্ছি। আবু ইয়াকুব ফিরে এসে বলবে আমি কখন ফিরব।'

ঃ 'সাদিয়া, মা শোন। এ কোন ষড়যন্ত্র নাতো! আমার খুব ভয় হচ্ছে।'

ঃ 'খালাম্মা, এ এলাকায় হারেসের চাইতে বড় কোন দুশমন নেই আমাদের। আমাদের ক্ষতি করতে চাইলে সে যে কোন সময়ই তা পারে। আবুল হাসান গ্রেফতার হওয়ার সময়ের চাইতে এখন আমরা বেশী অসহায়। আমরা ছিলাম জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি। আমি অনুভব করছি, সে আগ্নেয়গিরি এখন ফেটে যাচ্ছে, আমরা তারই পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি। খালাম্মা, আমি এখন হিজরতের জন্য তৈরী।'

ঃ 'মা, তুমি বললে তো আমরা এক্ষুণি রওয়ানা হতে পারি। তোমার খালু কেবল তোমার মনের দিকে চেয়ে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেননি।'

ঃ 'আমি ফিরে এসে এখানে আর একদণ্ডও থাকব না।'

ঃ 'আল্লার শোকর! শেষ পর্যন্ত তোমার মাথা ঠিক হয়েছে।'

ঃ 'মাথা আমার সব সময়ই ঠিক ছিল। কেন, গত পরশু আমার স্বপ্নের

কথা আপনাকে বলিনি? স্বপ্ন দেখার পরই আমার মনে হয়েছে, আমার পরীক্ষার দিন ফুরিয়ে এল বলে। মন বলছে আবুল হাসান মুক্তি পেয়েছে। আহত হয়ে লুকিয়ে আছে আশপাশের কোথাও। আবু আমেরের বাড়ীতেই হয়ত লুকিয়ে আছে। আম্মারা মহিলাকে শুধু বলেছে, সে আমাকে একটা সুসংবাদ দেবে। আর আমাকে তো সে কেবল একটাই সুসংবাদ শোনাতে পারে। আমি তাহলে যাই এবার।'

ঃ 'মা! তোমাকে কি করে বারণ করব, তাড়াতাড়ি এসো?'

খানিক পর সাদিয়া ও আবু ইয়াকুব ঘোড়া নিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে এল। কিছু দূর গিয়ে আবু ইয়াকুব বললঃ 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম।' সাদিয়া ঘোড়া থামিয়ে বললঃ ঃ 'কি?'

আবু ইয়াকুব বললঃ 'এ মহিলাকে আগে কখনো দেখেছেন?'

ঃ 'না, কিন্তু তাতে কি?'

ঃ 'আমি তাকে ভালভাবে দেখিনি। তবুও মনে হয়েছে, ও আমাদের গ্রামের নয়। পোশাকে আশাকে গ্রাম্য হলেও কথাবার্তা এবং চালচলনে গ্রাম্য মনে হয়নি। গ্রামের লোকেরা একান্ত বাধ্য না হলে মেয়েদেরকে এভাবে একা ছেড়ে দেয় না।'

ঃ 'ওর একা আসার দরকার ছিল বলে এসেছে।'

ঃ 'হয়ত তাই। আমার সন্দেহ অমূলকও হতে পারে। কিন্তু ওদিকে যেতে আমার কেন যেন ভয় ভয় করছে। এক কাজ করুন না হয়, ঘোড়াটা গ্রামের বাইরে ছেড়ে দিন। ওই গ্রামে আমার এক কৃষক বন্ধু আছে, ইয়াহইয়া। আমি আমার ঘোড়া তার বাড়ীতে রেখে আমেরের বাড়ীর আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকব। কোন সমস্যা দেখা দিলে, গ্রামের যারা আপনাকে ভালবাসে তাদেরকে সংবাদ দিতে পারব। আমেরের স্ত্রীর সাথে কথা শেষ হলে আপনি আমার ঘোড়া নিয়েই বাড়ী যেতে পারবেন।'

ঃ 'ঠিক আছে।'

ঃ 'আপনি সোজা পথে চলে যান, আমি কেল্লার পেছনটা ঘুরে আসছি।'

ঃ 'তাই কর।'

সাদিয়া ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পার্বত্য পথ পাড়ি দিচ্ছিল সাদিয়া। সামনে আম্মারার সংবাদ বহনকারী মহিলা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।

দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের আওয়াজে মহিলা হকচকিয়ে এক পাশে সরে গেল। সাদিয়া তার পাশ কেটে যাবার সময় মহিলা দু'হাত তুলে তাকে

থামানোর চেষ্টা করল। সাদিয়া তাকে লক্ষ্য না করেই এগিয়ে গেল সামনে।

মহিলা চিৎকার দিয়ে বললঃ 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আম্মারা বাড়ী নেই। আমি মিথ্যে বলেছি। খোদার দিকে চেয়ে দাঁড়াও।'

কিন্তু দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দের সাথে মিশে গেল মহিলার কণ্ঠ।

হারেসের বাড়ীর সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলল সাদিয়া। বাড়ীর সদর দরজা থেকে খানিক দূরে খোলা মাঠে কয়েকটা তাঁবু। পাশে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা। এটি একটি ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক অবস্থায় ও হয়ত একে খুব গুরুত্বের সাথে দেখত। কিন্তু মহিলার সংবাদ পাওয়ার পর ওর চিন্তায় আবুল হাসান ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। না থেমে ও ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

গ্রামের কাছে এসে গেছে সাদিয়া। একটা বাগানের পাশে ঘোড়া থেকে নামল ও। এদিক ওদিক তাকিয়ে লাগাম ঘোড়ার ঘাড়ে পেঁচিয়ে বাড়ীর দিকে হাঁকিয়ে দিল। একটু পর পৌঁছল বাড়ীর দরজায়। কড়া নাড়ার পর এক ব্যক্তি দরজা খুলে দিল। দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল সাদিয়া। দেখল, আম্মারার পরিবর্তে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে।

ঃ 'আম্মারা কোথায়! আপনি কে?'

ঃ 'বিশেষ কারণে আম্মারা লুকিয়ে আছে। আমি আমেরের বন্ধু। আপনি যদি সাদিয়া হয়ে থাকেন ভেতরে আসুন। আমি আম্মারাকে ডেকে দিচ্ছি।'

ঃ 'আবু আমের কোথায়?'

ঃ 'তার স্ত্রীর সাথে। ভয় পাবেন না, গ্রামের কেউ যেন হারেসকে ওদের আগমন সংবাদ দিতে না পারে এ জন্য ওরা লুকিয়ে আছে।'

ঃ 'তাদের সাথে অন্য কেউ আছে?'

ঃ 'হয়ত আছে। কিন্তু আমি জানি না।'

সাদিয়ার হৃদপিণ্ড ভীষণভাবে লাফাচ্ছিল। ও বললঃ 'খোদার দিকে তাকিয়ে জলদি আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন।'

ঃ 'না, আপনি এখানেই দাঁড়ান। আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি।'

বুড়ো লোকটি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু বেরিয়ে যাবার পরিবর্তে খিল এঁটে দিল। এক অজানা বিপদের আশংকায় সাদিয়া দ্রুত খঞ্জর তুলে নিল হাতে। ছুটে বৃদ্ধের পেটে খঞ্জর ধরে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'তুমি হারেসের চর। আল্লাহ জানেন স্পেনের মুসলমান কতদিন পর্যন্ত

গাদ্দারদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার নেয়ার জন্য তুমি বেঁচে থাকবে না। বল ও কোথায়। কি করেছ তাকে?'

পেছন থেকে শব্দ ভেসে এলঃ 'এক বৃদ্ধকে মেরে কোন লাভ হবে না।'

চকিতে পেছন ফিরে চাইল সাদিয়া। হারেস কক্ষ থেকে বের হচ্ছে। সাথে চারজন সশস্ত্র ব্যক্তি।

ঃ 'তুমি?' কাঁপা কণ্ঠে বলল সাদিয়া।

ঃ 'হ্যাঁ আমি। এ বৃদ্ধ আমার সাধারণ এক চাকর।'

ঃ 'যে মহিলা আমার বাড়ী গিয়েছিল সেও তোমার সাধারণ একজন চাকরাণী?'

ঃ 'এছাড়া আর কোন পথ ছিল না। আগে থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, আমের এবং তার স্ত্রীর গায়েব হয়ে যাওয়ার সাথে আবুল হাসানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আবু আমের কয়েক দিনের জন্য বাইরে গেলে তোমার চাকর বাকররা গ্রামের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল ও কবে আসবে। ও ফিরে আসার পর আবু আমেরের স্ত্রীর সাথে তোমার গোপনে দেখা হত।

এরপর আবু আমের এবং তার স্ত্রী দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার সময় তোমার চাকর তাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছে। বুঝতে পারছি, তোমার স্বামীর সংবাদ নিতেই তাদের পাঠিয়েছ। এখন তুমি নিজেই চলে এসেছ। তুমি যে অনেক কিছুই জান এতেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল সাদিয়ার চেহারা। চোখের পলকে ওর খঞ্জরের আওতায় চলে এল হারেস। এক সশস্ত্র ব্যক্তি ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল। খঞ্জর বুকে না বিঁধে বাহুতে লাগল হারেসের। এক ব্যক্তি তার হাত মুচড়ে ধরল, খঞ্জর মাটিত পড়ে গেল। আরেক ব্যক্তি তরবারী তুলল আঘাত করার জন্য। হারেস চিৎকার দিয়ে বললঃ 'থামো, ওকে মেরো না। বেলেনসিয়া থেকে আমাদের সম্মানিত মেহমান যে জন্য এসেছেন, ও তার সব কিছুই জানে।'

হারেসের বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। এক সিপাই বৃদ্ধ চাকরের গলায় জড়ানো রুমাল ছিড়ে ক্ষত স্থানে বেঁধে দিল। হারেস খানিকটা ভেবে নিয়ে সাদিয়ার দিকে ফিরে বললঃ 'বেকুব মেয়ে, ডন লুই তোমাকে কি শাস্তি দেবে জানি না, তবে আমার পরামর্শ হল, যা জান তা সত্য বলবে। এ এলাকায় আবুল হাসানের সঙ্গীদের নাম বলে দিলে হয়ত কষ্টকর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। তুমি আম্মারাকে যা জিজ্ঞেস করতে এসেছ, এবার

তা শোন। আবুল হাসান ছাড়া পেয়েছে। আবু আমের অভিযানে সফল হয়েছে। এ অভিযানের নেতা কে, তা নিয়ে আমাদের অথবা ডন লুইয়ের কোন মাথা ব্যথা নেই।

ডন লুইয়ের কথার জবাবে সত্য না বললে তোমাকে ইনকুইজিশনের হাতে সোপর্দ করা হবে। ওদের হাতে পড়লে কঠিন হৃদয়ের মানুষও পেটে কোন কথা রাখতে পারে না। মাসয়াব আমার বন্ধু। ওকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই তোমাকে এসব পরামর্শ দিচ্ছি।'

সাদিয়া কিছুক্ষণ মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ও যখন মাথা তুলল, হতাশার পরিবর্তে তার চোখে মুখে তখন আশার আলো ঝলমল করছে।

ঃ 'আপনি কেমন বন্ধু খালুজান তা জানেন।' মুখ খুলল সাদিয়া, 'আমরা কেবল বিপদ এড়ানোর জন্যই এতদিন নিরব ছিলাম। কিন্তু প্রতিটি পথেরই শেষ থাকে। আবুল হাসান যদি বেঁচে থাকে, যদি মুক্তি পেয়ে থাকে সে, তাহলে একটা গোপন কথা শুনে নিন। তার তরবারী আপনার গর্দান ছুঁই ছুঁই করছে। আমার হাত থেকে বেঁচে গেলেও তার হাত থেকে আপনি যে নিস্তার পাবেন না, তা কি বোঝেন?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল হারেস।

ঃ 'আরে, ও তো তুর্কীদের সাথে সাগরের ওপারে চলে গেছে। তোমার কথা এখন ওর মনেও নেই। এখন থেকে তোমার কেবল নিজের কথাই ভাবা উচিত।'

ঃ 'আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাহায্য চাই না।'

হারেস সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললঃ 'বাইরে গিয়ে সৈন্যদেরকে ওই বাড়ীর সামনে জমা হতে বল। তোমাদের ঘোড়াগুলোও নিয়ে আসবে। গ্রামের কোন লোক যেন এদিকে আসতে না পারে। মেয়েটাকে একটা ঘোড়ার পিঠে করে কেল্লায় নিয়ে যাও। আমার জখম ততো মারাত্মক নয়, একথা এখন কাউকে বলারও দরকার নেই। কেল্লার ভেতর কি হবে মেয়েটা যদি জানত, তবে অবশ্যই তার কথার ধরণ অন্য রকম হত।'

গায়ের শেষ মাথায় ইয়াহইয়ার বাড়ী। আবু ইয়াকুব দরজার কড়া নাড়ল। দরজা খুলল তার স্ত্রী।

ঃ 'ইয়াহইয়া কোথায় ভাবী?'

ঃ 'ও একটু বাইরে গেছে, এখনি ফিরে আসবে।' মহিলা বলল, 'কোন দুঃসংবাদ নেই তো! তোমাকে কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে?'

আবু ইয়াকুব জবাব দিল না। ভেতরে ঢুকে ঘোড়া এক পাশে বেঁধে বললঃ 'ও এলে মসজিদে পাঠিয়ে দিও। আমি সেখানে অপেক্ষা করব।'

ঃ 'একটু বসো না হয়।'

ঃ 'না, খুব জরুরী কাজ আছে।'

ঃ 'ইয়াকুব ভাই, আমার কথার জবাব কিন্তু দাওনি। তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।'

ঃ 'ফিরে এসে হয়তো সব কথার জবাব দিতে পারব। সম্ভবতঃ একটা কাজে তোমাকে প্রয়োজন হতে পারে।'

বেরিয়ে গেল আবু ইয়াকুব। মসজিদে প্রবেশ করল ও। এখান থেকে দুই গ্রামের গলিপথ, বাগান এবং উত্তর দক্ষিণমুখী রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

আবু আমেরের বাড়ীর ফটক বন্ধ। এমন কোন খারাপ পরিস্থিতি চোখে পড়ছে না। বাগানের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই গাছের আড়ালে কয়েকটা ঘোড়া দেখা গেল। কয়জন লোক লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনেও দেখা গেল আট দশ জন অশ্বারোহী। হঠাৎ ওর দৃষ্টি ছুটে গেল বাগানের পাশে, রাস্তায়। বিষন্ন হয়ে গেল তার মন।

কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল সাদিয়া। দেখতে না দেখতে আম্মারার ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। শংকিত মনে মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে ও সাদিয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। এত কাল নিজেকে ও সাহসী বলেই জানতো, কিন্তু এই প্রথমবার অজানা আশংকায় ওর শরীর-মন শিউরে উঠল। অপেক্ষার প্রহরগুলো ওর সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল। কখনো ইচ্ছে হচ্ছিল বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়তে, অনেক কষ্টে সে ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখছিল ও।

অশ্বারোহী দল বেরিয়ে এল বাগান থেকে। ওরা জমা হতে লাগল আবু আমেরের বাড়ীর সামনে। সাদিয়া, হারেস এবং সংগীরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। চাকর একটা সাদা ঘোড়া নিয়ে এল দরজার কাছে। হারেস উঠে বসল তার পিঠে। দ্বিতীয় ঘোড়াটি সাদিয়ার সামনে। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে সেও ঘোড়ায় চাপল।

আবু ইয়াকুবের ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে খঞ্জরটা হারেসের বুকে বসিয়ে দেয়। কিন্তু পাগলের মত জীবন দিলেও সাদিয়ার কোন উপকার হবে না ভেবে দাঁড়িয়ে রইল সে। ওরা চলতে শুরু করল, আবু ইয়াকুবের চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা।

রাস্তা থেকে সরে এসে ক্ষেতের আল ধরে ও তাদের অনুসরণ করতে লাগল। ওরা যখন কেল্লার পথ ধরল থেমে গেল ইয়াকুব। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও তাকিয়ে রইল কেল্লার দিকে। কাফেলা কেল্লার প্রবেশ করতেই ও দৌড়ে গিয়ে মাসয়াবকে সংবাদ দেয়ার জন্য ছুটতে লাগল গাঁয়ের দিকে।

আচম্বিত পেছন থেকে ভেসে এল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। পিছন ফিরে চাইল ও। হারেসের কেল্লার দিক থেকে পনর বিশজন অশ্বারোহী দ্রুত এগিয়ে আসছে। মাসয়াবের কেল্লার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

আবু ইয়াকুব খানিকক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ নতুন আশায় বুক বেঁধে গাঁয়ের দিকে ছুটল। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল ওর গতি।

ও ছুটছিল আর বলছিলঃ 'ইয়া আল্লাহ! ওকে সাহায্য করার শক্তি আমায় দাও। সাদিয়া এবং তার খালাম্মার ইজ্জত রক্ষার জন্য জীবন কোরবান করার শক্তি দাও আমাকে। দয়াবান খোদা, তুমি তো ক্ষমতাশালী। জালেমরা অসহায় মানুষের ইজ্জত বাঁচানোর সব কয়টা পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার মওলা! আবুল হাসান ফিরে আসবে মৃত্যুর সময়ও সাদিয়ার মনে এ আশা থাকবে। তুমি ইচ্ছে করলে তো মানুষের সব আশাই পূরণ করতে পার। প্রভু আমার! মেয়েটা তোমার কুদরতি সাহায্যের আশায় বেঁচেছিল। আমিও তোমার সে কুদরত দেখতে চাই প্রভু। ওর উপর অনুগ্রহ কর।'

ডন লুইয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল সাদিয়া। ওকে ঘিরে রেখেছে চার জন সশস্ত্র পাহারাদার। হারেস এবং দু'জন সেনা অফিসার ডানে বায়ে বসা। দরজায় বল্লম হাতে দু'জন সৈনিক।

ডন লুই সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'কেমন কাকতালীয় ব্যাপার। তোমার স্বামীকেও এ কক্ষেই আমার সামনে হাজির করা হয়েছিল।'

এরপর সে হারেসের দিকে ফিরে বললঃ 'হারেস, তুমি একে মাসয়াব ও তার স্ত্রীর কথা বলেছ?'

ঃ 'জ্বী, সব বলেছি। আরো বলেছি আপনার সামনে মিথ্যে বললে কোন লাভ হবে না।'

ডন লুই আবার সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আমার সামনে সত্য কথা বলেছিল বলেই আবুল হাসান বেঁচে গিয়েছিল। আমি এক বাহাদুরের মৃত্যু চাইনি। তোমার মৃত্যুও আমার কাম্য নয়। তুমি শুধু বাহাদুরই নও, রূপসীও। অবশ্যই তোমার বেঁচে থাকা উচিত। যদি বল এ এলাকায় আবুল

হাসানের বন্ধু কে, ওরা কোথায় থাকে, তবে তোমার জীবন বাঁচানোর জিম্মা আমি নিচ্ছি।

তোমার স্বামীর জীবন বাঁচানো সম্ভব নয়। তবে আমার সাথে সহযোগিতা করলে, কথা দিচ্ছি, তোমাকে নতুন পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেব। ওখানে সংগী হিসেবে এমন কাউকে নিশ্চয় খুঁজে পাবে, যার সঙ্গে থাকলে আবুল হাসানের কথা ভুলে যাবে। মাসয়াব এবং তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর এখানে তোমার আপন বলতে কেউ নেই।

অপরাধীদের গ্রেফতার করার কাজে আমাদের সহযোগিতা না করলে তোমাকে দমন সংস্থার হতে তুলে দেয়া হবে। তোমার স্বামী পালিয়ে গিয়ে আবার স্পেনে ফিরে আসবে এমনটি মনে হয় না। আর যদি ও আলফাজরা চলেই আসে, দমন সংস্থার যন্ত্রণা কক্ষে তার সাথে তোমার দেখা হবে না।

আমার এক চাকর কয়েকদিন দমন সংস্থার যন্ত্রণা কক্ষে কাজ করেছে। তোমাকে কিছুক্ষণ ওর হাতে তুলে দেব। যন্ত্রণা কক্ষ কি জিনিষ তখন বুঝতে পারবে। মাসয়াব এবং তার স্ত্রীকে জীবিত পেলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে। নইলে মুহূর্তের মধ্যে অনেক গোপন তথ্য বের করা যেত। এতক্ষণে কয়েক হাজার মানুষ থাকত আমাদের হাতে বন্দী।

তুমি জান, এখন কোন মুসলমানকে বন্দী বা হত্যা করতে হলে অপরাধ প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সে মুসলমান এ কথা বললেই রাষ্ট্র অথবা গীর্জার পক্ষ থেকে যে কোন পদক্ষেপ নেয়া যায়। কিন্তু আমার চাকর বাকরদের মুক্ত করে দেয়ার অপরাধকারীদের সাথে কোন নিরপরাধী গ্রেফতার হোক, তা আমি চাই না।

যদি বাঁচতে চাও এবং ভবিষ্যত জীবনে শান্তি চাও, তবে খৃস্টান হয়ে যাও। রাষ্ট্র এবং গীর্জার বিরুদ্ধে প্রতিটি ষড়যন্ত্রের গোপনীয়তা প্রকাশ কর। বেঁচে যাবে গোলামীর জীবন থেকে। ভাল এক যুবকের সাথে তোমার বিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করব।'

ক্রোধে কাঁপছিল সাদিয়া। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রেখেছিল ও। ডন লুই তার দিকে না তাকিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল।

ঃ 'হারেস মেয়েটাকে বুঝাও।' হারেসের দিকে ফিরে বলল ডন লুই।

হারেস বললঃ 'সাদিয়া, মাসয়াব এবং তোমার খালার মৃত্যুতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নিজের ভুলেই ওরা মারা পড়েছে। সিপাইরা বাড়ীতে তল্লাশী নিতে গিয়েছিল। চাকর-বাকররা বাঁধা দিলে আমাদের তিনজন

লোক নিহত হয়, আহত হয়েছে পাঁচজন। মাসয়াবের স্ত্রী গুলী করে মেরেছে একজনকে। এ দুঃসাহসের পরিণামে সে বাড়ী এবং গোটা গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে।'

ডন লুই আবার বললঃ 'এ মেয়েটার উচিৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। লড়াইয়ের সময় ও বাড়ীতে থাকলে সেপাইরা ওকে শুধু আহত বা গ্রেফতারই করত না.......'

সাদিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বললঃ 'আমার খালাম্মা এবং খালুজান গোলামী আর জিল্লতির জীবনের চাইতে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে আমি খোদার শোকর আদায় করছি। আমরা পরাজিত হয়েছি বলে গর্ব করো না। তোমরা বিজয়ী হওনি। আমাদের জাতীয় প্রাচীরের গায়ে যেসব গাদ্দাররা বছরের পর বছর ধরে ছিদ্র করছে, এ পরাজয় তাদের ধারাবাহিক চেষ্টার ফল। আবুল কাসেম এবং আবু আবদুল্লাহর মত বেঈমানরা তোমাদের জন্য গ্রানাডার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। জাতীয় গাদ্দারদের দীর্ঘ বেঈমানীর ফলে আমাদের সালতানাত ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমাদের জীবন এখন মূল্যহীন, একথা বলে দেয়ার দরকার নেই। আমি জানি, যে স্পেনের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে আমাদের শান-শওকত মিশে আছে, তা আজ এক জঙ্গল বৈ নয়। এ জংগলে একটা পশুর মতও আমাদের বাঁচতে দেয়া হবে না। আমি তোমাদের নির্যাতনকে ভয় করি না। মরব বলে আমার কোন দুঃখও নেই।

কিন্তু হায়! আমাদের রক্ত আর অশ্রুর নদী, আর পুড়ে যাওয়া ওই গ্রামের ছাইয়ে যদি অতীত গাদ্দারদের পাপের প্রায়শ্চিত্য শেষ হতো!'

ডন লুই বললঃ 'কিন্তু আমরা তোমায় জীবিত রাখব। সে জীবনে প্রতি মুহূর্তে তুমি মৃত্যু কামনা করবে। আমার বিশ্বাস, দ্বিতীয়বার তোমাকে আমার সামনে আনা হলে তোমার এ চিন্তাধারা বদলে যাবে। দমন সংস্থার হাতে তুলে দেয়ার আগে তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি কি আবুল হাসানের জন্য বেঁচে থাকতে চাও? ও আমার সামনে এসে অপরাধ স্বীকার করলে দু'জনকেই ক্ষমা করে নতুন পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেব। স্পেনে আমাদের চাকর বাকরের অভাব পড়ে গেছে এমন তো নয়। তোমার মত এক সুন্দরী যুবতীকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, ভাবতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ঃ 'ডন লুই! আমি আর আমার স্বামীকে তোমার গোলামদের তালিকায়

দেখবে না। আগুনের শিখায় তোমার পাদ্রীও আমার চিৎকার শুনবে না।'

সাদিয়া এবার উচ্চ কণ্ঠে বললঃ 'শোন ডন লুই, তোমার ধমক অথবা মৃত্যু ভয় খোদার উপর আমার আস্থা নষ্ট করতে পারবে না। আবুল হাসান এখন মুক্ত, তুমি আমার হৃদয়ের এ প্রশান্তি তো ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

ডন লুই গভীর দৃষ্টিতে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। নতুন আশার ঝিলিক দেখতে পেল তার চোখে মুখে।

ঃ 'একে নিয়ে যাও।' ডন লুই বলল।

পাহারাদার সাদিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ডন লুই হারেসকে বললঃ 'তোমার লোকদেরকে মেয়েটার কাছে থেকে সাবধানে রেখো। আলফাজরার সব এলাকায় এখনো বিদ্রোহ দেখা দেয়নি, কিন্তু এ মেয়ে এমন মারাত্মক যে, আমার আশংকা হয়, লোকজন একে গ্রেফতার করায় ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে না বসে।'

ঃ 'এ এলাকায় কেউ আর মাথা তুলবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ঃ 'বেকুব, তোমাদের অসতর্কতায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠুক তা আমি চাইনা। যারা মৃত্যুকে পরোয়া করেনা আমি তাদের ভীষণ ভয় করি।'

ঃ 'ও ভেবেছে, আপনি ওর রূপে মজে যাবেন, কিছু বলবেন না ওকে। নয়তো ও এত কোমল যে, সামান্য কষ্টও সইতে পারবে না।'

ঃ 'কোন ঝামেলা ছাড়া মেয়েটাকে ধরতে পারবে জানলে এখানে আসতে সিপাহসালারের সাহায্য নিতাম না। ওদের কেল্লার মালিক এখন রাষ্ট্র। যেসব সেপাই তাতে আগুন দিয়েছে ওদের আমি কঠিন শাস্তি দিব।'

হারেস বললঃ 'সাধারণ মানুষের সামনে ওদের শাস্তি দিলে ভালই হবে। মানুষকে শান্ত করার জন্য আমি কয়েকজন প্রভাবশালী লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি, যাদের বাড়ী ঘর পুড়ে গেছে তাদের যেন বলে, এসব মাসয়াবের জন্যই হয়েছে। আমাদের সৈন্যদের শাস্তি দিলে জনগণ আমাদেরকে তাদের বন্ধু ভাববে। আমরাও ওদের বলতে পারব, সরকার মুসলমানদের কল্যাণকামী। কোন অহেতুক হাঙ্গামা এবং আহাম্মকী সরকার বরদাশ্‌ত করবে না।'

ঃ 'ওরা এ কেল্লায় তো আবার আক্রমণ করে বসবে না?'

ঃ 'বিদ্রোহের আগুন যখন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখনও এ কেল্লা ছিল নিরাপদ। এখানে সিপাই নিয়ে আসার দরকার ছিল না। এখানে প্রতিরোধ করার মত যারা ছিল, তারা সবাই আফ্রিকা চলে গেছে। বাকীরা

বেঁচে থাকতে চায়। স্থানীয় লোকেরা বিদ্রোহ করবে সে আশংকা থাকলে তা নিভিয়ে দিতে পারি। কিন্তু.........'

ঃ 'কিন্তু কি?'

ঃ 'এ মেয়েটাকে এলাকার সবাই দারুণ সম্মান করে। বিয়ের রাতে ওর স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এ খবর ছড়িয়েছে দূর দূরান্ত পর্যন্ত। এর জন্য লোকেরা বিক্ষোভ করবে তা নয়। আপনার উপস্থিতিতে বিক্ষোভ করার প্রশ্নই আসে না। আমাকে তো পরেও এখানে থাকতে হবে। এ জন্য এখানে ওর সাথে যেন কঠোর ব্যবহার না করা হয়। আমার ধারণা, নরম করে বুঝালে ও বুঝবে। অসহায়, নিরাশ্রয় একটা মেয়ে দীর্ঘক্ষণ নিজের জিদে অটল থাকতে পারে না। আমার স্ত্রী এবং মেয়েকেও বলব ওকে বুঝাতে।'

ঃ 'বলছ ওর কোন আশ্রয় নেই, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন আবুল হাসান এখন মুক্ত। এ জায়গাটা সাগর থেকে অনেক দূরে বলে সাথে সৈন্য বেশী আনিনি। তা না হলে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারতাম না। আর শোন, ওকে অন্ধকার কুঠুরীতে রাখার দরকার নেই। কোন কক্ষে বন্দী করে রাখ। ওকে বলবে, ওর আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আমি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছি। তোমার স্ত্রী এবং মেয়েকে বল, ওকে খৃস্টান হওয়ার উপকারিতা বুঝাতে। আমি নিজেও আরেকবার ওর সাথে নিরিবিলি আলাপ করব।'

স্বপ্নের রাজকুমার

রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে। মাসয়াবের বাড়ী জ্বলছে এখনো। থেকে থেকে লকলকিয়ে উঠছে অগ্নিশিখা। কেল্লার আশপাশের কয়েকটা গ্রামেও আগুন জ্বলছে। আবুল হাসানের হৃদপিণ্ডে দুশ্চিন্তার কাটা বিদ্ধ হয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে আঙ্গিনায় উঠে এল ও। দশ পনরটি লাশ এখানে ওখানে পড়ে আছে। হত্যাকারীরা বিকৃত করে দিয়েছে লাশের চেহারা। লাশ পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে কেল্লার বিভিন্ন কক্ষ থেকে। অন্তহীন বেদনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আবুল হাসান কয়েক মুহূর্ত। এরপর চিৎকার করে ডাকলঃ 'সাদিয়া! সাদিয়া! সাদিয়া!'

যে সাহসের জোরে বছরের পর বছর গোলামী আর জেলের কষ্ট সয়েছিল ও, সহসা তা নিঃশেষ হয়ে গেল। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল আবুল হাসান।

ঃ 'প্রভু!' বলল ও, 'মৃত্যুর পূর্বে সাদিয়ার সংবাদ জানতে চাই। ও যদি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকে, ধৈর্য ধরার শক্তি দাও। যদি বেঁচে থাকে, থাকে খ্রীষ্টানদের কয়েদখানায়, সে জেলের দরোজা ভেংগে তাকে মুক্ত করার শক্তি দাও আমায়। ওর ওপর যারা জুলুম করেছে, তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার শক্তি দাও।'

আবারও নিজের মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলঃ 'না, না, এ অগ্নিশিখা আল্লাহর রহমত থেকে আমাকে নিরাশ করতে পারবে না। বন্দী দশা থেকে যিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, তিনি তোমায়ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেন সাদিয়া! আমি হাসান। আমি এসেছি সাদিয়া।'

ওর নিজের কণ্ঠ নিজের কাছে অপরিচিত মনে হতে লাগল।

বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। এক অশ্বারোহী আঙ্গিনায় উঠে এল। ঘর পোড়া আগুনের উজ্জ্বল আলোয় আবুল হাসানকে দেখা যাচ্ছে। অশ্বারোহী ঘোড়াসহ এগিয়ে তার কাছে এসে থামল। প্রতিরোধ শক্তি জেগে উঠল আবুল হাসানের। এক ঝটকায় খাপ থেকে টেনে নিল তরবারী। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল অশ্বারোহী। চিৎকার দিয়ে বললঃ 'হাসান, আমি আবু ইয়াকুব।'

ইয়াকুব দ্রুত ছুটে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল। শিশুর মত কাঁদছিল আবু ইয়াকুব। ঃ 'হাসান! সাদিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তুমি আসবে। এ বিশ্বাস নিয়েই ও আমেরের বাড়ী গিয়েছিল।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে বল ও কি বেঁচে আছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, ও বেঁচে আছে।'

ঃ 'কোথায় ও?'

ঃ 'হারেসের কেল্লায়। হারেস আবু আমেরের বাড়ী থেকে ওকে গ্রেফতার করেছে। আমি নিজের চোখে তাকে কেল্লায় ঢুকতে দেখেছি।'

ঃ 'ও আবু আমেরের বাড়ী গিয়েছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ, হারেস এক মহিলার মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিল, আবু আমের বাড়ী ফিরেছে। ওকে কি একটা সুসংবাদ দিতে চায়। আপনি ওখানে আছেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই ও সেখানে গিয়েছিল।'

ঃ 'সাদিয়ার খালা এবং খালুও কি বন্দী?'

ঃ 'ওরা দু'জন শহীদ হয়েছেন। যে কয়জন চাকর পালিয়ে গিয়েছিল ওরা বলেছে, তাদের হত্যা করে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। শত চেষ্টা করলেও আমি সময় মত এখানে পৌঁছতে পারতাম না। জীবন দিতে পারতাম, কোন উপকার হত না ওদের। গ্রামের মানুষকে সাদিয়ার গ্রেফতার হবার সংবাদ দেয়াটাই ভাল মনে করেছি। ফল হয়েছে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা গ্রামের মানুষদের জড়ো করছেন। এর মধ্যে স্থানীয় তিনজন সর্দারের ছেলেও আছেন। হারেসের কয়েকজন লোক মানুষকে শান্ত করার জন্য বেরিয়েছিল। গ্রামের লোকের মার খেয়ে ওরা পালিয়ে গেছে। নিহত হয়েছে দুই গাদ্দার। লোকজন কেল্লার পাশে পাহাড়ের কাছে জমায়েত হচ্ছে। কিন্তু কখন কিভাবে হামলা করা হবে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এ মুহূর্তে ওদের একজন নেতা প্রয়োজন। এ গ্রামের লোকেরা ভয়ে এখানে ওখানে লুকিয়ে আছে। আমি ওদের ডেকে নেবার জন্যই এদিকে এসেছিলাম। আমার মন বলছিল, আপনি এসেছেন। সাদিয়ার স্বপ্ন মিথ্যে হতে পারে না। একটু আগেও এখানে আরেকবার ঘুরে গেছি।'

ঃ 'হাসান!' কেল্লার ফটক থেকে ডাকল কেউ।

ঃ 'ওসমান, আমি এখানে।'

ওসমান এগিয়ে এসে বললঃ 'কি করছেন এখানে! আপনার দেরী দেখে আমরা সবাই পেরেশান হয়ে পড়েছি। ওর কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, সাদিয়া অন্য একটি কেল্লায় বন্দিনী। ইনশাল্লাহ সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমাদের অভিযান শেষ হবে। আমরা অনেক দেরীতে এসেছি ওসমান। মাসয়াব এবং তার স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। ছড়ানো লাশ দেখেই ওদের পাশবিকতার অনুমান করতে পারছ।'

ঃ 'কেল্লা আক্রমণের পূর্বে বাইরের সেপাইদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।' বলল আবু ইয়াকুব। আবুল হাসান বললঃ 'কিন্তু আমরা শুনেছি এখানে এখনো কোন ফৌজ আসেনি?'

ঃ 'আমি আজই কেল্লার বাইরে ওদের তাবু দেখলাম। সম্ভবতঃ গত রাতে কোন এক সময় এসেছে।'

ঃ 'ওরা সংখ্যায় কত হবে?'

ঃ 'এই শ'খানেক হবে। বাইরে বাঁধা ঘোড়ার সংখ্যাও বিশ কি পঁচিশ।'

ঃ 'কেল্লার ভেতরে?'

ঃ 'হারেসের পঞ্চাশ জন চাকর-বাকরের মধ্যে অর্ধেক অশ্বারোহী। বাকীরা কাজের লোক। ওদেরও কেউ কেউ সশস্ত্র। আক্রমণ করতে হলে দু' জায়গায় এক সংগে করতে হবে। তা নয়তো কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েক হাজার সিপাই ওদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।'

ঃ 'এলাকার লোকজন যেখানে জমা হয়েছে ওখানে চল। এর পর কি করতে হবে আমি দেখব। ইনশাল্লাহ এ রাত হবে হারেসের শেষ রাত। আমাদের সাথে এমন চল্লিশ জন লোক রয়েছে, বছরের পর বছর ধরে যাদের বুকে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। এদের মধ্যে ডন লুই নতুন পৃথিবীতে পাঠাচ্ছিল এমন সব চাকর-বাকরও রয়েছে। রয়েছে মরিসকো মুসলমান, যাদের পূর্বপুরুষ গীর্জার নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। দুশমনের সাথে লড়াই করার সময় আত্মহত্যা করছে এমনটি ওদের মনে হবে না। একাকীত্বের অনুভূতি থাকবে না ওদের। লড়াই শেষ হলে আমরা সাগরের পারে চলে যাব। ওখানে জাহাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এলাকার লোকদের বলতে চাই, তোমরা যদি যেতে চাও, শেষ লোকটি না যাওয়া পর্যন্ত জাহাজের পাল তোলা হবে না। সাগর পার পর্যন্ত নিরাপত্তার জন্য বিভিন্নস্থানে আমাদের সশস্ত্র লোকজন রয়েছে।'

আবু ইয়াকুবের চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল। বললঃ 'এমন হলে এখানকার লোকজন আপনার ইশারায় জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে। চলুন।'

হারেস ডন লুইয়ের কক্ষে প্রবেশ করল। ঘুম জড়ানো চোখ। ডন লুইয়ের সামনের টেবিলে মদের সোরাহী। পাশে শূন্য গ্লাস। আরেকটি ভরা গ্লাস তার ঠোঁটে ছোয়ানো।

ঃ 'জনাব, আপনি আমায় স্মরণ করেছেন?'

ডন লুই খালি গ্লাসে মদ ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললঃ 'নাও, এখানে বসে নিশ্চিন্তে পান কর।'

ঃ 'জনাব, এত বড় অপরাধ করতে পারি না।'

ঃ 'অপরাধ? আমার সাথে মদ পান করবে, এ তো বন্ধুর অধিকার।'

ঃ 'এ সম্মানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু দু'এক ঢোকের বেশী নেব না। সন্ধ্যার সময় অনেক খেয়েছি।'

ঃ 'এক গ্লাসে কিছু হবে না, বসো।'

হারেস আদবের সাথে বসে গ্লাস ঠোঁটে ছোয়াল। ডন লুই গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'হারেস, তোমাকে যে কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য আমি এখানে এসেছি তা কি জান?' বলল সে, 'কিন্তু তুমি যেমন সতর্ক তেমনি ভাগ্যবান। মেয়েটা আবু আমেরের ঘরে গিয়ে নিজেই অপরাধ স্বীকার না করলে তোমার ব্যাপারে আমার সন্দেহ দূর হত না। এতোক্ষণে কেল্লার সামনে কোন গাছে ঝুলানো থাকত তোমার লাশ।'

হারেস কাঁপা হাতে গ্লাস টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললঃ 'জনাব, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গিয়েছিল। তা না হলে আপনার সন্দেহ দূর করতে পারতাম না।'

ঃ 'বাইরের কোন সংবাদ পেয়েছ?'

ঃ 'বাইরের পরিস্থিতি একেবারে শান্ত। নইলে আমি কি শুতে পারি?'

ঃ 'মাসয়াব এবং তার স্ত্রীকে হত্যা করা হল, তার ঘরবাড়ী সব জ্বালিয়ে দেয়া হল, অথচ কেউ টু শব্দটি করল না!'

ঃ 'এ এলাকার মানুষ যে শান্তি প্রিয় এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। যখন বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, তখনো আমি এ এলাকা নিয়ে শংকিত হইনি।'

ঃ 'আমি শুতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অতীত ঘটনাবলী আমার আত্মবিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবুল হাসানের কারণেই আমার কেল্লা আক্রান্ত হয়েছিল। এখন ভাবছি, ওর স্ত্রী আমার কয়েদী। পার্থক্য, আমরা এখন সাগর থেকে দূরে। তুর্কী জাহাজ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এরপরও মনে হয়, এখানে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব না।

এ এলাকা যে শান্তিপ্রিয়, সিপাহসালারও তা বলেছেন। এ জন্য আমাকে সৈন্য নিয়ে এখানে আসতে দিতে চাননি। তার ধারণা ছিল, লোকজন হয়ত উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। উত্তেজিত হওয়ার ঘটনাও তো ঘটেছিল। আমি কালই এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

ঃ 'আবুল কাসেমের সাথে কারো আন্তরিকতা থাকলে এদ্দিনে আমার ওপর কয়েকবার আক্রমণ হত। তবুও আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না।'

ঃ 'স্বেচ্ছায় আমার সাথে যাবার জন্য আমি মেয়েটাকে রাজী করাতে চাই। গীর্জার হাতে পড়লে আমরা ওর কোন সাহায্য করতে পারব না। তোমার স্ত্রী এবং মেয়ে নিশ্চয়ই ওকে বুঝিয়েছে?'

ঃ 'ওরা অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওকে সোজা পথে আনতে আরো কিছু সময় লাগবে।'

ঃ 'ওকে এখানে পাঠিয়ে দাও, দেখি আমি সোজা করতে পারি কিনা।'

ঃ 'এখন?'

ঃ 'হ্যাঁ, এখন।'

ঃ 'জোর না করে ওকে আনা যাবে না।'

ঃ 'তোমার লোকেরা এত ভীতু হলে বাইরে থেকে সৈন্য ডেকে আনো!'

ঃ 'না জনাব, আমি নিজেই ওকে ধরে নিয়ে আসছি।'

হারেস বেরিয়ে গেল। একটু পর ডন লুইয়ের কক্ষে প্রবেশ করল সাদিয়া। তার ডানে বাঁয়ে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী, পেছনে হারেস। সাদিয়া ঘাড় ফিরিয়ে বললঃ 'হারেস! আমার শূন্য হাত। অথচ কি কাপুরুষ তুমি! তলোয়ারের পাহারায়ও নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পার না!'

ঃ 'হারেস! চাকরদের বিদেয় কর।' ডন লুই বলল, 'এদিকে কাউকে আসতে দেবে না। দরজা জানালা সব বন্ধ করে তুমিও চলে যাও।'

সাদিয়ার চেহারায় অপার্থিব প্রশান্তি। ভয় বা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই ওখানে। ও অপলক তাকিয়ে রইল, উদ্বেগহীন। চোখে প্রচণ্ড ঘৃণা।

ডন লুই একটা চেয়ার দেখিয়ে বললঃ 'বস।'

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সাদিয়া। ডন লুই খানিকটা বিরতি দিয়ে বললঃ 'নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তোমাকে আমি কেল্লার বাইরে মদে মাতাল সেপাইদের হাতে তুলে দিতে পারি। নীচে শুয়ে আছে আমার প্রতিরক্ষা বাহিনী। জাগাতে পারি ওদেরও। অথবা তোমাকে দমন সংস্থার হাতেও তুলে দিতে পারি।'

ঃ 'জানি।' সাদিয়া বলল, 'তোমার কাছে ভাল কিছু আশাও করিনা.....।' সাদিয়া আরো কঠিন ভাষায় জবাব দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আবুল হাসান আসবে তাকে মুক্ত করার জন্য। এখানে আসতে তো কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এ আশায় ক্রোধ সংবরণ করে নিল ও।

ঃ 'বসো!' ডন লুইয়ের কণ্ঠে কঠিন স্বর। 'এক সুন্দর ফুলকে আমি মথিত করতে চাই না। তোমার সাথে নিশ্চিন্তে দু'টো কথা বলব।'

একটা চেয়ার টেনে বসল সাদিয়া। মদের শূন্য গ্লাস ভরল ডন লুই। কয়েক ঢোক পান করে বললঃ 'শেষমেষ তোমার বুদ্ধি এসেছে বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। শেষ বারের মত তোমায় বলতে চাই, তুমি অসহায়।

জীবনে একটু নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য হলেও আমার সাহায্যের প্রয়োজন, এত নিরূপায় তুমি। আমার বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যাবে কল্পনাও করো না।'

ঃ 'জানি! আল্লাহ ছাড়া এখানে আমার কোন সহায় নেই।'

আহত বাঘিনীর মত চারপাশ দেখছিল সাদিয়া। ডন লুইয়ের ঠোঁটে ভেসে উঠল এক টুকরো কুটিল হাসি। তাড়াতাড়ি উঠে দরজার হুক লাগিয়ে ফিরে এসে চেয়ারে বসে পা দুটো ছড়িয়ে দিল টেবিলের উপর। বললঃ 'আর কেউ বিরক্ত করবে না। এবার নিশ্চিন্তে কথা বলতে পার। তোমাকে ডেকেছি কেন, জানো? আমি তোমার জীবন বাঁচাতে পারি। তাও তোমার সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। তুমি কোন ঝামেলা করবে না কথা দিলে ভোরেই আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে যাব। কাউস এবং সেভিল থেকে নতুন পৃথিবীতে জাহাজ যাচ্ছে। তোমাকে ওই জাহাজে তুলে দেব। ওখানে বেশী দিন আমার অপেক্ষা করতে হবে না। হারেস নিশ্চয়ই তোমাকে আমার পরিচয় বলেছে। বলেছে, তোমাকে সুখী করার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। রাত কাটানোর জন্য এক সুন্দরী যুবতীর প্রয়োজন, এ জন্যে তোমাকে ডেকে আনিনি। আমি অনুভব করছি, সারা জীবন তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

সাদিয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ওর দৃষ্টি ছুটে গেল বিছানার পাশের দেয়ালে, যেখানে ঝুলছে দু'টি পিস্তল এবং একটি তরবারী। ডন লুই উঠে গিয়ে তার রেশম কোমল চুলে হাত বুলাতে বুলাতে ডাকলঃ 'সাদিয়া!'

সাদিয়া তড়াক করে দাঁড়িয়ে কামরার এক কোণে ছুটে গেল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ডন লুই। বললঃ 'আমার কোন তাড়া নেই। রাত অনেক দীর্ঘ। আমি অপেক্ষা করতে পারি। ভাবলাম, দীর্ঘ সফরের পর বিছানায় পিঠ দিলেই ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমি ঘুম বা ক্লান্তি কিছুই অনুভব করছি না। সাধারণ পোষাকেও তোমাকে শাহজাদীর মত মনে হচ্ছে। ওই লোকটা তোমার উপযুক্তই নয়।'

ঃ 'তবে কি বলতে চাও আমি তোমার দাসীবাদী!'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু এমন দাসী যার পদতলে আমার সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিতে পারি। এখন তুমি বুঝতে পারছ না, যেদিন দমন সংস্থার যন্ত্রণার কথা জানতে পারবে, সেদিন প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।'

ঃ 'সেদিন কখনো আসবে না। ডন লুই, আমার মন বলছে, তোমার চোখ আগামীকাল ভোরের আলো দেখার জন্য আর সজাগ হবে না।

কুদরতের অদৃশ্য শক্তি আমার সাহায্যে আসছে। মন দিয়ে শোন, যদি তুমি বধির না হয়ে থাক, কেল্লার বাইরের সেপাইদের ডাক চিৎকার শোন।'

ডন লুই ছুটে এসে তার বাহু খামচে ধরে বললঃ 'এখন এসব কথা অর্থহীন। ছাউনীর ডাক চিৎকার অথবা মাতালের মাতলামী আমাকে তোমার দিক থেকে মনযোগ ফেরাতে পারবে না।'

ঃ 'মরার আগে না মরে থাকলে কেল্লার ভেতরেও পাহারাদারদের চিৎকার শুনতে পাবে।'

ডন লুইয়ের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল। সাদিয়ার বাহুতে ধরা হাত শিথিল হল ঈষৎ। বাইরে থেকে কারো পদশব্দ ভেসে এল। দরজা ধাক্কানোর সাথে ভেসে এল হারেসের কণ্ঠঃ 'জনাব! দরজা খুলুন। লোকজন কেল্লা আক্রমণ করেছে।'

ডন লুই সাদিয়াকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিল। তরবারী কোষমুক্ত করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। সাদিয়া তাড়াতাড়ি উঠে দেয়ালে ঝুলানো পিস্তল তুলে নিয়ে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। পিস্তলসহ হাত রাখল পেছনে।

হারেস বললঃ 'জনাব, আমি ভেবেছিলাম ছাউনীতে সেপাইরা অযথা চিৎকার করছে। এখন কেল্লাও আক্রমণ করেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আক্রমণকারীরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

ঃ 'বেরুনোর দরজা কি নিরাপদ?' ডন লুইয়ের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঃ 'এখনো নিরাপদ। তবে যারা ছাউনীতে হামলা করেছে, দরজা কব্জা করতে ওদের সময় লাগবে না। স্থানীয় লোকেরা আমাকে মারবে না। আমি শুধু আপনার জন্য ভাবছি। আপনার এক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া উচিত। আপনার জন্য পেছনের ছোট্ট দরজা খুলে দেব?'

ঃ 'মেয়েটাও আমার সাথে যাচ্ছে। রক্ষীদেরকে গোপন পথে ঘোড়া তৈরী রাখতে বল।'

ঃ 'ওরা আস্তাবলের নিচের অংশ কব্জা করে নিয়েছে। আপনার রক্ষীরা তো আস্তাবলের পাশের কক্ষে থাকে। আমার মনে হয়, এ পরিস্থিতিতে সাদিয়াকে জোর করে নিতে পারবেন না। আপনাকে হয়ত পায়ে হেঁটেই পালাতে হবে।'

ঃ 'এই কথা! তবে আক্রমণকারীরা এর লাশই শুধু দেখবে। ও যে হাসানের স্ত্রী ওকে বাঁচানোর জন্য এ কথাও আমি ভুলে যেতে প্রস্তুত

ছিলাম। কিন্তু আবুল হাসান এসে স্ত্রীকে জীবিত দেখবে এ আমি বরদাশত করব না। ও এলে বলো, ডন লুই নিজের হাতে তোমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।'

ডন লুই ঘুরে কক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির মুখোমুখী হল। দু'হাতে পিস্তল ধরে ডন লুইয়ের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে সাদিয়া। হতচকিত ডন লুই চিৎকার দিয়ে বললঃ 'থামো। ঈশ্বরের কসম...... মা মেরীর কসম....'

পিস্তলের নল থেকে আগুন ঝরল। গুলির শব্দের সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ল ডন লুই। সাদিয়া দ্রুত অন্য পিস্তল হাতে নিয়ে চিৎকার করে বললঃ 'হারেস, লুই মরেছে। এবার আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

হারেস এবং তার তিনজন সঙ্গী নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ি থেকে ভেসে এল আবুল হাসানের কণ্ঠঃ 'সাদিয়া, সাদিয়া! আমি হাসান, আমি এসেছি সাদিয়া।'

মুহূর্তের মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি উপরে উঠে এল। দু'জনের হাতে মশাল। হারেস এবং তার সঙ্গীরা প্রতিরোধ না করে তলোয়ার ফেলে দিল।

ঃ 'সাদিয়া! সাদিয়া!' আবুল হাসান শব্দ করে ডাকতে লাগল।

ঃ 'হাসান। সাদিয়া কক্ষের ভেতরে। ও সুস্থ আছে।' কাঁপা কণ্ঠে বলল হারেস।

ঃ 'এদের কেউ যেন পালাতে না পারে।' বলেই কক্ষে ঢুকে পড়ল আবুল হাসান। সাদিয়া সিজদায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আবুল হাসান নুয়ে তার পিঠে হাত রেখে বললঃ 'সাদিয়া! তুমি সুস্থ? সাদিয়া তুমি কি আহত!'

মাথা তুলল সাদিয়া। ওর দু'চোখ অশ্রু ভেজা, ঠোঁটে অনাবিল মুচকি হাসির অফুরন্ত ঢেউ।

ঃ 'হাসান! এ হচ্ছে ডন লুই।'

নিচে পড়ে থাকা লাশের দিকে ইশারা করে বলল সাদিয়া।

ঃ 'আমি গুলির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

ঃ 'আমিই গুলি চালিয়েছি। তোমার আরো এক দুশমন এখনো বেঁচে আছে।'

ঃ 'আমি নিজের হাতে ওকে হত্যা করব।'

আবুল হাসান বেরিয়ে এল। হারেসের দিকে তরবারী তুলে বললঃ

'হারেস, এ ছিল পৃথিবীতে তোমার শেষ অপকর্ম। এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। ভীরু, কাপুরুষ! তরবারী হাতে নাও।'

হারেস তার পায়ে ঝাপিয়ে পড়ল।

ঃ 'আমায় ক্ষমা করে দাও আবুল হাসান।'

আবুল হাসান পেছনে সরে এসে বললঃ 'তুমি যেমন ভীরু তেমনি ধূর্ত।'

সাদিয়া ছুটে এসে আবুল হাসানের বাহু ধরে বললঃ 'ওকে ছেড়ে দাও। স্ত্রী সন্তানের জন্য বেঁচে থাকতে দাও ওকে। ও ছিল এক বিজয়ী জাতির গোলাম। ওর স্থানে অন্য কেউ হলেও সম্ভবতঃ এমনই করত। আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের হাত থেকে স্বাধীনতার হেফাজত করতে পারেনি, তাদের আমরা মানবতা শিখাতে পারি না। ওকে ছেড়ে দাও হাসান, যারা নিজের হাতেই নিজের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য চিতার আগুন জ্বেলেছে, তাদের রক্তে আমরা আমাদের আঁচল দুষিত করতে চাই না।'

ঃ 'ওসমান, ওবায়েদ, তোমরা কি বল?' সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল আবুল হাসান।

ঃ 'আমাদের বোন ঠিকই বলেছেন। কারো গোটা শরীর বিষাক্ত হয়ে পড়লে একটা অংগ কেটে কি লাভ? ক'জন বা হাজার জনকে মেরে ফেললে যদি জাতির মাথার ওপর থেকে বিপদের ঘনঘটা সরে যেত, তবে এ বাড়ির ছেলেবুড়ো সবাইকে হত্যা করতাম। এ অভিশপ্ত জাতির জন্য প্রায়শ্চিত্যের সকল দুয়ার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এদের শাস্তির জন্য কুদরত জেমসের মত রক্ত পিপাসুকে নির্বাচন করেছে। ওরা এমন শাস্তি দেবে যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না।'

ওসমান বললঃ 'এখানে আমাদের কাজ শেষ। এখন দেরী করা ঠিক হবে না। আমার তো মনে হয় হাজার হাজার লোককে আমাদের সাথে নিতে হবে।'

সিঁড়ি ভেংগে উঠে এল ডন কারলু। পেছনে পাঁচ ছ'জন স্থানীয় এবং তিনজন মরিসকো মুসলমান।

এক যুবক বললঃ 'দশ-পনর জন খ্রীষ্টান বেঁচে গেলেও আমরা ছাউনী দখল করে নিয়েছি। আক্রমণের সময় কয়েকজন এদিক ওদিক পালিয়ে গেছে। আমাদের সংগীরা তাদের খুঁজছে। আশা করি একজনও বাঁচতে পারবে না। লোকজন সকল বন্দীদের হত্যা করতে চাইছিল, কিন্তু আপনার

সংগীরা তা করতে দেয়নি।'

ডন কারলু বললঃ 'আমরা ভেবেছি আপনি বন্দীদের হত্যা করতে চাইবেন না।'

ঃ 'আমরা ওদের সাথে নিয়ে যাব।'

স্থানীয় যুবকটি বললঃ 'আপনার পরামর্শ অনুযায়ী দু'চারটা ছাড়া সবগুলো ঘোড়াই আমরা কব্জা করেছি।'

ঃ 'যারা আমাদের সাথে যেতে চায় ওদের কেল্লার ফটকে জমা হতে বল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রওনা করব। যারা এখানে থাকবে ওরা যেন আমাদের শহীদ ভাইদের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে।'

সাদিয়া আবুল হাসানের বাহু ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললঃ 'আবু ইয়াকুবকে দেখছি না কেন? কেল্লা আক্রমণ হবে অথচ ও থাকবে না, এমন তো হতেই পারে না।'

ঃ 'সাদিয়া, ও শহীদ হয়ে গেছে। তোমার গ্রেফতারীর পর ও-ই এলাকার লোকজন জড়ো করেছিল। ওর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল তোমাদের জ্বলন্ত বাড়ীতে। ওর কাছেই শুনেছি তোমার খালা আর খালুর বেদনাদায়ক মৃত্যুর সংবাদ। এখানে এসে প্রথমে আমি, ওসমান, আবু ইয়াকুব এবং আরো একজন দেয়াল ভেংগে ভেতরে প্রবেশ করি। দরজায় ছিল চারজন খ্রীষ্টান। কারো অপেক্ষা না করেই ও এমন আক্রমণ করে বসল যে, ওর প্রথম আঘাতেই খতম হল এক দুশমন। দ্বিতীয় জনকে আক্রমণ করল দ্রুত। লোকটি পেছনে সরতে গিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি পেছন থেকে আক্রমণ করল ওকে। বল্লমের আঘাতে এফোড় ওফোড় হয়ে গেল ওর দেহ।

আক্রমণ করার সময় ও এত ভয়ংকর শব্দ করেছিল, যা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল পাহারাদাররা। বাকী তিনজন খ্রীষ্টানকে শেষ করে হারেসের চাকরদেরকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাবু করে ফেলি আমরা। আমাদের এত তাড়াতাড়ি সফল হওয়ার কারণ হল, পাহারাদাররা অনেকেই তোমাকে পছন্দ করে। ওদের কথায় অন্যরা হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছিল। আটজন খ্রীষ্টান এক কক্ষে শুয়েছিল। যে ব্যক্তি বাইরে থেকে শিকল টেনে সে কক্ষের দরজা বন্ধ করেছে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

ওসমান বললঃ 'আমার মনে হয় এখন সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। পথে আমাদের সংগীরা নিশ্চয় খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে।'

ঃ 'নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের ঘোড়ায় তুলে দাও। অতিরিক্ত ঘোড়া পথে কাজে আসবে। বন্দীদের হাত বেঁধে এক্ষুণি রওয়ানা করিয়ে দাও।'

খানিক পর। হাসানদের কাফেলা দক্ষিণের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে খ্রীষ্টানদের সেনা ক্যাম্প। পরের সন্ধ্যায় ক্যাম্পে প্রবেশ করল একজন সৈনিক। ক্লান্ত শ্রান্ত। পরণে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের পরিবর্তে কৃষকের পোষাক। পাহারাদার তার কথা শুনে কর্তব্যরত অফিসারের সামনে নিয়ে গেল। কর্তব্যরত অফিসারের ডানে বাঁয়ে আরো কয়েকজন ফৌজি অফিসার বসেছিল।

ঃ 'ডন লুইয়ের সাথে যারা গিয়েছিল তুমি তাদের সাথে ছিলে?' অফিসার প্রশ্ন করল।

ঃ 'জী।'

ঃ 'ডন লুইকে ছেড়ে এখানে এসেছ কেন?'

ঃ 'আমি তাকে ছেড়ে আসিনি। তিনি কেল্লায় বিশ্রাম করছিলেন। আমাদের ক্যাম্প ছিল কেল্লার বাইরে। রাতে স্থানীয় লোকেরা ক্যাম্প আক্রমণ করে। আমাদের সকল সংগী নিহত হয়েছে, এ সংবাদ আপনাকে দেয়া জরুরী মনে করে আমি এখানে ছুটে এসেছি।'

ঃ 'তুমি বাঁচলে কিভাবে?'

ঃ 'আমি কৃষকের পোষাক পরে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। সুযোগ বুঝে পালিয়েছিলাম পাহাড়ের দিকে।'

ঃ 'তুমি পায়ে হেঁটেই এদ্দুর এসেছ?'

ঃ 'এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আক্রমণকারীরা আমাদের ঘোড়াগুলোও নিয়ে গেছে।'

ঃ 'ডন লুই কি কেল্লায় অবরুদ্ধ?'

ঃ 'না, কেল্লাও ওরা দখল করে নিয়েছে। আমরা কেল্লার ভেতরে থাকলে হয়ত এ অবস্থা হত না। ডন লুই দশ বারজন সৈনিক নিয়ে ভেতরে ছিলেন। হামলাকারীরা এখন সাগরের দিকে যাচ্ছে। স্থানীয় অনেক লোক আছে ওদের সাথে।'

কর্তব্যরত অফিসার অন্যান্য অফিসারদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'এ বেকুবের ধারণা, এখন আমি ওদের ধাওয়া করি।'

সেপাইটি বিনম্র কণ্ঠে বললঃ 'জনাব, আমি তা বলিনি, বলতে চাইছি

ওরা সংখ্যায় অনেক। সাগর পাড়ি দিতে জাহাজের প্রয়োজন হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিছু অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলে ওদেরকে পথেই আটকানো যাবে। তা না হলে সাগর পারে তো অবশ্যই পাকড়াও করা যাবে। আফ্রিকা থেকে জাহাজ আসতে তো কয়েকদিন লাগবে।'

ঃ 'গর্দভ! জাহাজ এখন সাগর পাড়েই আছে। ওরা আমাদের কিছু এলাকাও ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী ওদের ধাওয়া করতে পারলেও সাগর তীরে যেতে পারবে না। ডন লুই আমাকে বলেছিল, সে যাদের গ্রেফতার করতে চাইছে, ওদেরকে প্রকাশ্যে শাস্তি দিলেও কোন বাঁধা আসবে না। হঠাৎ ডন লুইয়ের উপর চড়াও হল কেন স্থানীয় লোকেরা?'

ঃ 'তার নির্দেশে আমরা এক কেল্লা আক্রমণ করেছিলাম। ওখানে কিছু লোক নিহত হয়েছে। আমাদের নিহত হয়েছে একজন, একজন হয়েছে আহত। এরপর আমরা সে কেল্লা পুড়িয়ে দিয়ে এবং আশপাশের বস্তি জ্বালিয়ে চলে আসি। ডন লুইয়ের নির্দেশে সে কেল্লার এক মেয়েকে ধরে আনে হারেস। রাতে স্থানীয় লোকেরা কেল্লায় আক্রমণ করে।'

ঃ 'গাধার দল, ওরা ওই এলাকাকে বেলেনসিয়া মনে করেছে! তুমি আর কিছু বলবে?'

ঃ 'জ্বী, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। ব্যথায় মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

কর্তব্যরত অফিসার পাহারাদারকে বললেনঃ 'এ পাগলটাকে নিয়ে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

সিপাইটি পাহারাদারের সাথে বেরিয়ে গেল। কর্তব্যরত অফিসার অন্যান্য অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'সিরাদরমিজা এবং রোন্দার পরিস্থিতির আলোকে মনে হয় দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা ঠিক হবে না। এলাকা ছিল শান্ত। ডন লুই নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি করল। সে কি অবস্থায় আছে জানি না। আক্রমণকারীরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেলে আমরা তার কোন সাহায্য করতে পারছি না। ও নিহত হয়ে থাকলে অভিযান শেষে তার জন্য শোক পালন করব। তবে আমার দুঃখ হল, যে ব্যক্তি বেলেনসিয়ায় নিজের কেল্লার হেফাজত করতে পারেনি, এমন লোকের হাতে আমার একশোজন জোয়ান তুলে দিয়েছি। সম্রাট এবং রাণীর হুকুম! আমার কিইবা করার ছিল।'

ঃ 'আমার একটা কথা বুঝে আসছে না।' এক অফিসার বলল, 'তুর্কীদের যে জাহাজ বেলেনসিয়ার কেল্লায় আক্রমণ করেছিল, ওরা হাজার মাইল দূর থেকে এখানে এল কেন?'

ঃ 'সে বলেছিল বিপজ্জনক গোয়েন্দাকে পাকড়াও করতে যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল, সম্রাটকে দেখানোর জন্য লুই কয়েকজন নিরপরাধ লোককে ধরে কষ্ট দিয়ে দিয়ে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অপরাধ স্বীকার করাবে। এখন মনে হচ্ছে, গোয়েন্দারা তার চাইতে বেশী সতর্ক। যে জাহাজ দক্ষিণের সীমান্তে গোলাবাজি করেছিল, ওরাই আবার এখানে এসে কেল্লায় আক্রমণ করেছে, এটা কিন্তু কোন সহজ কথা নয়।'

ঃ 'যা হবার হয়েছে। এখন সম্রাটকে সংবাদ দিতে হবে যে, ডন লুই আমাদের সেপাইদের নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

জাহাজের কার্নিশে দাঁড়িয়ে এক মিষ্টি সকালে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখছিল সাদিয়া এবং আবুল হাসান। দক্ষিণ দিকে ইশারা করে আবুল হাসান বললঃ 'সাদিয়া! এবার তুমি উপকূল দেখতে পার। কাল সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন বলছিলেন, আমরা আগামী রাত নিজের ঘরেই বিশ্রাম নিতে পারব। স্পেন ছাড়ার সময় আমি ভেবেছিলাম, এত বড় দুনিয়ায় 'নিজের ঘর' বলার মত কোন স্থান কি পাব? এখন মনে হয়, বারবারী উপকূল, মিসর, সিরিয়া, আরব এবং তুরস্কের প্রতিটি স্থানকেই নিজের ঘর বলতে পারব। সাদিয়া! দীর্ঘ যন্ত্রণা আর কষ্ট থেকে আমি শিক্ষা পেয়েছি। দেশ কেবল মাঠ, পাহাড়, নদী আর উপত্যকার সম্মিলিত স্থান নয়– স্বদেশ হচ্ছে, যেখানে একজন মানুষ স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে বাঁচতে পারে। যেখানে প্রবাহিত হয় ন্যায় ইনসাফের অমীয় ঝর্ণাধারা। যেখানে মানবতা জালিম আর মজলুমে বিভক্ত নয়।

সাদিয়া! আমাদের তুর্কী ভাইয়েরা পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমের কয়েকটি দেশেই বিজয় নিশান উড়িয়েছে। দজলা ফোরাত থেকে দানিয়ুব উপকূল পর্যন্ত ওদের অশ্বক্ষুরের শব্দে প্রকম্পিত হচ্ছে। আমার মনে হয়, তাদের এ বিজয়ের সাথে সাথে ন্যায়, ইনসাফ এবং ইনসানিয়াতে ভরা পৃথিবীর বিস্তৃতি ঘটছে।

যেখানেই আমরা চাইব, তা হবে আমাদের দেশ। এটি ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশ থাকবে যতদিন পর্যন্ত দ্বীনের ঝাণ্ডার নিচে থাকার কারণে

দুর্বলের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার সাহস কোন শক্তিমানের হবে না।

সাদিয়া! স্পেনে আমাদের বিপর্যয়ের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে এ পরাজয় এবং গোলামীর কারণ হল, স্পেনের জালিম বাদশাহ, এবং তখতের বেহায়া দাবীদারদের হাতে আমরা লাঞ্ছনা এবং জুলুম ভোগ করছিলাম। এরপর বাইরে থেকে এলো আরো জালিম এবং হিংস্র লোক, যারা আমাদের টুটি চেপে ধরেছে। স্পেনকে আমরা অনেক দূরে ছেড়ে এসেছি। আমাদেরকে এখন বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়েই ভাবতে হবে, ভুলে যেতে হবে আমরা কোন দিন স্পেনে ছিলাম।'

সাদিয়ার চোখে অশ্রুর বান নামল।

ঃ 'হাসান!' বলল ও, 'স্পেন আমাদের দেশই নয়, স্পেন আমাদের ইতিহাস। ইতিহাস ভুলে যাওয়া এত সহজ নয়।'

আবুল হাসান কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল। বললঃ 'তুমি কি জান নায়েবে আমীরের বাড়ীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তার স্ত্রী এবং মেয়ে? তোমাকে দেখলে তারা ভীষণ খুশী হবে।'

ঃ 'আমি কে তা তারা জানেও না।'

ঃ 'তুমি যে আবুল হাসানের স্ত্রী, তা তো জানে। কিছু না জানলেও ওরা তোমাকে অপরিচিত ভাববে না। পৃথিবীতে এসব লোকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ওসমান বলেছে, সালমান মনসুরকে এ অভিযানে নিতে চায়নি। কিন্তু ও যাবে বলে জেদ ধরেছিল। জাহাজে ও হল সবচেয়ে কম বয়সী অফিসার। আমার ধারণা ছিল, আমার নামও ওর মনে নেই। কিন্তু প্রথম দেখেই ও আমাকে চিনে ফেলেছে।'

ঃ 'মনসুর কি সালমানের ছেলে?'

ঃ 'মনসুর ছেলে না হলেও ছেলের চাইতে বেশী প্রিয়।'

ঃ 'ওসমান বলেছে, সালমানের মেয়েকে বিয়ে করবে বলে ওর পদোন্নতি হয়নি। ওর পদোন্নতি হয়েছে ওর যোগ্যতার জন্য।'

ঃ 'ও হামিদ বিন জোহরার নাতি তা জান নিশ্চয়ই?'

ঃ 'হ্যাঁ, আপনি আমায় বলেছিলেন।'

জাহাজ নোঙ্গর ফেলল দিনের তৃতীয় প্রহরে। বদরিয়া এবং তার মেয়ে আসমা জাহাজ আসার সংবাদ আগেই পেয়েছিল। ওরা বাড়ীর বাইরে এসে সালমান, মনসুর, আবুল হাসান এবং সাদিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। একে

একে সবার সাথে কুশল বিনিময় হল। বদরিয়া এগিয়ে এসে আবুল হাসানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললঃ 'হাসান, আল্লাহর শোকর তুমি জীবিত ফিরে এসেছ। আমরা প্রতিটি সকাল সন্ধ্যা তোমার জন্য দোয়া করেছি।'

আসমা বললঃ 'আমিও সাদিয়া আপার জন্য দোয়া করেছি।'

বদরিয়ার ছোট ছেলে খালেদ সালমানকে জড়িয়ে ধরে বললঃ 'আব্বু, আমিও দোয়া করেছি।'

সন্তানকে খানিক আদর করে সালমান আবুল হাসানকে দেখিয়ে বললেনঃ 'বেটা, তুমি বলতে পার, ও কে?'

ঃ 'আমি জানি আব্বু। ওই যে আপনি যার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন?' এরপর সসংকোচে সাদিয়ার কাছে এসে তার হাত ধরে বললঃ 'আপনি সাদিয়া আপা না!'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আম্মা এবং আপা বলেছেন, আমার একজন বোন আসছেন। আপনি আমার সেই বোন!'

মাথা নাড়ল সাদিয়া। সাথে সাথে ওর চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা। বদরিয়া অপলক চোখে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর স্বামীর দিকে ফিরে বললঃ 'আমার মনে হয় আতেকা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঃ 'সাদিয়াকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল আল্লাহ আমাদেরকে অতীতের ভুল শোধরাবার সুযোগ দিয়েছেন।' বললেন সালমান। তারপর হাসানের দিকে ফিরে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের উপর বড়ো মেহেরবানী করেছেন, হাসান। যেদিন আমরা গ্রানাডা থেকে বিদায় হয়েছিলাম, কে জানত আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ হবে বেলেনসিয়ার কাছে।'

আম্মারা সন্তান দু'টো সাথে নিয়ে এগিয়ে এল। সালমান তাকে দেখেই বললোঃ 'আম্মারা, আবু আমের ওসমানকে নিয়ে অন্য জাহাজে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে যাবে।'

সাদিয়া আম্মারাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বললঃ 'আম্মারা, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

ঃ 'বোন আমার,' আম্মারা বলল, 'আমার মনে হয় আমি নদীতে ডুবে যাচ্ছিলাম। আপনি হাত ধরে টেনে তুলেছেন। আমি যখন আপনার স্বামীর মুক্তির জন্য দোয়া করতাম, তখন বার বার মনে হত, তিনি কি আমার

স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করবেন?'

ঃ 'তুমি এ প্রশ্ন আমার স্বামীকেই করতে পার। ও তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।'

আবুল হাসান বললঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আবু আমেরকে আমি মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

আম্মারা কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিয়ে সবার দিকে তাকাল। বলল, 'মাফ করবেন, আমার কারণে আপনাদের মেহমান বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

বদরিয়া সাদিয়ার হাত ধরে বললঃ 'এসো মা, তোমাকে দেখে আমি অতীতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় আতেকা এবং সাঈদ ছিল এক স্বপ্ন, তুমি এবং হাসান সে স্বপ্নের বাস্তব রূপ।'

দূর থেকে ভেসে এল মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠ। সালমান এবং মনসুর অজু করে মসজিদের দিকে হাঁটা দিল। বদরিয়া, সাদিয়া এবং আসমা নামাজ সেরে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে পড়ল।

বদরিয়া এবং আসমাকে নিজের কাহিনী শুনাচ্ছিল সাদিয়া। আসমার কোলে খালেদ। ডন লুইয়ের প্রসংগ আসতেই ও গভীর মনযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। হঠাৎ খালেদ আসমার কোল থেকে লাফিয়ে নেমে সাদিয়ার হাত ধরে বললঃ 'কোন চিন্তা করবেন না। আমি যখন বড় হব তখন আপনার সব দুশমনের ওপর প্রতিশোধ নেব। আমার জাহাজ হবে অনেক বড়। কামানগুলোও হবে কেল্লার কামানের চাইতে বড়।'

সাদিয়া খালেদকে কোলে তুলে নিয়ে বললঃ 'তুমি বড় হয়ে যখন জিহাদে যাবে আমরা সবাই তোমার জন্য দোয়া করব। তুমি কি জান, স্পেনে তোমার লক্ষ লক্ষ বোন দোয়া করছে তাদের কোন ছোট্ট ভাই বড় হয়ে সিপাহসালার হবে? আর তার চলার পথে বোনরা ছড়িয়ে দেবে রং বেরংগের ফুল?'

কিছুক্ষণ নিরব হয়ে রইল সবাই। ওর নিষ্পাপ চোখ একে একে সবাইকে দেখতে লাগল। অকস্মাৎ মায়ের দিকে ফিরে বললঃ 'আম্মু, আমি সিপাহসালার হব না, আমি হব নৌবাহিনী প্রধান, এ কথা আপুকে বলেন নি?'

আসমা বললঃ 'আমার ভাই জাহাজ দিয়ে পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। যে গল্পে যুদ্ধ জাহাজ নেই সে গল্প ও শুনতে চায়

না। মাথার কাছে খেলনা কামান নিয়ে ঘুমায়। স্বপ্নে কোন দুশমন দেখলে তার দিকেই তাক করে।'

ঃ 'আম্মু?' চেঁচিয়ে উঠল খালেদ, 'দেখলেন, আপা আমায় ঠাট্টা করছে। সবগুলো খেলনা আমি সাগরে ফেলে দেব।'

নামাজ শেষে মসজিদ থেকে ফিরে এল হাসান, মনসুর এবং সালমান। বারান্দার চেয়ারে বসতে বসতে সালমান বললঃ 'বদরিয়া! আবুল হাসান এবং সাদিয়া এখানে নিজকে যেন বোঝা মনে না করে।'

ঃ 'আমাদের পক্ষ থেকে যত্ন আত্তির কোন ক্রটি হবে না। কিন্তু .... হায় ....এ পৃথিবীতে আমরা যদি আরেকটি গ্রানাডা তৈরী করতে পারতাম! আমাদেরও দু'তিনশ বছর পূর্বে টলেডো, কর্ডোভা, সেভিল এবং বিভিন্ন শহর থেকে যাদের পূর্ব পুরুষ আফ্রিকা হিজরত করেছিল তাদের সাথে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে। ওরা স্থানীয় লোকজনের সাথে মিশে গেছে। কোন ভয় বা সমস্যা নেই। এরপরও ওরা স্পেনকে ভুলতে পারেনি। কয়েক পুরুষ আগে এসেছে এমন অনেক বৃদ্ধা মৃত্যুর পূর্বে স্পেনের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে।

এক যুবতীর পূর্বপুরুষ আড়াই শো বছর পূর্বে হিজরত করেছিল। মেয়েটি যখন কর্ডোভার বড় মসজিদ সম্পর্কে কথা বলছিল, আমার মনে হয়েছে ও কতবার সে মসজিদটি দেখেছে। মসজিদের প্রতিটি অংশই যেন ওর চোখের সামনে।'

আবুল হাসান বললঃ 'আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে গ্রানাডার চিত্র আঁকা থাকবে চির দিন। শত শত বছর পর যখন কোন মুসলিম পর্যটক স্পেনে যাবে, ওদের অভ্যর্থনা জানাবে শহীদের অগণিত আত্মা। তখন ওদের মনে হবে তারেক আর আবদুর রহমানের স্পেনের বিশালতা ওদের জড়িয়ে ধরছে, গেঁথে যাচ্ছে আত্মার সাথে।

কালের গতি প্রবাহ আমাদের বিজয়ের চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু যে মাটিতে শহীদেরা তাদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে, তার সৌন্দর্য সুষমা ম্লান হবে না কোন দিন। মুসলমানদের দৃষ্টি আলহামরার প্রাসাদ খুঁজে ফিরবে। কর্ডোভার মসজিদের আজান শোনার জন্য ওদের মন থাকবে উদগ্রীব।'

বদরিয়ার চোখে অশ্রু চিকচিক করছিল। কান্নার বেগ সংযত করে

সাদিয়া বললঃ ‘স্পেনে আমাদের আট শত বছরের কাহিনী ইতিহাস থেকে বাদ দিতে পারব না। সে ইতিহাস ভুলে যাওয়া সম্ভব না। কিন্তু এ বাড়িতে পা রাখার পর মনে হয়েছে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন। মানুষের জীবনে এমন সময়ও আসে, যখন সে কেবলমাত্র নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যই বেঁচে থাকতে চায়। সে সময় এসেছিল আমাদের জীবনেও। জাহাজে উঠার সময় স্পেনের কথা ভেবেছি। আমার মনে হয়েছে, ওখানে মুসলমানদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতের কল্পনা করতেই দেখলাম অসংখ্য নৌকা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। নৌকায় রয়েছে কতগুলি উলংগ ভুখা এবং নির্যাতীত মানুষ। ওরাও কোনদিন মুসলমান ছিল, স্পেন ছিল ওদেরই স্বদেশ। দোয়া করি নির্যাতীত মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ যেন তুর্কী এবং বারবারী ভাইদের আরো শক্তি দেন।’

নিরবে কেটে গেল কিছুটা সময়। এক সময় সালমান বললঃ ‘আমাদের পূর্ব পুরুষ ধ্বংসের পথে পা দিয়েছিলেন। ক্ষমতার মসনদে কি গাদ্দার না দুশমনের চর, সাধারণ মানুষ তা তলিয়ে দেখেনি। গ্রানাডার স্বাধীনতার নিভুনিভু প্রদীপ নিজের চোখে নিভে যেতে দেখেছি। আমি দেখেছি সে মহান মানুষের পরিণতিও, যিনি গ্রানাডাবাসীর কাছে স্বাধীনতার শেষ পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলেন। মনে রেখ হাসান! কোন দিন স্পেনের ইতিহাস আমাদের কাছে হবে অতীত কাহিনী। আগামী দিনের ঐতিহাসিক নির্যাতীত মুসলমানের চিৎকারকে গুরুত্ব দেবে না। গীর্জার আগুনে প্রজ্বলিত আত্মার ফরিয়াদও পৌঁছবে না ওদের কানে। ধীরে ধীরে এ চিৎকার স্তব্ধ হয়ে যাবে একদিন। ইতিহাসের পাতায় তখন তা কাহিনী হয়েই থাকবে।

এ মাটি! যেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, আমাদের বর্তমান, আমাদের ভবিষ্যত। এ জমিনের হেফাজত আমাদের করতে হবে।’

মাগরিবের আযান পর্যন্ত এমনি সব আবেগভরা কথা বলে গেল সালমান। আবুল হাসান এবং সাদিয়ার মনে হল, ভবিষ্যতের আকাশ থেকে মেঘের ঘনঘটা সরে যাচ্ছে। সালমানের শব্দের মালায় ভর করে ছড়িয়ে পড়ছে সুবাসিত জীবনের ঘ্রাণ।

স্পেনে সিরাদরমিজা এবং সিরারুণ্ডার মুজাহিদগণ আলফাজরার লোকদের চাইতে অনেক বেশী সাহসিকতার পরিচয় দিল। ওরা খৃস্টান ঘাঁটির সম্মুখ, পিছন, ডান এবং বাম দিক থেকে অতর্কিত হামলা করত। এসব আকস্মিক হামলায় খ্রীস্টানদের যথেষ্ট ক্ষতি হতো। খ্রীস্টানরা প্রতিরোধ করতে এলে ওরা পালিয়ে যেত উপত্যকার আড়ালে। ওদের কখনো দেখা যেত পাহাড়ের চূড়ায়, কখনো নিচে সংকীর্ণ গিরিপথে। কখনো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে চলা রাস্তায় দুশমনদের ওপর তীর আর পাথর বৃষ্টি করত।

ফার্ডিনেণ্ডের কাছে এই খবর পৌছলেই তিনি এসবের জন্য জেমসকে দায়ী করতেন। কিন্তু এই কঠিন হৃদয় পাদ্রীর সাথে রাণীর ছিল গভীর হৃদ্যতা। সব ব্যাপারেই তিনি পাদ্রীর পক্ষ নিতেন। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে যেতেন সম্রাট।

মুজাহিদগণ কয়েক মাস সাহসিকতার সাথে খ্রীস্টানদের অঢেল অস্ত্রের মোকাবেলা করলো। কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল খৃস্টান ফৌজ। পিছু হটতে বাধ্য হল মুজাহিদ দল। চারদিক থেকে এসে ওরা এক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় জমা হল। চূড়ান্ত বিজয়ের আশায় খৃস্টান সেনাপতি সূর্য ডোবার খানিক আগে সৈন্যদেরকে সেই দুর্গম ঘাঁটির দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দিল। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে পথে ওরা বিপুল বাঁধার সম্মুখীন হল। পাহাড়ের ছায়া পূর্ব দিকে ছুটে চলার সাথে সাথে অন্ধকারে ছেয়ে যেতে লাগল পার্বত্য পথ। সেনানায়কদের দুশ্চিন্তা এবার ভয়ে রূপ নিল।

সমগ্র পাহাড়ী এলাকা গভীর আঁধারে ডুবে গেল। অকস্মাৎ চারদিক থেকে ভেসে এল আল্লাহু আকবার ধ্বনি। সাথে তীর আর পাথরের অবিরাম বর্ষণ। খৃস্টানদের মনে হল গোটা পাহাড়টাই ওদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেছে। পথটা ছিল এত দুর্গম, স্থানীয় লোকেরাও রাতে সতর্কভাবে পা ফেলতো। ঘুটঘুটে আঁধারে কয়েক স্থানে ওরা নিজেদের হাতেই নিজেরা মারা গেল।

অভিজ্ঞ জেনারেলগণ অবশ্যই বিজয় ছিনিয়ে আনবেন, এ আশায় ফার্ডিনেণ্ড রাতভর দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। কবুতরের মাধ্যমে গতকাল দুপুরে তিনি দুশমনের পিছু হটার সংবাদ পেয়েছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো যাবে এ আশ্বাসও ছিল সেখানে। সন্ধ্যায় আরেকটি সংবাদ এলঃ 'আমাদের সৈন্যরা এক দুর্গম পথ ধরে ওদের ধাওয়া করছে।' এর পর আর কোনও সংবাদ ফার্ডিনেণ্ড পাননি।

পরের দিন সন্ধ্যায় এক অফিসার সম্রাট ও রাণীর দরবারে হাজির হয়ে বললঃ 'জিত আমাদেরই হয়েছিল, কিন্তু রাতের অন্ধকারে শত্রুরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। সেনাপতি মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। ভোরে একটা গর্তে তার লাশ পেয়েছি। আমাদের এক তৃতীয়াংশ ফৌজ মারা গেছে। আহত সৈন্যদের গ্রানাডা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ময়দানের আশপাশে দুশমনের চিহ্নও নেই। ওরা কোথায় বা কোন পাহাড়ে সমবেত হচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।'

গীর্জা এবং সরকারের জন্য এ ছিল এক চরম বিপর্যয়। ফার্ডিনেণ্ড নিজেই ময়দানে আসার চিন্তা করলেন। কিন্তু পরে ভাবলেন, পরাজিত সৈন্যদের কারণে অন্য সৈন্যরা সাহস হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে ওই সব এলাকার প্রতিটি উপত্যকা পার্বত্য কবিলাগুলোর জন্য কেল্লার কাজ দিচ্ছে। সুতরাং ওদের সাথে সমঝোতা করাই উত্তম।

সিরাদরমিজার নেতাদের সাথে ফার্ডিনেণ্ডের আলাপ হল। ফার্ডিনেণ্ড ঘোষণা করলেনঃ 'মাথা পিছু দশ ডুকট-এর বিনিময়ে যে কোন মুসলমান দেশত্যাগ করতে পারবে। তা না হলে সবাইকে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।'

অনেক আলাপ আলোচনার পর মুসলমানগণ হিজরতের শর্ত মেনে নিলেন। প্রস্তুতির সুযোগ পেলেন ফার্ডিনেণ্ড। প্রশাসনিক জটিলতা এবং নানান তালবাহানা করে এতেও বাঁধার সৃষ্টি করল সরকার। ফলে খুব কম লোকই দশ ডুকট দিয়ে দেশ ত্যাগের সুযোগ পেল। অধিকাংশকেই জোর করে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হল। এরপর সিরারোন্দার মুসলমানদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করা হল।

পার্বত্য বিদ্রোহ শেষ হয়েছে। নব্য খৃস্টানদেরকে খুশী করার জন্য ১৫০০ সনের ৩০ জুলাই ফার্ডিনেণ্ড ঘোষণা করলেনঃ 'মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন এবং পুরনো সব খৃস্টানই সমান।' কিন্তু ১৫০১ সনের ১লা ডিসেম্বর নতুন ঘোষণা এলঃ 'কোন মরিসকো অথবা নব্য খৃস্টান সাথে অস্ত্র বহন করতে পারবে না। আইন অমান্যকারীকে প্রথমে দুই মাসের শাস্তি

এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। দ্বিতীয়বার এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

গ্রানাডার মুসলমান এরই মধ্যে কেউ হিজরত করেছে, কেউ-বা খৃস্টান হয়ে মরিসকো নাম গ্রহণ করেছে। অল্প কিছু ছিল, যারা আত্মগোপন করেছিল পাহাড়ে-পর্বতে।

সমস্ত স্পেনের অবস্থাই ছিল গ্রানাডাবাসীর মতো। কার্ডিজের মুসলমানগণ খৃস্টানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ করা হবে না এই শর্তে এদের পূর্ব পুরুষ খৃস্টানদের কাছে অস্ত্র সমর্পন করেছিল। এ চুক্তি চলে আসছিল দীর্ঘদিন থেকে। এখন ওরা বুঝতে পারল, কোন ভাল নিয়তে ওরা চুক্তি রক্ষা করেনি, বরং গীর্জার সামনে গ্রানাডা বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে চুক্তি রক্ষায় ওরা ছিল বাধ্য।

১৫০২ সনে কার্ডিজে নতুন ফরমান জারী করা হল। ঘোষণায় বলা হলঃ 'মুসলমানগণ খৃস্টান হবে, নয়তো দেশ ত্যাগ করবে।' দ্বিতীয় ফরমান জারী করা হল কয়েকদিন পরই। ১৪ বছরের বেশী বয়সী ছেলে এবং ১২ বছরের বেশী বয়সী মেয়েকেই শুধু দেশ ত্যাগের সময় সাথে নেয়া যাবে। ১৪ এবং ১২ বছর বয়সের নিচের কোন ছেলে ও মেয়ে দেশ ত্যাগ করতে পারবে না।'

গীর্জাগুলোর ধারণা ছিল, পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ওদেরকে খৃস্টান ধর্মের ধাঁচে সহজেই গড়া যাবে, অথবা বিচ্ছিন্নতার ভয়ে এ পথ আর মাড়াবে না কেউ। এ নির্দেশ অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

আলজাজিরায় পৌঁছে আবুল হাসান এবং সাদিয়া জীবন খাতার নতুন পাতা ওল্টাচ্ছিল। তুর্কী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে সীমান্ত চৌকির অধিনায়কের পদে উন্নীত হয়েছিল আবুল হাসান। দু'বছর পর কেল্লার অধিনায়কের পদে পদোন্নতি হল। স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান ছিল সালমানদের ঘরে, এবার ওদেরকেও কেল্লায় নিয়ে এল।

আসমা ও মনসুরের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। ওসমান এখন নতুন জাহাজের ক্যাপ্টেন, বিয়ে করেছে স্পেনের এক মোহাজির মেয়েকে। ডন কারলু এবং হাসানের সাথে আসা মরিসকো মুসলমানদের চাকরী হয়েছে বিভিন্ন তুর্কী জাহাজে। অনেকে বসতি স্থাপন করল গ্রীসের সাগর পাড়ে। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং সার্বিয়ার বিভিন্ন দেশে জমি পেয়েছে

বেলেনসিয়া এবং আলফাজরা থেকে আসা অধিকাংশ কৃষক।

যারা এতদিন স্পেনের পতন যুগের অন্ধকার দেখছিল, তারা এখন দেখছিল ঝলসে উঠা তুর্কীদের বিজয় অভিযান। যারা কৃষি ছাড়া কিছুই জানত না, ওরা জীবনের শেষ লগ্নে এসে লড়াইয়ে ছুটে চলা সন্তানদের বীরত্বগাথা শুনত। যুবকরা বলকানের পার্বত্য এলাকা এবং হাঙ্গেরীর মাঠে ময়দানে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে যাচ্ছিল। এদেরই অধস্তন বংশধর সোলায়মান আলীশানের সঙ্গী হয়ে ভিয়েনার ফটকে আঘাত করেছিল।

নৌবাহিনী প্রধান কামাল রইস কয়েক বারই স্পেনের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ করে হাজার হাজার মোহাজিরকে বের করে নিয়েছিলেন। ওরা আশ্রয় নিয়েছিল রোম সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে।

সুলতান সলিমের শাসন কালের শেষ দিকে 'সাগর সম্রাট' নামে খ্যাত খায়রুদ্দীন জলদস্যুদের নিয়ে তুর্কী নৌবাহিনীতে যোগ দেয়। সাগরে ছিল খায়রুদ্দীনের একচ্ছত্র আধিপত্য।

নৌবাহিনী প্রধান কামাল রইসের পরই ছিল তার স্থান। তিনি আফ্রিকার সমুদ্রতীরবর্তী ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করলেন এবং বারবারী সীমান্তের সব কটি জাহাজ তুর্কী নৌবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করলেন।

খায়রুদ্দীন ফার্ডিনেণ্ডের নাতি পঞ্চম চার্লস-এর বিখ্যাত নৌ প্রধানকে পরাজিত করে খায়রুদ্দীন পাশা নাম ধারণ করলেন। এ মহান বিজয়ের পর তিনি যখন কনস্ট্যান্টিনোপল পৌঁছলেন, সম্রাট সোলায়মান আলীশান তাকে ক্যাপ্টেন পাশা খেতাবে ভূষিত করলেন। এ খেতাবটি ছিল তুর্কী নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদক।

১৫৩৫ খৃস্টাব্দে তিনি ইতালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে কয়েকটি এলাকা কব্জা করেন। নেপলস-এর জাহাজ স্পেনের সাথে মিশে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, এ জন্য তিনি নেপলসের যুদ্ধ জাহাজগুলো ধ্বংস করে দিলেন।

এ অভিযান শেষ হল। তুর্কী নৌবাহিনী প্রধান আফ্রিকা সীমান্তে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজন অনুভব করে তিউনিস দখল করে নিলেন। তিউনিসের সন্দেহভাজন সম্রাটকে হত্যা করা হল। এরপর তিনি নিশ্চিন্তে স্পেন অভিমুখে যাত্রা করলেন। দখল করে নিলেন স্পেনের পূর্ব দিকের মুতারেকা দ্বীপ।

খাইরুদ্দীন রোম সাগরের পার্শ্ববর্তী খৃস্টান দেশগুলোর যুদ্ধ জাহাজের

সাথে বার বার সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। কারণ, মুসলমানরা স্পেনের রোখ করলে ওরা পেছন থেকে এসে আক্রমণ করত। ফলে স্পেন আক্রমণ না করেই ফিরে আসতে হতো খায়রুদ্দীনকে।

স্পেনের সত্তর হাজার মোহাজিরকে তিনি বারবারী এলাকায় পুনর্বাসন করলেন। এ ছিল তার সবচেয়ে বড় সাফল্য। স্পেন থেকে পালানোর সময় মরিসকো মুসলমানগণ পাদ্রী এবং খৃস্টান নেতাদের ধরে নিয়ে যেতো। পরে এদের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিত কয়েদীদের। খায়রুদ্দীনের পর তুরগুত ছিলেন সফল নৌবাহিনী প্রধান। তার নাম শুনলেই দক্ষিণ এবং পশ্চিম তীরবর্তী দেশগুলো কেঁপে উঠত। তুর্কী এবং বারবারীদের এ মহান বিজয়গুলোর ফলে স্পেনের কয়েক লাখ মুসলমান গোলামীর অপমান থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু এত কিছুর পরও সে হতভাগ্য জাতি তকদির পাল্টাতে পারেনি।

স্পেনে মুসলমানদেরকে জোর করে খৃস্ট ধর্মের দীক্ষা দেয়া হয়েছিল। ওরা শেষতক মনকে প্রবোধ দিচ্ছিল এই বলে যে, ওরা বাইরে খৃস্ট ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করলেও ভেতরে মুসলমানই থাকবে। ওদের নাম এবং পোশাক বদলে দেয়া হয়েছিল। ওরা পাদ্রীদের সাথে গীর্জায় প্রার্থনা করলেও বাড়িতে দরজা বন্ধ করে নামাজ পড়ত। গোপনে পশু জবাই করত। বিয়ে শাদী হতো গীর্জায়। কিন্তু ওরা বাড়িতে ইসলামী রীতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান করে বর কনেকে আরবী পোশাক পরাত। এসব ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো।

খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে ধন সম্পদ বাঁচিয়ে রেখেছে বলে গীর্জার অধিপতিরা হিংসায় মরে যাচ্ছিল। অসহায় মানুষের কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নেয়াটাই ছিল হাজার হাজার ন্যাড়া মাথা পাদ্রীর উপার্জনের একমাত্র পথ। ওরা সারাদিন শিকারের ধান্ধায় ঘুরত। কোন মরিসকো মুসলমানের উপর অপবাদ চাপানো অথবা কাউকে ধমক দিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলানো কষ্টকর ছিল না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। অভিযুক্তরা দোষী হোক বা না হোক, তার ওয়ারিশগণ কখনো এ সম্পত্তি ফিরে পেত না। ওই যুগে খৃস্টানদের কাছে গোসল করাও পাপ ছিল। কোন মরিসকো গোসল করছে সন্দেহ হলে তাকে জেলে পাঠিয়ে দিত। মৃত পশু না খেয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলার

অপরাধে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো।

প্রতিটি মানুষ এই ভেবে শঙ্কিত ছিল, কখন আবার মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতার হতে হয়। শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বড় অংকের ঘুষ দিতে হতো। শুধু সংস্থার গোয়েন্দাদেরকেই নয়, এলাকায় মাতব্বর, জায়গীরদার থেকে শুরু করে গভর্নরকে পর্যন্ত তাদের এ ঘুষ দিতে হতো।

স্পেনের অধিবাসীদের বেশীর ভাগ ছিল কৃষক। ওরা ছিল পরিশ্রমী, কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান। খৃষ্টানরা যতবারই ওদের সহায়-সম্পদ লুট করেছে ততবারই ওরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

কী আশ্চর্য! শত শত বছর বিলাসিতার সাথে দেশ শাসন করে যারা দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে বেখবর ছিল, দুশমনের তলোয়ার গর্দান ছোঁয়ার পরও যারা আঞ্চলিক বিভেদ জিইয়ে রেখেছিল, আজ স্বাধীনতা আর জাতিসত্ত্বা হারিয়ে ওরাই বাপদাদার ধর্মের প্রতি সীমাহীন আগ্রহী হয়ে উঠল!

মরিসকোর অপমানকর নাম নিয়েও মিথ্যে অভিযোগে মৃত্যুর মতো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয়ে ওরা এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছিল। চিরস্থায়ী অপমানের অনুভূতি গীর্জা এবং দমন সংস্থার বিরুদ্ধে ওদের মনে প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি করেছিল।

গ্রানাডা পতনের ৭৫ বছর পর ১৫৬৭ সনের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক ফরমান জারী করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, এতে মরিসকোরা উত্তেজিত হয়ে পড়বে, আর তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে লুটপাটের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয় ফিলিপ ফরমানটিতে বলেনঃ ‘মরিসকোরা মুসলমানদের মতো পোশাক পরতে পারবে না। মহিলারা বোরকা অথবা ওড়না পরতে পারবে না। বিয়ে শাদীতে গীর্জার নিয়ম পালন করতে হবে। ঈদ বা জুম্মার দিন সকলের ঘরের দরজা খুলে রাখতে হবে যাতে পাদ্রী যে কোন সময় তদন্ত করতে পারেন।

সন্তানদের ইসলামী নাম রাখা যাবে না। কেউ মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে না। সকল হাম্মামখানা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কেউ গোসল করতে পারবে না। ৩ বছরের মধ্যে সবাইকে স্পেনিশ ভাষা শিখতে হবে। আরবীতে কথা বলা বা কোন কিছু পড়া যাবে না। এখন থেকে কারো কাছে আরবী কোন লেখা থাকতে পারবে না।’

মরিসকোরা স্বাধীনতা হারিয়েছিল। হয়েছিল সহায় সম্পত্তি বঞ্চিত। ওদের সভ্যতা সংস্কৃতি গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল। ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রাখার একটা মাধ্যম মাতৃভাষা, তাও নিষিদ্ধ করা হল!

গ্রানাডার প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন মার্কোস অব মিগুজার নামে এক অভিজ্ঞ সৈনিক। বেশী বাড়াবাড়িতে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে বলে তিনি গীর্জার নেতাদের কাছে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন। কঠোর আইন প্রয়োগেরও বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু পাদ্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দ্বিতীয় ফিলিপ তার এ পরামর্শ কানেই তোলেননি।

এর ফলে শুরু হল ইতিহাস খ্যাত দ্বিতীয় বিদ্রোহ। ১৫৬৮ সনের ২৩শে ডিসেম্বর বিদ্রোহীরা গ্রানাডায় প্রচণ্ড আক্রমণ করল। কিন্তু আলবেসীনের মরিসকোরা তাদের সহযোগিতা না করায় শহর দখল করা সম্ভব হয়নি। এর পরেও পার্বত্য এলাকা সমূহে বিদ্রোহীরা সফলতা লাভ করেছেন। আলজাজিরার ভাইসরয় বিদ্রোহীদের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক এবং অস্ত্র পাঠাতে লাগলেন। ওরা তুর্কী বারবারীদের কাছ থেকেও অস্ত্র এবং গোলা বারুদ পেতে লাগল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওরা হাজার হাজার পাদ্রী এবং সেনা চৌকিগুলোর অধিনায়কদের হত্যা করল। এসব পাদ্রীদের পূর্ব পুরুষরাই গীর্জার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল আলফাজরার দেয়াল পর্যন্ত।

বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিল ডন হারনিণ্ডো ডি কার্ডোয়া নামের গ্রানাডার একজন মরিসকো। ডন হারনিণ্ডো ছিল খলিফা আব্দুর রহমানের অধস্তন বংশধর। পার্বত্য কবিলাগুলো জীবন মৃত্যুর খেলায় তার মত একজন লোককে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে এমন যোগ্যতা তার ছিল না। তার ছিল না কোন রাজনৈতিক অতীত। কেবল মাত্র উচ্চবংশের বলে লোকজন তাকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তার মুসলমান নাম রাখা হল ইবনে উমাইয়া। বিদ্রোহের এ যুদ্ধ কোন সম্রাটের জন্য ছিল না। বাইরের স্বেচ্ছাসেবকগণ এক মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করছিল। কিন্তু উমাইয়ার তৎপরতা ছিল বিতর্কিত। তার ব্যক্তি চরিত্র ছিল কালিমালিপ্ত। তুরস্ক এবং আলজাজিরার মুজাহিদদের কারো হাতে সে নিহত হয়।

এ বিদ্রোহ দুই বছর স্থায়ী হয়েছিল। বিদ্রোহীরা কোন এক এলাকায় সফল হলে কিছুদিনের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকত। সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা নিয়ে গ্রানাডা থেকে পাঠানো হতো মরিসকো মুসলমানদের। আত্মসমর্পণ করত

বিদ্রোহীরা। একদিন খৃষ্টান সৈন্য এসে বলত, বিশেষ এক এলাকায় তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। এলাকা শান্ত হলে স্ত্রী স্বজনের কাছে আবার ফিরিয়ে আনা হবে। সৈন্যরা বিদ্রোহীদেরকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যেতো। নারী এবং শিশুদের বিক্রি করা হত গোলাম হিসেবে। এর বিরুদ্ধে আবার প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠতো।

মার্কোস ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সৈনিক। অহেতুক অত্যাচার তিনি অনুমোদন করতেন না। তিনি চেষ্টা করতেন বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ করুক আর দ্বিতীয়বার যেন উঠে দাঁড়াতে না পারে।

পাদ্রীরা মরিসকোদের মনে করত ইসলামের শেষ চিহ্ন। ওদের নিশ্চিহ্ন করলে ইসলামও শেষ হয়ে যাবে। পাদ্রীদের এ ঘৃণ্য পরিকল্পনার সাথে সহযোগিতা করলেন দ্বিতীয় ফিলিপ। ফলে সিরানুবিদা, রোন্দা, দরমিজা প্রভৃতি পার্বত্য এলাকাসহ মর্সিয়া এবং ভিগার উপত্যকা পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। গীর্জার রক্ষকরা এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখী হল।

এ লড়াইয়ের কোন কেন্দ্র ছিল না। মরিসকোরা দীর্ঘদিন কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। অস্ত্রের ব্যবহার প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তবু জীবন মৃত্যু সম্পর্কে বেপরোয়া হয়েই ওরা কয়েক স্থানে লড়াই করতে লাগল। কোথাও বিদ্রোহীরা জয়লাভ করলে বা খৃষ্টান সৈন্যরা পিছু সরে গেলে দেখা যেত, তা ছিল জাজিরার স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতার ফল।

ফিলিপ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সৎ ভাই ডন জন অব অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে গোটা সেনাবাহিনী ময়দানে নিয়ে এলেন।

স্পেনের সেনাবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এল ইটালীর নৌবহর। ডন জন সৈন্যদের সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের বেতন বাড়িয়ে দিলেন। এরপরও পদে পদে কঠিন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তিনি।

স্পেনের অসহায় মানুষের উপর বছরের পর বছর ধরে চলে আসা জুলুম এমন এক শক্তির জন্ম দিয়েছিল, যা ছিল স্পেনের সরকার এবং গীর্জার ধারণাতীত। মরিসকোরা শুধু অস্ত্রের ব্যবহারই ভুলে যায়নি, যুদ্ধের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিল। ওরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোথাও সম্মিলিত শক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি। সবচে দুঃখজনক হল, তুর্কী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় যখন ওরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারত, তখন মরিসকোরা অন্য কেন্দ্রে জড়িয়ে পড়ল। এরপরও বারবারী জাহাজগুলো

ওদেরকে নিয়মিত অস্ত্র পৌঁছাত। ইটালীর নৌবহর ওদের পথ রুখতে পারেনি। বিদ্রোহের আড়াই বছর পর ১৫৭১-এর মার্চ মাসে বিদ্রোহীদের নেতা আবু আবদুল্লাহ এক গাদ্দারের হাতে নিহত হলেন। মরিসকো আততায়ী গ্রানাডার বিশপের কাছে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিল। আরো দু'মাস লড়াই করার পর বিদ্রোহীদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। পরাজিত বাহিনীর সাথে এমন কঠিন ব্যবহার করা হলো, পশ্চিমা ইতিহাসের কোন যুগেই যার নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

পার্বত্য এলাকায় কোন জনবসতি সামনে পড়লে তা ধুলিস্মাৎ করে দেয়া হত। পুরুষদের হত্যা করা হত অথবা হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে জাহাজের কষ্টকর কাজে পাঠিয়ে দেয়া হত। নারী এবং শিশুদের করা হত গোলাম। পার্বত্য এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হত। গুহা থেকে কেউ বেরিয়ে এলে তাকে সাথে সাথে হত্যা করা হত। কেউ ভেতরে থাকলে আগুন জ্বেলে দেয়া হত বাইরে।

এরপর শুরু হল মরিসকোদেরকে গ্রানাডা থেকে বের করে দেয়ার পালা। ঘোষণা করা হলঃ 'ষোল বছরের বেশী বয়সী কোন পুরুষকে গ্রানাডার ৩০ মাইলের মধ্যে দেখা গেলে সাথে সাথে হত্যা করা হবে। ৯ এর অধিক বয়সী কোন মেয়ে পাওয়া গেলে সে হবে দাসী।' সুতরাং ভেড়া বকরীর মত ওদের খেদিয়ে দেয়া হল কার্ডিজ এবং উত্তরের শহরগুলোর দিকে। শিশুদেরকে সাথে নিতে দেয়া হয়নি। খৃষ্টবাদের দীক্ষা দিয়ে ওদের স্বর্গ নিশ্চিত করার জন্য রেখে দেয়া হল। শেষতক শহরের অলিগলি শিশু ভিক্ষুকে ভরে গেল।

১৫৬৮-এর ব্যর্থ বিদ্রোহের পর মরিসকোদের দৈহিক শক্তিও নিঃশেষ হয়ে পড়ল। ওদের আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এগিয়ে এল পাদ্রীরা। দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল ইনকুইজিশনের অগ্নি শিখা।

অপরাধীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাই ছিল সবচেয়ে পূণ্যের কাজ। পুড়িয়ে মারার এ জাতীয় মেলায় সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সবাই উপস্থিত থাকত। অপরাধীদেরকে মিছিলসহ সশস্ত্র প্রহরায় নিয়ে আসা হত। মিছিলে থাকত দমন সংস্থার অফিসার, সশস্ত্র পাহারাদার এবং পাদ্রীর গ্রুপ।

যেভাবে রোমের সিনেট মেম্বার এবং পুরোহিতদের সামনে অপরাধীকে ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচায় পুরে দেয়া হত, তেমনি স্পেনের সম্রাট, পাদ্রী এবং জনসাধারণের সামনে অপরাধীকে আগুনে পোড়ানোর রসম পালন করা

হত। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করত নিষ্পাপ অপরাধীদের। ওদের আর্ত চিৎকারে উল্লাসে ফেটে পড়ত দর্শকরা। দমন সংস্থা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে বলে খুশীর জোয়ার বয়ে যেত পাদ্রীদের মধ্যে।

মুসলমানদের এ সময়কার ইতিহাস ছিল কতগুলো দুর্বল, অসহায় আর নির্যাতীত মানুষের ইতিহাস। এদের পূর্বপুরুষরা এ ধ্বংসের পথ তৈরী করেছিল। কখনো কখনো এ বিধ্বস্ত কাফেলার মধ্যে জেগে উঠত প্রতিরোধ চেতনা, শ্রান্ত ক্লান্ত পথিককে যা নতুন ভাবে পথ চলার শক্তি যোগাত। ইতিহাসের ছাত্ররা যখন পড়ে ষষ্টদশ শতকে জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে মজলুম সাহসী মুজাহিদদের তৎপরতার কাহিনী. ওরা আশ্চর্য হয়ে যায়। ওরা জীবন মৃত্যুর পরোয়া না করে জালেমের মোকাবিলা করতো। যখন এদের পূর্বপুরুষ গাদ্দারীর পোশাক পরে স্পেনের ভাগ্যকে বদলে দিচ্ছিল, তখন এদের উচ্ছ্বসিত আবেগ ছিল কোথায়? ষষ্ঠদশ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম অংশের ইতিহাস হল, গীর্জা এবং দমন সংস্থার জুলুম নির্যাতনের ও বর্বরতার ইতিহাস।

স্পেনের মুসলমানদের সাথে অতীতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওদের বর্তমান আর ভবিষ্যত হারিয়ে গিয়েছিল নিরাশার গহীন অন্ধকারে। কিন্তু কি আশ্চর্য, শুধু বেঁচে থাকার জন্য যারা খৃষ্টবাদের দীক্ষা নিয়েছিল, এক শতাব্দী পরও তাদের বুকে জ্বলছিল ইসলামের প্রতি ভালবাসার চেরাগ। স্পেনে মরিসকো ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নেও দেখা যায়, জ্বলন্ত আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে কালিমা পড়ে হাসি মুখে জীবন দিয়েছিল ওরা।

১৬০৮ সনে তৃতীয় ফিলিপ এবং গীর্জার পাদ্রীরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, মরিসকোরা স্পেনের জন্য বিপজ্জনক। তখনও বাইরের আক্রমণকারীদের জন্য ওরা এক লক্ষ সাহায্যকারী জমায়েত করতে সক্ষম ছিল। তুরস্ক এবং আফ্রিকার মুসলমানই নয় বরং ইউরোপে স্বজাতি খৃষ্টান বিশেষ করে ফ্রান্স ও স্পেনের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা।

১৬০৯-এর শীত মওশুমে স্পেন থেকে মরিসকো মুসলমানদেরকে বিতাড়নের পালা আবার নতুন করে শুরু হল। সরকার প্রথম দৃষ্টি দিল মরিসকো অধ্যুষিত এলাকা বেলেন্‌সিয়ার দিকে। ওদের যখন তাড়িয়ে নিয়ে জাহাজে তোলা হচ্ছিল, বিষাদের পরিবর্তে ওদের ঠোঁটে ফুটে উঠছিল তৃপ্তির হাসি। কণ্ঠে আনন্দের গান। এতে পাদ্রীদের আশ্চর্যের সীমা রইল না। দেশ

ছেড়ে যাচ্ছে অথচ ওরা হাসছে! যিল্লাতির জীবন ছেড়ে ওরা যাচ্ছে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য, এতেই যেন ওদের আনন্দ। মরিসকোদের একটা দল দেশ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সরকার বিদ্রোহ দমন করলো। নিহত হল হাজার হাজার মরিসকো মুসলমান।

১৬১০ সাল পর্যন্ত আন্দালুসিয়া, গ্রানাডা, কার্ডিজ ও আরাগুন প্রদেশকে মরিসকো মুক্ত করা হল। উত্তর এলাকা সমূহের হাজার হাজার মানুষ পিরেনিজ পাড়ি দিয়ে ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করল। যাদের সাথে পথ খরচ ছিল, ওরা হিজরত করল আফ্রিকার দিকে। বাকীরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ভিখারীর জীবন যাপন করতে লাগল।

স্পেন থেকে মরিসকো বিতাড়ন পালা চলল কয়েক বছর। সরকার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলো এ কাজে। এরপরও অনুযোগ শোনা যেত, স্পেনে এখনো মরিসকো রয়ে গেছে।

কয়েক হাজার লোকের পক্ষে পাহাড়ে পর্বতে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব ছিল না। অনেকে আবার এক পথে গিয়ে আরেক পথে ফিরে আসত। জুলুম অত্যাচার আর শত লাঞ্ছনার পরও স্পেন ছাড়া ওরা কোন আশ্রয় দেখতো না।

১৬১৪ সনে পোপ ঘোষণা করলেনঃ 'এতদিনে স্পেন মরিসকো মুক্ত হল। খৃষ্টবাদের এ মহান বিজয়ে আমাদের অবশ্যই আনন্দ উৎসব করা উচিৎ।'

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে ১৭শ শতকের শুরুর কয়েক বছরে সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রায় ১০ লাখ মুসলমানকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অনেক হতভাগ্যকে পথেই হত্যা করে ফেলে দেয়া হয়েছিল সাগরের অথৈ জলে। পিরেনিজ পেরিয়ে যারা ফ্রান্সে পৌঁছেছিল ওরা হয়ত মারা যায়নি, কিন্তু লুণ্ঠিত হয়েছিল ওদের সব কিছু। বারবারী সীমান্তে পালিয়ে যাওয়া মরিসকোরা আফ্রিকায় কারো আপন হতে পারেনি। স্থানীয় লোকদের অসহযোগিতার ফলে ওদেরকে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ইসলামের ভ্রাতৃবোধ। এতে পরস্পরের দূরত্ব কমে আসে অনেক।

মরক্কোবাসীর সাথে স্পেনের গভীর সম্পর্ক ছিল। ১৬০৮ সনে মরিসকো বিতাড়নের নির্দেশ জারী হওয়ার পূর্বেই অনেক মরিসকো

মুসলমান বারবারী জাহাজের সহযোগিতায় ওমান পৌছে গিয়েছিল। এরা মিশে গিয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে। মরিসকো শব্দ ছিল গালির মত। আবার স্পেনে ফিরে যাবার ইচ্ছে তাদের মন থেকে কখনো মুছে যায়নি। মরক্কোতে এখনো এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের ঘরের দেয়ালে লটকে আছে স্পেন থেকে নিয়ে আসা ঘরের চাবি।

শতাব্দী পূর্বে এদের পূর্ব পুরুষ স্পেন ত্যাগের সময় এ চাবি নিয়ে এসেছিল। এসব জং ধরা চাবিতে মুসলিম স্পেনের অনেক ইতিহাস খোদিত হয়ে আছে। যে সব হতভাগাকে দাস হিসেবে আরমেনিয়া পাঠানো হয়েছিল তাদের কাহিনী কোন ঐতিহাসিকের কলমে স্থান পায়নি। আজো দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, বিশেষতঃ মেক্সিকোতে অসংখ্য লোক রয়েছে যাদের দেখলে বুঝা যায়, এদের শরীরে আরবের খুন বইছে।

এত করেও স্পেনে মরিসকোদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। হাজার হাজার শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। হাজার হাজার নারীকে পরিণত করা হয়েছে দাসীতে। দক্ষিণ স্পেনের লোকদের মধ্যে এখনো সে রক্তের গন্ধ পাওয় যায়।

দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে জ্বলছিল দমন সংস্থার লেলিহান শিখা। এ আগুন শুধু স্পেনকেই নয়, পুড়িয়েছে ইউরোপকেও। কেথলিক চার্চ দুশমনীর যে চোখে ইহুদী এবং মুসলমানদের দেখতো, তেমনি মার্টিন লুথারের প্রোটেষ্টান্টদের জন্যও সে ছিল নির্দয়। সপ্তদশ শতকে মরিসকোদের নিশ্চিহ্ন করার পর স্পেন সরকারের সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রোটেষ্টান্টদের ওপর। ওদেরকে পরিশুদ্ধ করার কোন উদ্দেশ্য সরকারের ছিল না।

যারা বলত, পাদ্রীরা এখন কোন দায়িত্ব পালন করছে না, যিশুর নামে আগুনে পোড়ানোর সংখ্যা এখন কমে গেছে, কেবল তাদের খুশী করার জন্যই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

দমন সংস্থার কর্মচারীরা নির্যাতন করে মরিসকো মুসলমানের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি নিত যে, সে মনেপ্রাণে খৃষ্টান নয়। এখন ওরা কেথলিকদেরকে নির্যাতনের মুখে স্বীকার করাতো যে, সে মনেপ্রাণে কেথলিক নয়। বিত্তশালী খৃষ্টানের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ফাঁসানো হতো।

যাদুকরের অপবাদ দেয়ার জন্য দু'জন মিথ্যা সাক্ষী যথেষ্ট ছিল। এরপরও ইউরোপের কোন কোন দেশ দমন সংস্থার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি

পেয়েছিল।

স্পেনের গীর্জা থেকে জন্ম নেয়া অত্যাচারের কাহিনীর কোন শেষ নেই। পাদ্রীদের জগৎ ছিল সম্পুর্ণ ভিন্ন। মানুষ তুর্কমিণ্ডা এবং জেমসের নাম হয়ত ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু তারা মানবতার চাদরে যে আগুন জ্বেলেছিল, তা জ্বলছিল শত শত বছর ধরে। কখনো এ আগুন দেখা যেত আফ্রিকার অসভ্য গোত্রের মাঝে, আবার কখনো এ আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত নতুন পৃথিবীর আদিবাসীদের ঘর বাড়ী।

আমাদের এ কাহিনী সে মহান জাতির শেষ নিঃশ্বাসের সাথে নিঃশেষ হয়ে গেছে, যারা তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেনের মাটিতে পা রেখেছিলেন। যারা জুলুম অত্যাচার আর উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ মিটিয়ে ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্যের পতাকা তুলে ধরেছিলেন মাথার ওপর। যারা কর্ডোভা, সেভিল, উলিটোলা এবং গ্রানাডায় জ্ঞান ভাণ্ডার ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

যাদের শিক্ষাঙ্গনগুলো থেকে পশ্চিমা বিশ্ব খুঁজে পেয়েছিল আলোকবর্তিকা। এ জাতি স্রষ্টার আর্শিবাদ পুষ্ট হয়ে শত শত বছর ধরে সমুন্নত রেখেছিল তাদের বিজয় পতাকা।

আবার শত শত বছর ধরে ওরা গোমরাহীর পথ ধরে এগিয়ে চলল। শোধরানোর সুযোগ দেয়া হয়েছিল তাদের বারবার। ক্ষণজন্মা নেতৃবৃন্দ বিপদ সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু ওরা শান্তির পথ ছেড়ে এসেছিল, ওদের ধ্বংসের পথ ওরা নিজেরাই তৈরী করেছিল। হিংস্র হায়েনার দল যখন ওদের চারপাশে নৃত্য করছিল, তখন তাদের জীবন মৃত্যুর ফয়সালা ছিল গাদ্দারদের হাতে। যারা ছিল মুসলমানদের মুক্তি ও আজাদীর দুশমন, গাদ্দাররা হাত মিলিয়েছিল তাদের সাথে।

গ্রানাডা পতনের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়েছিল ইসলামী স্পেনের স্বাধীনতা। এর পর প্রায় সোয়া এক শতক ধরে ইতিহাস ওদের কখনো কাঁদতে, কখনো হা-পিত্যেশ করতে, আবার কখনো নিরবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছে। শুধু বেঁচে থাকার জন্য ওরা জীবনের সকল কামনা জলাঞ্জলি দিয়েছিল। এদের অবস্থা ছিল ক্ষুধার্ত শ্বাপদ আক্রান্ত পশুর মত।

কর্ডোভার মসজিদ আর গ্রানাডার আলহামরা প্রাসাদ আজো তাবৎ পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিন্তু অন্যান্য শহরে গুড়িয়ে দেয়া ধ্বংসস্তুপ দেখলে মনে হয়, অগণিত শহীদের আত্মা আজো এর চারপাশে ঘুরে ফিরছে। যদি অতীতের এ চিহ্নগুলো শহীদের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে

কোন পয়গাম পৌঁছাতে পারত, যদি কোন তারেক, কোন আবদুর রহমান, মুসা বিন আবি গাস্‌সান অথবা কোন হামিদ বিন জোহরা অনন্তের পর্দা ছিঁড়ে কিছু সময়ের জন্য আমাদের সাথে কথা বলতে পারত, তবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিত।

'গ্রানাডা' ছিল স্পেনের মুসলমানদের শেষ আশ্রয়। পতন যুগে ক্ষমতার মসনদের মিথ্যা দাবীদার এবং ঈমান বিক্রেতাদের ষড়যন্ত্রের ফলে এ দুর্গ যখন ভেংগে গেল, তখন স্পেনের কোন এলাকাই আর নিরাপদ ছিল না। বনু আহমদ-এর ক্ষুদ্র সালতানাতের পতন ছিল সেসব লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, ১৪৯২-এর কয়েক শতাব্দী পূর্বে যারা স্বাধীনতা হারিয়েছিল। ওরা এ আশায় বেঁচে ছিল যে, গ্রানাডার কারণে তাদের জাতিসত্ত্বা টিকে থাকবে।

কোনদিন হয়ত এখানে তারেক, আবদুর রহমান আর মনসুরের জাতি থেকে কোন মুজাহিদ জন্ম নেবে। বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হলে ওদের সাহায্যে ছুটে আসবেন ইউছুফ বিন তাশফিন। তারা অথবা তাদের উত্তরসূরীরা আল কবীর উপত্যকায় তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু গ্রানাডা পতনের সাথে সাথে তাদের ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা ডুবে গেল হতাশার গহীন আঁধারে।

স্পেন আজ সে দেশ নয়, যার প্রতিটি ধূলিকণার সাথে জড়িয়ে আছে তাদের পূর্বসূরীদের গৌরবগাঁথা। পরাজিত হয়েও বেঁচে থাকা যাবে, স্পেন আজ সে দেশও নয়। স্পেন আজ হিংস্র হায়েনার শিকার ক্ষেত্র।

এমন শিকার ক্ষেত্র যেখানে অসহায় পশুর মত বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। স্পেন আজ এমন এক গোরস্থান, কল্পনায় যাদের আত্মার ফরিয়াদ শুনতে পায় বিশ্ব মানবতা। ওদের পূর্ব পুরুষ রক্ত দিয়ে এমন ইতিহাস রচনা করে গেছেন, যা কখনো ভোলা যায় না। অযোগ্য সম্রাট, লোভী এবং গাদ্দারদের সম্মিলিত তৎপরতা ওদের জন্য ধ্বংসের পথ খুলে দিয়েছিল।

ওখানে প্রতিনিয়ত নির্যাতিতের ফরিয়াদ শোনা যাচ্ছে– দেশ ছাড়া কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। ঐক্য, ইহসান, সাহস, হিম্মত ও ত্যাগ ছাড়া কোন দেশ টিকে থাকতে পারে না। স্থায়িত্বের পথ ঐক্যবদ্ধ বিবেকের আলোতেই খুঁজে পাওয়া যায়। কোন জাতির পাপের শাস্তি সম্ভবতঃ এর চেয়ে বেশী হতে পারে না যে, তাদেরকে জাতির নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা

হবে। ভাল-মন্দের পার্থক্য বদলে দেয়াই স্পেনের মুসলমানেদের দুর্ভাগ্য ছিল না বরং যে দ্বীন ছিল স্পেনের মুসলমানদের প্রথম এবং শেষ আশ্রয় তা থেকে তারা দূরে সরে পড়েছিল। দুশমনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন যখন সবচে বেশী, তখন ওরা জাতিভেদকে জীবন্ত করেছিল। পূর্বপুরুষরা যেখানে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে দেশেই তারা বরবাদী, ধ্বংস আর অপমানের স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

গ্রানাডা পতনের পর এ হতভাগ্য জাতির সাথে সকল মুসলিম দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। এমনকি যখন ওদেরকে জীবন্ত নিক্ষেপ করা হচ্ছিল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, তখন তাদের কান্নার অন্তিম ভাষা লেখার জন্যও কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।

হায়! আজো সেই বিরাণ ভূমিতে মানবতার সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠেনি। সভ্যতার সুবাতাস এখনো স্পর্শ করেনি সে মাটি। এখনো সেখানে সত্য ও সুন্দরের উন্মেষ ঘটেনি। স্পেনের বাতাসে আজো তাই কেবলি ভেসে বেড়ায়, সভ্যতা ও মানবতার মৃত আত্মার করুণ কান্নার হাহাকার ও বিলাপধ্বনি।

(সমাপ্ত)

আমাদের প্রকাশিত

নসীম হিজাযীর সাড়া জাগানো উপন্যাস

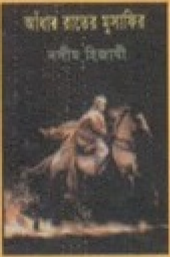

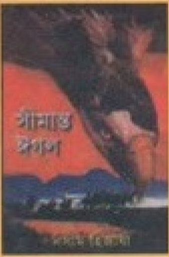

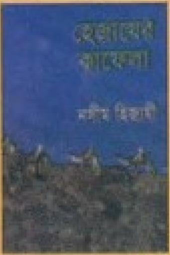

সীমান্ত ঈগল আর নেই। আঁধার রাতের মুসাফিররা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে জন্মভূমির স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ধূর্ত ফার্ডিনেন্ডের চক্রান্তজালে বন্দী হয়ে আজ তারা নিঃশেষিত। চারদিকে রক্ত আর আগুনের সয়লাব। বাতাসে গুমরে মরছে মজলুম মানুষের কান্না। দরদী লেখক নসীম হিযাজী সেই বিভীষিকাময় স্পেনের করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন তার অসামান্য উপন্যাস 'কালিসা আওর আগ' গ্রন্থে। এ কাহিনী বড়ই বেদনাবিধুর, বড়ই শোকাবহ। বাংলায় এটি আমরা প্রকাশ করি 'শেষ বিকালের কান্না' নামে।

বইটি পাঠকবৃন্দের হৃদয়ে ঝড় তুলতে পেরেছে দেখে আমরা আশান্বিত। কেবল উপন্যাস পড়ার আনন্দ নয়, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখা কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ এ বই আমাদের সে দিকনির্দেশনাই দেয়। আসুন, স্পেনের পরিণতি আসার আগেই আমরাও সচেতন হই, নিজের রক্তের বিনিময়ে টিকিয়ে রাখি আপন মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা